রথযাত্রা

প্রফুল্ল রায়

দূর থেকে একটা ফিল্মি গানের সুর বাতাসে ভেসে আসছে। কারা যেন 'বিলাইতি' বাদ্যযন্ত্রে একনাগাড়ে সুরটা বাজিয়ে যাচ্ছে।

উত্তর থেকে দক্ষিণে যে ন্যাশনাল হাইওয়েটা বরাবর চলে গেছে তার ওপর দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটছিল নাটোয়ার বা নাটুয়া। ঐ গান এবং সুরটা তার খুবই চেনা। তবে কবে কোথায় শুনেছিল, মনে নেই। পেটের দানার জন্য সারা দুনিয়া তাকে চষে বেড়াতে হয়। ঘুরতে ঘুরতে কোনো শহরে, বাজারে বা গঞ্জেটঞ্জে শুনে থাকবে।

সুরটা নিয়ে এখন ভাবার সময় নেই। অন্যমনস্কর মতো নাটোয়ার একবার শুধু পিছন ফিরে ভুরুর ওপর হাতের আড়াল দিয়ে তাকায়। প্রায় আধ মাইল তফাতে ন্যাশনাল হাইওয়ে যেখানে কাস্তের বাঁকানো ফলার মতো ডাইনে ঘুরে গেছে সেখানে আবছাভাবে কিছু লোকজন দেখা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে কয়েকটা মোটর টোটরও। সব মিলিয়ে ছোটখাট একটা জুলুস বা মিছিলই বলা যায়। খুব সম্ভব সুরটা ওখান থেকেই আসছে।

ফিল্মি গানের সুর বাজিয়ে কোথায় চলেছে মিছিলটা? এদিকেই আসছে কি? নিস্পৃহ চোখে খানিক তাকিয়ে থাকে নাটোয়ার। তারপর ঘুরে ফের হাঁটতে শুরু করে। নষ্ট করার মতো পর্যাপ্ত সময় তার হাতে নেই।

আপাতত নাটোয়ার চলেছে মনচনিয়া গাঁয়ে আধবুড়ো ফকিরার কাছে। তাকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে সোজা চলে যাবে নমকিপুরা টৌনে বা টাউনে বড়ে জমিমালিক রাজপুত মিলিটারি সিং-এর প্রকাণ্ড হাভেলিতে। তাঁর আসল নাম লালধারী সিং। প্রচণ্ড বদমেজাজ এবং গমগমে গলার জন্য লোকের মুখে মুখে তাঁর ঐরকম একটা জবরদস্ত নাম চালু হয়ে গেছে।

মিলিটারি সিং ডেকে পাঠাননি, তবু নাটোয়ার যে ফকিরাকে সঙ্গে করে তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়েছে তার উদ্দেশ্য একটাই। নাটোয়ারের ধারণা, ওখানে গেলে হয়ত কামাইয়ের কিছু বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু দুপুরের

এই লেখকের অন্যান্য বই

জনগণ

আগে আগে নমকিপুরায় পৌঁছুনোটা খুবই জরুরি। কেননা তারপর আর কাউকে 'দর্শন' দেন না মিলিটারি সিং। দুপুরে উৎকৃষ্ট ভরপেট ভোজনের পর পরিপাটি একটি দিবানিদ্রা লাগান। তারপর জমকালো পোশাক পরে সারা গায়ে দামী সেন্ট ঢেলে পুরনো আমলের একটি ফোর্ড গাড়িতে চেপে বেরিয়ে পড়েন। লোকে বলাবলি করে, নমকিপুরা থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে অনেক বড় টাউন ফুলগঞ্জে তাঁর একজন রাখনি বা রক্ষিতা আছে। সেখানে কয়েক ঘণ্টা মৌজ করে ফিরতে ফিরতে মাঝ রাত হয়ে যায়। বছরে দু-চারবার মিলিটারি সিং-এর লোক এসে নাটোয়ারকে ডেকে নিয়ে যায়। এই যাতায়াতের কারণে তাঁর কিছু কিছু শখ আর অভ্যাসের খবর জেনে গেছে সে।

নাটোয়ারের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মোটা মোটা হাড়ের ফ্রেমে তার পেটানো মজবুত শরীর। রোদে-পোড়া তামাটে চামড়া, চৌকো থুতনি, ঘাড় পর্যন্ত অযত্নে নেমে আসা রুক্ষ চুল, গালে কয়েক দিনের খাপচা খাপচা দাড়ি। তার আপাত সরল মাঝারি দুই চোখের তলায় খানিকটা নিষ্ঠুরতা যেন লুকনো আছে, যে কোনো মুহূর্তে সেটা বেরিয়ে আসতে পারে। পরনে তালি-মারা খেলো ফুল প্যান্ট আর রং-জ্বলে-যাওয়া সবুজ জামা।

এখান থেকে মাইল দুই পুবে নাটোয়ারের গাঁ তেতরিয়া। সেখানে বহুকালের পুরনো টুটোফুটো টিনের চালের কোমর-বাঁকা একখানা ঘর ছাড়া পার্থিব সম্পত্তি বলতে তার আর কিছুই নেই। নেই বাপ-মা, ভাই-বোন। বছর চারেক আগে একটা শাদি করেছিল। কিন্তু আওরতটা ছিল বেজায় বদ, বিয়ের ছ' মাসের মাথায় এক ছোকরার সঙ্গে পালিয়ে যায়। নাটোয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিল, ধরতে পারলে গলা টিপে তাকে শেষ করে ফেলবে। কিছুদিন খোঁজাখুঁজিও করেছে নাটোয়ার কিন্তু মেয়েমানুষটা বেবাক উধাও হয়ে গেছে, তার আর দেখা পাওয়া যায়নি।

এক 'ধুর' চাষের জমিও নেই নাটোয়ারের। কাজেই পেটের কারণে চাষের মরশুমে ক্ষেতমজুরি থেকে শুরু করে, ঠিকাদারদের জঙ্গল-কাটাইয়ের কাজ পর্যন্ত অনেক কিছুই তাকে করতে হয়। তা ছাড়া সে একজন নাম-করা 'বীটার' বা জঙ্গল-হাঁকোয়া। প্রচুর হল্লা বাধিয়ে, ক্যানেস্তারা পিটিয়ে বনের জানোয়ারদের শিকারীর বন্দুকের পাল্লার ভেতর নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে এ অঞ্চলে তার জুড়ি নেই। আগে এ জন্য প্রায়ই তার ডাক আসত। কিন্তু সরকার থেকে শিকারের ওপর ইদানীং মারাত্মক কড়াকড়ি করা হয়েছে। তাই বলে চোরাগোপ্তা বাঘ-ভাল্লুক মারা কি আর বন্ধ আছে? আগের মতো না

হলেও বছরে এক-আধবার শিকারীরা তাকে ডেকে পাঠায়। রক্ত-জমিয়ে-দেওয়া এক ধরনের ছুরির খেলাও জানে নাটোয়ার। এই খেলাটা মিলিটারি সিং-এর ভীষণ পছন্দ।

গেল বছর বর্ষার পর থেকে কয়েকটা মাস নানারকম রোগ-ব্যারাম আর শ্বাসকষ্টে ভুগেছে নাটোয়ার। কাজে বেরুবার মতো তাগদ ছিল না তার। জমানো টাকা যা ছিল বসে বসে খেয়ে শেষ হয়ে গেছে। তার ওপর দামী দামী ওষুধের খরচ। এখন অবশ্য পুরোপুরি সেরে উঠেছে সে। একটা পয়সা হাতে নেই। তা ছাড়া সবে বৈশাখ মাস পড়েছে। এখন ক্ষেতির কাজ কোথায় মিলবে? তাই ভোর হতে না হতেই তেতরিয়া থেকে বেরিয়ে পড়েছে। ছুরির খেলাটা একা দেখানো যায় না, তার জন্য ফকিরাকে দরকার।

মিলিটারি সিং যতবার নাটোয়ারের খেলা দেখেছেন, চোখের পাতা ফেলতে পারেননি। খেলা শেষ হলে তার পিঠ চাপড়ে বলেছেন, 'হারামজাদকা ছৌয়া, তুই একটা জাদুগর। বিলকুল ভেলকি দেখিয়ে ছাড়লি।' হারামজাদকা ছৌয়াটা গালাগাল নয়, ওটা মিলিটারি সিং-এর আদর এবং বিস্ময়ের প্রকাশ। শুধু তারিফই করেন না তিনি, হাতও তাঁর যথেষ্ট দরাজ। খুশি হয়ে প্রতিবার তিনি যা বখশিস দেন তাতে একটা মাস বেশ আরামেই কেটে যায় নাটোয়ারের। সেই সঙ্গে ফকিরারও। এই ব্যাপারটা মাথায় রেখেই সে আশায় আশায় নমকিপুরায় চলেছে। মিলিটারি সিংকে ছুরির খেলাটা দেখাতে পারলে বেশ কয়েক দিনের জন্য সে নিশ্চিন্ত। তার ভেতর চাষের মরশুম শুরু হয়ে যাবে।

হাইওয়ের দুধারে উঁচুনিচু কাঁকুরে ডাঙায় হতচ্ছাড়া চেহারার সব গ্রাম ছাড়া ছাড়াভাবে দাঁড়িয়ে আছে। একনজরেই টের পাওয়া যায় ওগুলো গরিব হাভাতেদের উপনিবেশ।

চলতে চলতে একবার আকাশের দিকে তাকায় নাটোয়ার। বৈশাখের এই গোড়াতেই এবার আকাশ জুড়ে মেঘের আনাগোনা শুরু হয়েছে। ছেঁড়া ছেঁড়া কালচে মেঘের টুকরোগুলো উল্টোপাল্টা হাওয়ায় লক্ষ্যহীনের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। রোদ উঠেছে বেশ খানিকক্ষণ আগে কিন্তু মেঘের জন্য তার তেজ ঢের কম।

গেল বছর এ অঞ্চলে ভয়াবহ অনাবৃষ্টি গেছে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত একটানা লু-বাতাস বয়ে যেত। আগুনের হলকার মতো অসহ্য তাপে ঝলসে গেছে গাছপালা, মাঠঘাট, শস্যক্ষেত্র। মাটি ফেটে চারিদিকে এখনও হাঁ হয়ে

আছে। কিন্তু এবার লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, খুব তাড়াতাড়িই বর্ষা নেমে যাবে।

এ এক সৃষ্টিছাড়া এলাকা। এখানে পালা করে এক বছর খরা হলে, পরের বছর বন্যা অবধারিত। নিয়ম অনুযায়ী এবার প্রবল বর্ষায় সব ভেসে যাবে।

হঠাৎ হইচই কানে আসতে আকাশের দিক থেকে চোখ নামিয়ে আনে নাটোয়ার। হাইওয়ের দু' পাশের গাঁগুলো উজাড় করে নানা বয়সের মানুষ, বাচ্চাকাচ্চা থেকে থুত্থুড়ে বুড়োবুড়ি পর্যন্ত সবাই বেরিয়ে আসছে। ক্ষয়াটে রুগ্‌ণ খই-ওড়া চেহারা তাদের। বাচ্চাগুলোর গায়ে জামাটামার বালাই নেই বললেই হয়। বাকি সবার পরনে ময়লা ঠেটি ধুতি, শাড়ি, লুঙ্গি, পাজামা বা শস্তা খেলো কাপড়ের সালোয়ার-কামিজ।

এত মানুষকে বাড়িঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে দেখে রীতিমত অবাকই হয় নাটোয়ার। যদিও নমকিপুরায় যাওয়ার খুবই তাড়া রয়েছে, তবু কৌতূহলের বশে দাঁড়িয়ে যায় সে। একটা মাঝবয়সী লোককে ডেকে জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে ভেইয়া, এত্তে আদমী পাক্কীতে চলে আসছে!' পাক্কী বলতে পাকা সড়ক অর্থাৎ ন্যাশনাল হাইওয়ে।

লোকটা পালটা প্রশ্ন করে, 'তুমি কিছু জানো না?'

'কী জানবো?'

লোকটা এবার আঙুল বাড়িয়ে পেছন দিকের সেই মিছিলটা দেখিয়ে দেয়। ফিল্মি গানের সেই সুরটা বাজাতে বাজাতে ওরা এদিকেই আসছে। নাটোয়ার বলে, 'ওরা কারা?'

তার এত বড় অজ্ঞতায় প্রথমটা হাঁ হয়ে যায় লোকটা। তারপর যেন করুণা করেই বলে, 'আরে ভাই, ভারতমাতা রথ আসছে। তা-ই দেখতে লোকজন ভিড় করছে।' সে আরো জানায়, কাল-পরশু দু'দিন ধরে তিন চারটে লোক টাঙ্গায় করে ন্যাশনাল হাইওয়েতে টহল দিতে দিতে মাইকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, আজ সকালে ভারত মাতা রথ এই রাস্তা দিয়ে যাবে। তাকে 'স্বাগত্' জানাতে সবাই যেন শুদ্ধ মনে দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। এটা তাদের পবিত্র কর্তব্য।

ইদানীং নানা ধরনের রথযাত্রার কথা কানে আসছে নাটোয়ারের। রামচন্দ্রজিকা রথ, প্রগতি রথ, উন্নয়ন রথ, সম্মার্গ রথ, সুচৈতন্য রথ, সদ্ভাবনা রথ, ইত্যাদি। বড় বড় নেতারা দামী দামী মোটর বা ভ্যান গাড়িকে রথ বানিয়ে সেগুলোতে চড়ে সারা দেশে নাকি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অন্য সব রথের কথা

শুনলেও ভারত মাতা রথের কথা এই প্রথম শুনল নাটোয়ার। আসলে তাদের তেতরিয়া গাঁ-টা হাইওয়ে থেকে অনেক দূরে, মাঠের মাঝখানে। পায়ে হাঁটা ছাড়া সেখানে যাওয়া অসম্ভব। ভারত মাতা রথের পাবলিসিটিওলারা টাঙ্গা থেকে নেমে কষ্ট করে আর অতদূরে যায়নি। গেলে জানতে পারত নাটোয়ার।

মাঝবয়সী লোকটা আর দাঁড়ায় না, নাটোয়ারের চাইতে ভারত মাতা রথের আকর্ষণ তার কাছে অনেক অনেক বেশি। মিছিলটা যেদিক থেকে আসছে, ভীষণ ব্যস্তভাবে সে সেদিকে এগিয়ে যায়। রথটা যেন অদৃশ্য বঁড়শি তার নাকে আটকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

নাটোয়ার আবার হাঁটতে শুরু করে। ভারতমাতা রথ নিয়ে এই মুহূর্তে তার কোনো আগ্রহ নেই।

আরো খানিকক্ষণ হাঁটার পর হাইওয়ে থেকে ডান দিকে একটা কাচ্চী বা কাঁচা রাস্তায় নেমে যায় নাটোয়ার। এই রাস্তাটা ধরে সিকি মাইলের মতো হাঁটলে ফকিরাদের মনচনিয়া গাঁ।

মনচনিয়ায় ঢোকার মুখেই ফকিরার প্রায় ধসে-পড়া মাটির ঘর। গরিবের চাইতেও গরিব এই লোকটার হাল নাটোয়ারের চাইতেও খারাপ। নাটোয়ার ঝাড়া হাত-পা লোক, দুনিয়ায় সে একেবারে একা। কিন্তু ফকিরার রয়েছে বিবি এবং একটা বারো তেরো বছরের মেয়ে। তিনটে পেট চালাতে তার জিভ বেরিয়ে যায়।

বাইরে থেকে নাটোয়ার ডাকতে থাকে, 'ফকিরা চাচা, ফকিরা চাচা—'

জং-ধরা নড়বড়ে টিনের দরজা খুলে মাঝ বয়সী জোহরা বিবি এবং তাদের মেয়ে আমিনা বাইরে এসে দাঁড়ায়। জোহরার পরনে ময়লা চিটচিটে শাড়ি, আমিনার গায়ে ছেঁড়াখোঁড়া তালি-মারা সালোয়ার আর ঢলঢলে কামিজ। রোগা পাকানো চেহারা দু'জনেরই। দেখামাত্র টের পাওয়া যায়, উপোস তাদের নিত্যসঙ্গী, মাসে কম করে দশ দিন শুধু জলের ওপর ভরসা করে কাটাতে হয়।

ফকিরার বাড়িতে আব্বুর কড়াকড়ি নেই। তা ছাড়া নাটোয়ার তাদের 'আপনা আদমী'—একরকম ঘরের লোক। আগে থেকে খবর না দিয়ে আচমকা এসে পড়ায় জোহরা অবাক হয়ে যায়। বলে, 'আরে তুম? আয়াসা আচানক?'

নাটোয়ার বলে, 'হাঁ, জরুরি কাজ আছে। চাচা কোথায় ?'

'ঘরে শুয়ে আছে।'

'ডেকে দাও।'

'তুমি দেখছি ঘোড়ায় চেপে এসেছ। ভেতরে এসো।'

আমিনাও মায়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে, 'আও না নাটুয়া ভেইয়া।' নাটোয়ারকে সে খুবই পছন্দ করে।

নাটোয়ার বলে, 'এখন ভেতরে যাওয়ার সময় নেই রে আমিনা। তোর আব্বুকে তুরন্ত পাঠিয়ে দে।'

জোহরা বিবি বলে, 'এত্তে রোজ বাদে এলে। বাইরে থেকেই চলে যাবে ?'

'হাঁ চাচী, এখনই আমাদের নমকিপুরায় যেতে হবে। দুফারের আগে মিলটারি সিংজির সাথ দেখা করতে না পারলে সব বরবাদ।'

মিলিটারি সিং-এর হাভেলিতে কী উদ্দেশ্যে নাটোয়াররা যায়, জোহরা বিবির তা অজানা নয়। ওখানে যাওয়া মানে দু-চারটে পয়সা ঘরে আসা। তবু বিমর্ষ হয়ে পড়ে সে। বলে, 'জরুর চাক্কুকা খেল দেখাতে যাচ্ছ ?'

'হ্যাঁ।'

'লেকেন—' কথা শেষ না করেই থেমে যায় জোহরা।

নাটোয়ার বলে, 'লেকেন কী ?' তার গলায় ব্যগ্রতা ফুটে বেরোয়।

'তোমার চাচা তো যেতে পারবে না।'

বুকের ভেতরটা ধক করে ওঠে নাটোয়ারের। সে দু'পা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, 'কেন ?'

জোহরা বিবি বলে, 'সাত রোজ ধরে তোমার চাচার ভারি বুখার।'

দম-আটকানো গলায় নাটোয়ার জানতে চায়, কী ধরনের অসুখ হয়েছে ফকিরার।

জোহরা বিবি জানায়, ধুম জ্বর হয়েছিল, তবে কাল রাত থেকে জ্বরটা আর নেই কিন্তু ফকিরার সারা গায়ে প্রচণ্ড ব্যথা, মাথায় 'দরদ'। বিছানা থেকে উঠতে গেলে টলে পড়ে যায়।

অর্থাৎ যে আশা নিয়ে নাটোয়ার এতদূর দৌড়ে এসেছে, সেটা ধুক করে নিভে যায়। কেননা ফকিরাকে বাদ দিয়ে ছুরির খেলাটা দেখানো অসম্ভব। প্রায় ভেঙেই পড়ে সে, দুই হাত উলটে দিয়ে বলে, 'তব্ তো সব কুছ পুরা চৌপাট।' গভীর হতাশায় তার গলার স্বর ঝাপসা হয়ে আসে।

জোহরা বিবি কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মাটির দেওয়াল ধরে ধরে

বাইরে বেরিয়ে আসে ফকিরা। এমনিতেই তার শরীর অনেক আগেই ভেঙেচুরে তেউড়ে গিয়েছিল। ক'দিনের জ্বরে এমন হাল হয়েছে যে তার দিকে তাকানো যায় না। চোখ এক কড় গর্তে ঢুকে গেছে, তার তলায় গাঢ় কালির পোঁচ। কণ্ঠার হাড় গজালের মতো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। গায়ে মাংস বলতে কিছুই নেই, হাড়ের ওপর ঢিলে জিলজিলে চামড়া জড়ানো। পরনে দলা মোচড়া হয়ে যাওয়া লুঙ্গি আর হাত-কাটা ফতুয়া ধরনের জামা। সে নির্জীব গলায় বলে, 'চল নাটুয়া, আমি মলটারিজির হাউলিতে (হাভেলি) যাব।' ফকিরা যে নাটোয়ার এবং জোহরাবিবির সব কথাই ঘরের ভেতর থেকে শুনেছে সেটা টের পাওয়া যায়।

জোহরা বিবি উদ্বিগ্ন মুখে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'নেহী নেহী, তোমার তবিয়ত ঠিক নেহী। ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো। বেরুতে হবে না।'

ফকিরা বলে, 'শুয়ে থাকলে চলবে। ঘরে একগো পাইসা নেহী। কামাই-ধান্দা না করলে সিরিফ ভুখা মরতে হবে।'

শঙ্কিত জোহরাবিবি স্বামীকে ঠেকাবার চেষ্টা করে। বলে, 'লেকেন তুমি ভুগে ভুগে এত দুবলা হয়ে পড়েছ! নমকিপুরায় যাবে কী করে ? তারপর ঐ খতারনাক চাক্কুকা খেল! মাত্ যাও আমিনাকে আব্বু।'

বিবিকে বোঝায় ফকিরা, যেখানে টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে না যাওয়াটা বিলকুল বেওকুফি। পয়সার গন্ধে তার কমজোর শরীরে হাতির তাকত এসে যাবে, জোহরা যেন কোনোরকম দুশ্চিন্তা না করে।

জোহরাবিবি আরো বারকয়েক আপত্তি জানায়, বাধা দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু সে সব গ্রাহ্য করে না ফকিরা। নাটোয়ারের সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়ে।

দুর্বল শরীরে জোরে জোরে পা ফেলতে কষ্ট হচ্ছিল ফকিরার। সাতদিন ভোগার পর যেটুকু শক্তি এখনও অবশিষ্ট আছে তা জড়ো করে নাটোয়ারের পাশাপাশি চলতে চলতে আকাশের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয় সে। বলে, 'উপরবালা তোকে পাঠিয়ে দিয়েছে নাটুয়া। আজ কিছু কামাই করে না আনলে চুল্হা ধরানো বন্ধ। সিরিফ ভুখা থাকতে হ'ত।'

ফকিরা ধরেই নিয়েছে মিলিটারি সিং-এর কাছ থেকে ভালমতো বখশিস মিলবেই। কিন্তু বিনা আমন্ত্রণে তারা নমকিপুরায় চলেছে। যদি কোনো কারণে মিলিটারিজির 'দর্শন' না মেলে, কিংবা তিনি ছুরির খেলা দেখতে রাজী না হন ? না না তেতরিয়া থেকে এতদূর আসার পর এ সব খারাপ চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতে সাহস হয় না নাটোয়ারের। বরং ফকিরার এবং নিজের উৎসাহকে উসকে

দেওয়ার জন্য বলে, 'চিন্তা নায় করনা চাচা। জরুর পাইসা কামাই হবে।'
একসময় দু'জনে হাইওয়ের কাছাকাছি এসে পড়ে।

॥ দুই ॥

'বোল রাধা বোল, সঙ্গম হোগা কি নেহীঁ—
তেরে মনকা গঙ্গা আউর মেরে মনকা যমুনা,
বোল রাধা বোল—'

কিছুক্ষণ আগে যে গানের সুরটা দূর থেকে আবছাভাবে কানে আসছিল, এবার সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শহরে-বাজারে গঞ্জেটঞ্জে ঘুরতে ঘুরতে রেডিওতে মাইকে এই গানটা কয়েক শ বার শুনেছে নাটোয়ার। এই গানের সুর এবং কথা এমনই যে রক্তকে নাচিয়ে দেয়, বুকের ভেতর ঝড় তুলতে থাকে।

ফকিরা পাশ থেকে ক্ষীণ গলায় বলে, 'জরুর ভারতমাতা রথ আসছে।'

হাইওয়ের দিকে চোখ রেখে নাটোয়ার জিজ্ঞেস করে, 'তুমি এই রথের কথা জানো নাকি? কারা এটা বার করেছে?'

'আমি তার জানব কোত্থেকে? তোর চাচীর দশটা কান আর বিশটা আঁখ। তার চোখকানের বাইরে দুনিয়ার কিছু হওয়ার যো আছে! সে-ই কাল এই রথটার খবর নিয়ে এসেছিল।' একটানা কথাগুলো বলে একটু থামে ফকিরা। কিছুক্ষণ হাঁপায়। তারপর ফের শুরু করে, 'তুই তো তিন চার মাস এধারে আসিসনি। এর ভেতর এ রকম আরো পাঁচ সাতটা রথ পাল্কী দিয়ে আংরেজি বাজনায় ফিলমকা গানা বাজাতে বাজাতে গেছে।'

নাটোয়ার উত্তর দেয় না; মোটামুটি এই খবরটা সেই মধ্যবয়সী লোকটার মুখে আগেই পেয়েছে। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে সে।

হাইওয়েতে আসতেই নাটোয়ারের চোখে পড়ল, যে মিছিলটাকে একসময় ধুধু দেখাচ্ছিল সেটা কাছে এসে পড়েছে। মিছিলটার সামনের দিকে বিশাল ব্যান্ডপার্টি। বাজিয়েদের একই রকমের জমকালো পোশাক, মাথায় সোনালি বর্ডার-দেওয়া কালো টুপি, পায়ে বুট। নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে তালে তালে পা ফেলে তারা সুরটা বাজিয়ে চলেছে। 'বোল রাধা বোল, সঙ্গম হোগা কি নেহীঁ—'

ব্যান্ড পার্টির পর একটা খোলা জিপে চার-পাঁচটা লোক, কেউ বসে, কেউ বা

দাঁড়িয়ে আছে। তাদের একজনের গলায় একটা মাইক ঝুলছে।

জিপের পর একটা মাটাডোর ভ্যানকে চমৎকার রথের মতো সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে। তার মাঝখানে প্ল্যাস্টিকের ফুল-লতা-পাতা দিয়ে বানানো বিরাট ছত্রির তলায় মখমলে-মোড়া সিংহাসন ধরনের আসনে হাতজোড় করে বসে আছেন বিপুল চেহারার ধবধবে ফর্সা একটি লোক। মাথায় ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল, পেছন দিকে এক গোছা টিকি। কপালে পুরু করে চন্দন লেপা। গোলাকার মুখে চমৎকার স্বর্গীয় একটি হাসি ধরে রেখেছেন তিনি। গায়ের চামড়া তার এত মিহি এবং মসৃণ, মনে হয় মাখন চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। তাঁর পরনে সিল্কের পাঞ্জাবি আর ফিনফিনে ধুতি, পায়ে কারুকাজ-করা নাগরা।

মাটাডোর ভ্যান অর্থাৎ রথটার দু'ধারে সামনে এবং পেছনে লাল সালুর ওপর সাদা দেবনাগরী হরফে লেখা আছে: 'ভারত মাতা রথ।' তার তলায় 'ভবিষ্য যাত্রা।'

বছর কয়েক আগে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের লোকজনেরা এই অঞ্চলে এসে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে কিছু টিনের চালা তুলে প্রাইমারি স্কুল বসিয়েছিল। তেমন একটা স্কুলে দিনকতক যাতায়াত করে একটু আধটু পড়তে আর নামটা সই করতে শিখেছে নাটোয়ার। তারই দৌলতে সালুর ওপর লেখাগুলোর মর্ম বুঝতে পারছে সে।

মাটাডোরের পর একটা নতুন ঝকমকে মোটর। সেটার ভেতর কিছু লোক বসে আছে। গাড়িটার সামনের দিকের কাঁচে একটা সাদা কাগজে ইংরেজিতে কী যেন লিখে আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। সমাজ কল্যাণ দপ্তরের দেহাতী স্কুল থেকে যে বিদ্যাটুকু নাটোয়ার সংগ্রহ করতে পেরেছে তার জোরে ঐ ইংরেজিটা পড়া যায় না।

মোটরের পর একটা খোলা ট্রাকে স্টেনলেস স্টিলের ঢাউস ঢাউস ডেকচি, সিলভারের হাঁড়ি, প্লাস্টিকের বালতি এবং নানা ধরনের প্রচুর মালপত্র। সব শেষে ঘোড়ায় টানা দুটো টাঙ্গায় কয়েকটা লোক বসে আছে। তাদের চাড়া-দেওয়া গোঁফ, চওড়া কাঁধ, বিশাল বুকের ছাতি আর লালচে নির্মম চোখ বুঝিয়ে দেয়, মানুষ হিসেবে তারা কতটা সাঙ্ঘাতিক। একজনের হাতে আবার একটা দোনলা মুঙ্গেরি বন্দুক আর বুকের ওপর আড়াআড়ি টোটার মালা ঝুলছে। আরেকজনের হাতে একটা বেঢপ লম্বা টিনের চোঙা।

টাঙ্গা দুটোর পর অবশ্য এই এলাকার কিছু গেঁয়ো গরিব লোকজন পায়ে হেঁটে মিছিল করে চলেছে।

নাটোয়ার মাটাডোরটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। একবার পাটনায় এক শিকারীর বাড়ি গিয়ে প্রথম টিভি দেখেছিল সে। তখন 'রামায়ণ' সীরিয়ালটা দেখানো হচ্ছিল। আরেক বার গিয়ে দেখেছে 'মহাভারত'। সেকালে অর্থাৎ সত্য ত্রেতা আর দ্বাপরে দেবতা এবং দানবেরা রথে চড়ে ঘুরে বেড়াত। সে সব রথ আকাশেও উড়ে বেড়াতে পারত। মাটাডোরটা দেখতে দেখতে রামায়ণ মহাভারতের আমলের রথের কথা মনে পড়ে যায় নাটোয়ারের। কার কাছে সে শুনেছিল, এখন নাকি ঘোর কলি চলছে। কলিযুগে রথ দেখতে দেখতে সে হাঁ হয়ে যায়।

একেবারে সামনের দিকে ব্যান্ডপার্টির পর জিপে যে লোকটির গলায় মাইক ঝোলানো রয়েছে তার কণ্ঠস্বর খুবই জবরদস্ত। মাঝে মাঝে মাইকটা মুখের সামনে তুলে ব্যান্ড পার্টির বাজনাদারদের থামিয়ে দিয়ে সে বলতে থাকে, 'ভাইয়ো আউর বহেনো, পাপ আর ভ্রষ্টাচারে ইন্ডিয়া, মতলব ভারত বিলকুল বোঝাই হয়ে গেছে। যেদিকেই তাকাবেন সেদিকেই দুর্নীতি, গন্ধা আদমীদের ভিড়। লোভে লালচে ভারতবাসী পুরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তার সুযোগ নিচ্ছে বাইরের নানা দেশ। যুগ যুগ ধরে চালু ইন্ডিয়ার মহান সোসাইটি আর ধর্মকে তারা খতম করে দিতে চায়। আমাদের দেশের মধ্যেও বহোত দুশমন রয়েছে। তারা বাইরের ষড়যন্ত্রে মদত দিচ্ছে। লেকেন এই চক্রান্ত জান দিয়ে রুখতে হবে। সোসাইটি আর ধর্মই যদি শেষ হয়ে গেল, ইন্ডিয়ার থাকবে কী ? ভাইয়ো আউর বহেনো, দেশের মানুষের হুঁশ ফেরানো আর ধর্ম আর সমাজকে বাঁচাবার জন্যে তারানাথ মিশ্রজি রথযাত্রা শুরু করেছেন। ঐ দেখুন তারানাথজি আর তাঁর 'ভারতমাতা রথ।' বলে মাটাডোর এবং সেটার মাঝখানে জমকালো ছত্রির তলায় জোড়হাত করে বসে-থাকা বিপুলাকার তারানাথকে দেখিয়ে দেয়।

লোকটার গলায় অলৌকিক শক্তি। এরপর গাঁক গাঁক করে সে যা বলে যায় তা এইরকম। ধর্ম আর সোসাইটিকে রক্ষা করতেই শুধু নয়, তিনি জানেন ভারতবাসী বড়ই কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। ধর্ম ইত্যাদির মতো পেটের দানাও খুবই মূল্যবান এবং জরুরি। তাই সবার জন্য রোটি, কাপড়া এবং মকানের কথাও তিনি চিন্তা করেছেন। দেশের মানুষের জন্য সুখী, মহান স্বপ্নের ভারত তিনি গড়ে দেবেন। দুঃখ-কষ্ট ঘুচে সকলের মুখে যতদিন না হাসি ফুটছে তাঁর 'ভারতমাতা' রথ চলতেই থাকবে। দুখী ভারতবাসীর ধর্ম, সোসাইটি, রোটি, কাপড়া এবং মকানের জিম্মেদার তারানাথজি ; তাদের সুরক্ষার দায়িত্ব তাঁর।

সবশেষে লোকটা বলে, 'তারানাথজি ভবিষ্যৎ ভারতের কথা ভেবে এই রথযাত্রায় পাঁচ পাঁচ গাঁওয়ের পরে একটা করে আধারশিলা বসাতে বসাতে (শিলান্যাস করতে করতে) যাবেন।' একটু থেমে ফের বলে, 'আরেকটা কথা, তারানাথজি আগেলা চুনাওতে আপনাদের এই এলাকা থেকে লোকসভার উম্মীদবার হচ্ছেন। তাঁর ভরসা আছে, আপনারা তাঁকে মদত করবেন।' বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে টাঙ্গার সেই মারাত্মক চেহারার লোকগুলোর উদ্দেশে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকে, 'এ দুমরলাল, অব্ স ্লোগান তো দে—'

এরা বোধহয় রথযাত্রার নানারকম কাজকর্ম নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। এবার চোঙা হাতে সেই লোকটা অর্থাৎ দুমরলাল উঠে দাঁড়িয়ে চোঙাটি মুখে লাগিয়ে চেরা চেরা বাজখাঁই গলায় চিৎকার করে ওঠে, 'ভারতমাতা—'

টাঙ্গার অন্য লোকগুলি গলা মিলিয়ে চেঁচায়, 'জিন্দাবাদ—'

'তারানাথ মিশ্র—'

'জিন্দাবাদ।'

'ভবিষ্যযাত্রা—'

'জিন্দাবাদ।'

'মহান ভারতকো—'

'রকষা কর।'

টাঙ্গার তাগড়াই লোকগুলোই শুধু স্লোগান দিয়ে যাচ্ছে। হাইওয়ের দু'ধারে উৎসুক গেঁয়ো মানুষের জটলা। তাদের দিক থেকে কোনোরকম সাড়া নেই।

ভারতমাতা রথ এবং সেটার পেছনে ট্রাক আর মোটরটেটারের কনভয় থেমে যায়নি, ধীরে ধীরে এগুচ্ছিল। একেবারে পেছনে যে পঞ্চাশ ষাট জনের মিছিলটা চলেছে, ফকিরা এবং নাটোয়ার কখন তাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে দিয়েছে, নিজেদেরই খেয়াল নেই।

ওদিকে হঠাৎ স্লোগান থামিয়ে দুমরলাল কোঁচকানো হিংস্র চোখে দু'ধারের জটলার দিকে তাকাতে তাকাতে হুমকে ওঠে, 'শালেরা গুংগা নাকি ? গলার নলিয়া থেকে আওয়াজ বার করতে পারিস না ?' বলেই কণ্ঠস্বর কয়েক পর্দা চড়িয়ে দেয়, 'ভারতমাতা—' তারপর গলা নামিয়ে দেয়, 'এবার বল জিন্দাবাদ—'

সবাই নয়, মাত্র কয়েকজন গেঁয়ো মানুষ এধার ওধার থেকে ভয়ে ভয়ে বলে ওঠে, 'জিন্দাবাদ—'

এর পর দুমরলাল তাদের কাছ থেকে আরো কয়েকটা 'জিন্দাবাদ' আদায় করে ছাড়ে।

সরু সরু, কমজোর পায়ের ওপর শরীরটাকে খাড়া রাখতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল ফকিরার। মাথা ভীষণ টলছে। প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে সে এগিয়ে যায়।

পাশ থেকে নাটোয়ার একবার ফকিরাকে লক্ষ করে। তারপর তার দুই চোখ চলে যায় ভারতমাতা রথের দিকে। যে গতিতে গাড়িগুলো চলছে তাতে পেছন পেছন হাঁটলে দিনের আলো থাকতে নমকিপুরায় পৌঁছুনোর আশা নেই। নাটোয়ার খুবই শঙ্কিত হয়ে পড়ে। আবার সে ফকিরার দিকে তাকায়। চাপা গলায় ডাকে, 'চাচা—'

ফকিরা দুর্বল স্বরে সাড়া দেয়, 'কী বলছিস ?'

নাটোয়ার রাস্তার পাশের ঢালু জমি দেখিয়ে গলা আরো নামিয়ে দেয়, 'চল, ওধার দিয়ে ঘুরে যাই।'

গোটা হাইওয়ে জুড়ে তারানাথ মিশ্রর ভারতমাতা রথ চলেছে। সোজা যাওয়ার উপায় নেই। নাটোয়ার চাইছে, সড়ক থেকে মাঠে নেমে রথটাকে পাশ কাটিয়ে বেশ খানিক দূরে গিয়ে তারা হাইওয়েতে উঠবে। ফকিরা বলে, 'সে-ই ভাল।'

কিন্তু নাটোয়াররা রাস্তার কিনারে যাওয়ার আগেই দুমরলাল চোঙা মুখে লাগিয়ে চেঁচাতে থাকে, 'ভাইয়ো আউর বহেনো, আপনারা দলে দলে জুলুসে সামিল হন। বেফায়দা কাউকে হাঁটতে হবে না। যারা তারানাথজির আধারশিলা বসানো দেখতে যাবেন তাদের সবাইকে দুফারে 'বঢ়িয়া ভোজন' করানো হবে। আইয়ে আইয়ে, তুরন্ত চলা আইয়ে—'

এবার সড়কের দু'ধারের লোকজনদের মধ্যে খানিকটা উত্তেজনা দেখা দেয়। নিজেদের ভিতর ফিস ফিস করে তারা কিছু একটা পরামর্শ করতে থাকে। বঢ়িয়া ভোজন অর্থাৎ উত্তম আহারের ব্যাপারটা তাদের রীতিমত চঞ্চল করে তুলেছে।

ধুরন্ধর দুমরলাল জনতার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিল। সে বার বার উৎকৃষ্ট 'ভোজন'-এর কথা বলে তাদের ফুসলাতে থাকে, 'আইয়ে আইয়ে, চিন্তাকি কোঈ বাত নেহীঁ। জুলুসে সামিল হলে 'পুণ'ও হবে, লাভও হবে।'

দ্বিধা যেটুকু ছিল, দ্রুত কেটে যায়। দু পাশ থেকে নানা বয়সের বেশ কিছু মেয়েমানুষ এবং পুরুষ হাইওয়েতে নেমে আসে। মুহূর্তে মিছিলটা আরো খানিকটা লম্বা হয়ে যায়।

'ভোজন'-এর কথায় নাটোয়ার এবং ফকিরা কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়ে পড়েছিল। নাটোয়ার জিজ্ঞেস করে, 'কী করবে চাচা ? এরা তো খিলাতে পিলাতে চাইছে।'

ফকিরা বলে, 'পাইসা তো আর দেবে না, সিরিফ খিলাবে। লেকেন নিজের পেটটা ভরলেই চলবে ! ঘরে তোর চাচী আর আমিনা রয়েছে। তাদের জন্যে কিছু নিয়ে যেতে হবে না।' একটু থেমে বলে, 'তোর আর কী। একেলা আদমী, ঘরে বালবাচ্চা, জরু উরু নেই। নিজের একটা পেট নিয়েই তোর চিন্তা। আমাকে তিন তিনগো পেটের কথা ভাবতে হয়।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে নাটোয়ার। জোহরা বিবি এবং আমিনার কথা একটু আগে তার মাথায় ছিল না। ঠিকই তো, ফকিরা নিজে খাবে অথচ ঘরে বিবি আর মেয়ে উপোস দিয়ে থাকবে, তা তো হয় না। তা ছাড়া দুপুরে না হয় ভারতমাতাওলারা একবার তাদের খাওয়াবে কিন্তু রাত্তিরে কী খাবে তারা ? আজকের পর কাল আছে, কালের পর পরশু তরশু এবং তারপরও অনেকগুলো দিন। এ বছর চাষের মরশুম শুরু হওয়া পর্যন্ত টিকে তো থাকতে হবে। সে জন্য টাকা দরকার। সে টাকাটা একমাত্র মিলিটারি সিং-এর কাছে গেলেই পাওয়ার সম্ভাবনা।

নাটোয়ার ফকিরার কানের কাছে মুখ এনে বলে, 'আও চাচা—'

দু'জনে পায়ে পায়ে হাইওয়ের একধারে চলে যায়। কিন্তু যেই তারা মিছিল থেকে বেরিয়ে নিচের কাঁকুরে ডাঙায় নামতে যাবে সেই সময় বাঘের মতো হুঁকরে ওঠে দুমরলাল, 'এ শালে ভূচ্চরের ছৌয়ারা, ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস ? মিছিলে তিন কদম যেতে না যেতেই ভেগে পড়ার ধান্দা !' লোকটার চিলের নজর। তার চোখ এড়িয়ে বুঝিবা কিছুই হওয়ার জো নেই।

নাটোয়ার এবং ফকিরা ভয়ানক চমকে ওঠে। বুঝতে পারে নিজেদের অজান্তে মিছিল পা দিয়ে মারাত্মক ফাঁদে আটকে গেছে। দুমরলালেরা না ছাড়লে এখান থেকে বেরুবার আর উপায় নেই। আজকের দিনটা পুরা বরবাদই হয়ে গেল। মিলিটারি সিং-এর বাড়িতে আজ যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

ফকিরা বহুদর্শী লোক। পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর বেঁচে থেকে এই দুনিয়ার অনেক কিছু দেখেছে সে। মানুষ সম্পর্কে তার বিপুল অভিজ্ঞতা। ফকিরা জানে, দুমরলালদের চটাতে নেই। শশব্যস্তে বলে, 'ভাগব কেন ? অয়সা ধান্দাই নেই। মাঝখানে ধাক্কাধাক্কি হচ্ছে, তাই সড়কের কিনার দিয়ে যাব,

ভেবেছিলাম।'

একটা চোখ ছোট করে দাঁতে দাঁত চেপে নিঃশব্দে একটি চতুর হাসি ফুটিয়ে তোলে দুমরলাল। বুঝিয়ে দেয়, ফকিরাদের মতলবটা সে ধরে ফেলেছে। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলে, 'চুহা কাঁহিকা! কিনার দিয়ে যেতে হবে না, বীচমে (মাঝখানে) ঘুসে যা শালেরা।'

অগত্যা নিরুপায় হয়ে তা-ই করতে হয়। ফকিরা এবং নাটোয়ারকে।

দুমরলাল এবার গলায় লহর তুলে ধিক্কার দিয়ে বলতে থাকে, 'ছিয়া ছিয়া ছিয়া! তারানাথজি তোদের ভালাই-এর জন্যে, ভারতবর্ষকে ভালাই-এর জন্যে এত কষ্ট করে বেরিয়ে পড়েছেন, তোদের জন্যে ভোজন-উজন বন্ধ করে দিয়েছেন, রাতের পর রাত এক মিনটকে লিয়ে ঘুমোন না, আর শালেরা—তোরা কিনা তাঁর মিছিলে দশ কদম হাঁটতে পারিস না! দেহ্ (শরীর) একেবারে মাখ্খন দিয়ে তৈরি। নিমকহারাম, বিশ্বাসঘাতী কাঁহিকা!'

দু'ধারে, সামনে এবং পেছনে মানুষের দেওয়াল। মাঝখান দিয়ে অসীম গ্লানিতে মাথা হেঁট করে হাঁটতে থাকে নাটোয়াররা। কিন্তু কিছুতেই ভেবে পায় না কবে কখন কিভাবে তারা তারানাথ মিশ্রর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? কেননা, জীবনে এই প্রথম তারা তারানাথজিকে দেখল। তাঁর সঙ্গে নেমকহারামির প্রশ্নই ওঠে না।

দুমরলাল কর্কশ কণ্ঠস্বরকে যতটা সম্ভব মোলায়েম করে ফের চোঙা মুখে তুলে দু পাশের জনতার উদ্দেশে বলে যাচ্ছিল, 'আইয়ে আইয়ে, রথযাত্রামে সামিল হো যাইয়ে—' বলতে বলতে তার চোখে পড়ে মিছিলের একধারে তুচ্ছ কোনো কারণে দুটো লোক চেঁচামেচি ধাক্কাধাক্কি লাগিয়ে দিয়েছে। তৎক্ষণাৎ মুখ থেকে চোঙা নামিয়ে তাদের উদ্দেশে দুমরলাল চিৎকার করতে থাকে, 'এই জানবরেরা হল্লাগুল্লা বিলকুল বন্ধ্। নইলে গলার নলিয়া ছিঁড়ে ফেলব।'

মুহূর্তে হইচই থেমে যায়।

চলতে চলতে নাটোয়ার একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে, দুমরলাল মুখে চোঙা লাগিয়ে লোকজনকে ডাকাডাকির সময় 'আপনারা' বলছে কিন্তু আলাদাভাবে কারো সঙ্গে বলার সময় স্রেফ 'তুই'। কারণটা সে বুঝে উঠতে পারে না।

আরো কিছুক্ষণ 'আইয়ে আইয়ে' করার পর দুমরলাল জিপের সেই মাইকওলা লোকটিকে বলে 'আমার হয়ে গেছে মহাদেওজি—'

মহাদেও এবার থেমে-যাওয়া ব্যান্ডপার্টির উদ্দেশে বলে, 'তোমরা ফের শুরু করে দাও—'

নতুন উদ্যমে বাজনা আরম্ভ হয়ে যায়।

'বোল রাধা বোল, সঙ্গম হোগা কি নেহীঁ—'

ভারতমাতা রথ এক সেকেন্ডের জন্য কোথাও থামে না। গতি অবশ্য খুবই কম।

হাঁটতে হাঁটতে আপসোস হতে থাকে নাটোয়ারের। বলে, 'বহোত মুসিবতে ফেঁসে গেলাম চাচা। কেন যে জুলুসে ঢুকেছিলাম! এখন নিজের গালে জুতি মারতে ইচ্ছা করছে।'

ফকিরাও খুব সম্ভব একই কথা ভাবছিল। সরু গলাটা নেড়ে সে জানায়, তারও ইচ্ছা বিলকুল একরকম।

নাটোয়ার বলে, 'কখন ছাড়া পাব, কে জানে।'

ফকিরা বলে, 'হুঁ—'

নাটোয়ার বলে, 'মহাদেওজি তখন বলছিল, পাঁচ পাঁচগো গাঁওয়ের পর একটা করে আধারশিলা বসাবেন তারানাথজি। পয়লা যে আধারশিলাটা বসাবেন, তারপর কি ছাড়া পাব?'

ফকিরা অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়ে। সে যা উত্তর দেয় তা অনেকটা এইরকম। আজ কখন তারানাথজিরা রথযাত্রা শুরু করেছেন, এখানে আসার আগে ক'টা গাঁ পেরিয়ে এসেছেন বা এখন পর্যন্ত একটাও শিলান্যাস করেছেন কিনা, এসব জানা দরকার। আরো জানতে হবে কোথায় কোথায় তাঁদের শিলান্যাসের কর্মসূচি রয়েছে। যদি একটার বদলে দুটো বা তিনটে আধারশিলা বসানোর পরিকল্পনা তারানাথজিরা আজ করে থাকেন? এবং সেগুলো শেষ না হওয়া পর্যন্ত যদি ফকিরাদের না ছাড়া হয়? আসলে কপাল ভাল হলে তাড়াতাড়িই মুক্তি পাওয়া যাবে। আর যদি তারা নেহাতই বদনসীব হয়, সেই অজানা দুর্ভোগের কথা ভাবতে সাহস হয় না ফকিরার।

কপাল কুঁচকে একটু চিন্তা করে নাটোয়ার। তারপর ফকিরাকে জিজ্ঞেস করে, 'দুমরলালজিসে পুছুঙ্গা?'

ফকিরা বলে, 'যদি গুস্সা হয়?'

'কথা বলে দেখি না।'

'দ্যাখ।'

সামনে বেশ কিছু লোকজন রয়েছে। তাদের ঠেলেঠুলে দুমরলালদের টান্ডার কাছে চলে আসে নাটোয়ার। তারপর বুকের ভেতর খানিকটা সাহস জড়ো করে বলে, 'দুমরলালজি, একটা কথা বলব—'

পোকামাকড়ের দিকে যেভাবে মানুষ তাকায়, অবিকল সেইভাবেই নাটোয়ারকে লক্ষ করে দুমরলাল। একটা দেহাতীর মুখে নিজের নাম শুনে সে যতটা অবাক তার চেয়ে ঢের বেশি বিরক্ত। দু-চার সেকেন্ড তাকিয়ে থেকেই নাটোয়ারকে চিনে ফেলে সে। কর্কশ গলায় বলে, 'আরে তু ? নাম কী তোর ? কৌন গাঁওকি রহনেবালা ?'

নিজের নাম এবং তেতরিয়া গাঁয়ের কথা জানিয়ে দেয় নাটোয়ার।

দুমরলাল বলে, 'কী বলবি, বলে ফেল—'

অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে নাটোয়ার বলে, 'মালুম হচ্ছে আপনারা বহোত দূর থেকে আসছেন।'

'হাঁ, কেন ?' দুমরলালের ভুরু কুঁচকে যায়।

ফকিরার মতো নাটোয়ারও বারো ঘাটের জল-খাওয়া প্রাণী। সে জানে কাকে কিভাবে পুজো চড়িয়ে তুষ্ট করতে হয়। হাতজোড় করে বলে, 'গুস্সা হবেন না তো ?'

নাটোয়ারের বিনয়ে খানিকটা নরমই হয় দুমরলাল। বেশ উদারভাবেই বলে, 'এত্তে বকোয়াস না করে আসল কথাটা বল না ভুচ্চর—'

'আমাদের ভালাই-এর জন্যে এত্তে তখলিফ করে কোথা থেকে আসছেন, জানতে ইচ্ছে করছে।'

'সিসৌলির নাম শুনেছিস ?'

'হাঁ হাঁ, বহোত ভারি টৌন।'

দুমরলাল পশ্চিম দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয়। ধুধু দিগন্ত দেখাতে দেখাতে বলে, 'জানিস তা হলে। ও শহর ইঁয়াসে লগভগ পঁচাশ 'মিল' (মাইল) হোগা।' সে আরো জানায়, তারা সিসৌলিতে থাকে। তারানাথ মিশ্র সেখানকার সবচেয়ে 'সরগনা' অর্থাৎ মান্যগণ্য আদমী। এমনই শ্রদ্ধেয় এবং ধর্মাত্মা যে সিসৌলি শহরের তাবত মানুষ তাঁর নামে শির ঝুঁকায়। কাল সকালে তারা ভারতমাতা রথ নিয়ে বেরিয়েছে। এর মধ্যে বারোখানা গাঁ পাড়ি দিয়ে এসেছে। দু দুটো শিলান্যাস করা হয়ে গেছে। একটা গাঁয়ে কাল রাত কাটিয়ে আজ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার বেরিয়ে পড়েছে। এখান থেকে ঘাটমপুরা, চৌহারি, বাজরিয়া ইত্যাদি গাঁ পেরিয়ে তারা যাবে নহরগঞ্জে।

দুমরলাল বলে, 'নহরগঞ্জে একগো আধারশিলা বসাবেন তারানাথজি।'

মনে মনে অঙ্ক কষে নেয় নাটোয়ার। যে গতিতে ভারতমাতা রথ চলেছে তাতে নহরগঞ্জে তাদের পৌঁছুতে বেলা হেলে যাবে। শিলান্যাসের আগেই কি

দুমরলালরা সবাইকে 'ভোজন' করিয়ে দেবে ? এ ব্যাপারে নাটোয়ার আদৌ নিশ্চিত নয়। যদি খাওয়ায়ও, আধারশিলা না বসানো হলে তাদের মুক্তি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত তারানাথ মিশ্রর রথযাত্রার সঙ্গে তাদের জুড়ে থাকতে হবে। কাজেই এ নিয়ে ভেবে ভেবে নিজেকে হয়রান করার আর দরকার বোধ করে না নাটোয়ার। তার মানসিক অবস্থা অনেকটা হাল ছেড়ে দেওয়ার মতো।

জরুরি খবরটি জানা হয়ে গেছে নাটোয়ারের। হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায় তার। সে জিজ্ঞেস করে, 'কিসের আধারশিলা বসাতে বসাতে চলেছেন তারানাথজি ?'

দুমরলাল বলে 'বহোতি কিসিমকা। নহরগঞ্জে পৌঁছুলেই নিজের আঁখে সব দেখতে পাবি।'

এ বিষয়ে আর কোনো প্রশ্ন করতে সাহস হয় না নাটোয়ারের। খানিক ভেবেচিন্তে সে বলে, 'কেত্তে রোজ আপনাদের এই রথযাত্রা চলবে ?'

দুমরলাল আচমকা ক্ষেপে ওঠে, 'শালে আমাদের কী রে ? তোদের না ?' তারপরে যেন করুণা করেই বলে, 'কমসে কম বিশ রোজ চলবে। যা, ভাগ।' একটা দেহাতীর সঙ্গে বকর বকর করে অনেকটা সময় নষ্ট করা হয়েছে। আর কথা বলার ইচ্ছে নেই দুমরলালের।

আরো একটা কথা নাটোয়ারের মাথায় এসেছিল। পবিত্র রথযাত্রার সামনে কেন ফিলমকা গানা বাজানো হচ্ছে কিন্তু এ প্রশ্নটা আর করা হয়ে ওঠে না। ভিড় ঠেলে ফকিরার কাছে ফিরে আসে নাটোয়ার এবং দুমরলালের সঙ্গে যা যা কথাবার্তা হয়েছে সব তাকে জানিয়ে দেয়।

যদিও আকাশে ছন্নছাড়া মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে, রোদের তেজও বেশ কম, তবু হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছিল ফকিরার। প্রায় টলতে টলতে পা ফেলছে সে। দুই হাত উলটে দিয়ে বলে, 'আর কিছু করার নেই রে নাটুয়া। যা হবার হোক। এখন হাঁটতে থাক।'

এরপর অনেকক্ষণ হাইওয়ের ডাইনে বা বাঁয়ে একটা গ্রামও চোখে পড়ে না। শুধুই উঁচুনিচু টিলার মাঝখানে ফাঁকা শস্যক্ষেত্র, মজা নহর, এলোমেলো দাঁড়িয়ে থাকা রুক্ষ চেহারার গাছপালা অথবা আগাছার ঝোপ।

গ্রাম বা মানুষজনের দেখা না পাওয়া গেলেও ব্যান্ডপার্টি এক মিনিটের জন্যও বাজনা থামাচ্ছে না। একনাগাড়ে সেই সুরটা বাজিয়ে চলেছে। 'বোল রাধা বোল সঙ্গম হোগা কি নেহীঁ—'

এদিকে মিছিলের লোকজনের মধ্যে 'বড়িয়া ভোজন'-এর ব্যাপারটা নিয়ে উত্তেজনা তুমুল হয়ে উঠেছে।

একজন গলা উঁচুতে তুলে বলে, 'জরুর চাপাটি, ভাজি, দহি আর পুদিনার আচার খাওয়াবে।'

আরেকজন স্বর আরো চড়িয়ে দেয়, 'আরে নেহীঁ নেহীঁ, শুখা চাপাটি নেহীঁ, ঘিউ-চাপাটি, আচ্ছা সব্জি, অড়হড়কি ডাল, লাড্ডু খিলায়েঙ্গে।'

ভোজের তালিকা নিয়ে গোটা মিছিলের চারিদিকে প্রচুর মতভেদ দেখা দেয়। কারো ধারণা, ভারতমাতা রথ নিয়ে তারানাথজির মতো বড়ে আদমী যখন বেরিয়েছেন তখন অবশ্যই দামী ঘিয়ে ভাজা পুরী কিংবা বাদাম-পেস্তা দেওয়া পোলাও খাওয়ানো হবে। কারো বিশ্বাস তাদের পাতে বুঁদিয়া, গুলাবজামুন এবং প্যাঁড়া নিশ্চয়ই ঢেলে দেওয়া হবে।

অর্থাৎ গরিবের চাইতে গরিব এই হাভাতে মানুষগুলো আমৃত্যু যে সব সুস্বাদু খাবারের স্বপ্নে মশগুল হয়ে থাকে অথচ সে সব খাওয়া তো দূরের কথা, অনেকে চোখে পর্যন্ত দ্যাখেনি, সাধ মিটিয়ে সেগুলোর কথা বলে যায়। তাদের বিশ্বাস, রথযাত্রার উদ্যোক্তারা নিশ্চয়ই তাদের আশা পূরণ করে দেবেন।

নাটোয়ার এবং ফকিরা এখন আর কথা বলছে না। চারপাশের হইচই শুনতে শুনতে তারা চুপচাপ হেঁটে চলেছে।

হঠাৎ দূর থেকে অস্পষ্ট চিৎকার ভেসে আসে, 'রুখ যাও, রুখ যাও।'

রথযাত্রা অবশ্য থামে না। তবে মিছিলে খাদ্যতালিকা নিয়ে যে উত্তেজনাটা চলছিল সেটা আপাতত স্থগিত রেখে সবাই এদিকে ওদিকে তাকাতে থাকে।

ফকিরা এবং নাটোয়ারও মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লক্ষ করছিল। হঠাৎ নাটোয়ারের চোখে পড়ে, পেছন দিকে প্রায় 'রশি' খানেক তফাতে হাইওয়ের ডান ধারের উঁচু একটা টিলার মাথা থেকে গড়ানে ঢাল বেয়ে একটা মেয়েমানুষ ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ুতে দৌড়ুতে নেমে আসছে। মাটিতে তার পা যেন পড়ছে না। সমানে সে চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'রুখ যাও, রুখ যাও—'

মিছিলের প্রতিটি মানুষের চোখ দূরের ঐ মেয়েমানুষটির দিকে। টাঙ্গায় বসে দুমরলালরাও তাকে দেখতে পেয়েছিল। দুমরলাল বলে, 'এ আওরত কৌন রে?'

কেউ উত্তর দেয় না। খুব সম্ভব মিছিলের লোকজনেরা তাকে চেনে না।

ভারতমাতা রথ না থামলেও কিছুক্ষণের মধ্যে মেয়েমানুষটি কাছাকাছি চলে আসে। তার বয়স সাতাশ আটাশ। মাথাভর্তি তেলহীন রুক্ষ চুল। লম্বাটে

মুখে দু-চারটে বসন্তের দাগ। বড় বড় টানা চোখে অত্যন্ত সতর্ক নজর। রং কালো। রোদে পুড়ে চামড়া কর্কশ। দেখামাত্র টের পাওয়া যায় মেয়েমানুষটির ওপর দিয়ে অনেক ঝড়ঝাপটা গেছে। তবু হাতের মোটা মোটা হাড়, পায়ের শক্ত গোছ, ইত্যাদি বুঝিয়ে দেয়, জীবনের সবরকম বিরুদ্ধতার সঙ্গে যুঝবার মতো শক্তি এখনও তার মধ্যে অনেকখানিই অটুট রয়েছে। সেই সঙ্গে ছিটেফোঁটা লাবণ্যও।

তার পরনে খাটো ময়লা সবুজ শাড়ি আর লাল জামা। দুই হাতে দস্তার ছিরিছাঁদহীন দুটো ভারী ভারী কাংনা, নাকে ঝুটো লাল পাথর বসানো নাকফুল ছাড়া সারা গায়ে ধাতুর আর কোনো চিহ্নই নেই।

মেয়েমানুষটি আরো কাছে আসতেই চমকে ওঠে নাটোয়ার। তার হাড়ের ভেতর দিয়ে যেন বিজরি চমকে যায়। মেয়েমানুষটি আর কেউ নয়—গোমতী।

চার বছর বাদে তারানাথ মিশ্রর রথযাত্রায় গোমতীর সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবে, এটা কে ভাবতে পেরেছিল! বহুদিনের জমানো প্রচণ্ড আক্রোশ নাটোয়ারের মাথার ভেতর একটা হিংস্র জানোয়ারকে যেন উসকে দিতে থাকে। নিজের অজান্তেই চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে তার। দাঁতে দাঁত চাপে নাটোয়ার। গোমতীকে খুন করার সেই পুরনো ইচ্ছাটা তাকে ক্রমশ পেয়ে বসতে থাকে। টের পায়, কপালের দু পাশের রগগুলো সমানে লাফাচ্ছে আর সেগুলোর ভেতর দিয়ে আগুনের হল্কার মতো কিছু ছুটে যাচ্ছে।

গোমতী ভিড়ের ভেতর নাটোয়ারকে লক্ষ করেনি। সে সোজা টাঙ্গাগুলোর কাছে চলে যায়। অনেকটা রাস্তা দৌড়ে আসার কারণে হাঁপাচ্ছিল গোমতী। জোরে শ্বাস টানতে টানতে হাতজোড় করে দুমরলালদের উদ্দেশে বলে, 'ওধারের গাঁওগুলোতে শুনলাম রথের সঙ্গে গেলে দুফারে খাওয়ানো হবে।' সে বুঝতে পেরেছে, টাঙ্গা মাটাডোর বা মোটরে যারা রয়েছে তারাই রথযাত্রার আয়োজন করেছে। খেতে হলে এদেরই ধরতে হবে। সে যেদিক থেকে আসছে দুমরলালদের টাঙ্গাটা সেদিক থেকে সামনে পড়ে বলে গোমতী প্রথমে তাদেরই কাছে গেছে।

দুমরলাল বলে 'হাঁ, খাওয়ানো হবে।' বড়িয়া ভোজনের ওপর সে আগের চেয়েও বেশি জোর দেয়।

'আমি আপনাদের সঙ্গে যাব।'

'ঠিক হ্যায়।' মিছিলের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দুমরলাল বলে, 'ওদের সঙ্গে

আয়।'

মুহূর্তে গোমতী ক্ষুধার্ত জনতার মধ্যে মিশে যায়।

নাটোয়ার গোমতীর দিক থেকে নজর সরায়নি। জ্বলন্ত চোখে পলকহীন সে তাকে দেখে যাচ্ছিল।

পাশ থেকে আবছা গলায় ফকিরা ডাকে, 'এ নাটুয়া—'

নাটোয়ার অন্যমনস্কর মতো সাড়া দেয়, 'হাঁ—'

ফকিরা তার শীর্ণ আঙুল গোমতীর দিকে বাড়িয়ে বলে, 'ও তোর সেই ঘরবালী না?'

'হাঁ।'

'কী যেন নাম ছিল?'

'গোমতী।'

ফকিরা নিজের মনে নিচু গলায় বলে যায়, 'চার সাল আগে ভেগে গিয়েছিল। আচানক এখানে এল কী করে?'

নাটোয়ার উত্তর দেয় না। শরীরের সব রক্ত যেন তার চোখে গিয়ে জমা হয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে সে দুটো যেন ফেটে যাবে।

তারানাথজির রথযাত্রা, চারপাশে অগুণতি মানুষের থিকথিকে ভিড়, ব্যান্ডপার্টির বাজনায় 'বোল রাধা বোল' ইত্যাদি সমস্ত কিছুই নাটোয়ারের সামনে থেকে যেন মুছে গেছে। উন্মত্তের মতো লোকজন সরিয়ে গোমতীর দিকে পা বাড়ায় সে।

ফকিরা নাটোয়ারের ওপর নজর রেখেছিল। চার বছর আগে এক বদমাস হারামজাদের সঙ্গে ভেগে যাওয়া নিজের 'বিয়াহী আওরাত'কে (বিবাহিত স্ত্রীকে) দেখামাত্র নাটোয়ারের কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সেটা আগেভাগেই আন্দাজ করে নিয়েছিল ফকিরা। দ্রুত হাত বাড়িয়ে নাটোয়ারের একটা হাত ধরে ফেলে সে। বলে, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'ভূচ্চরের ছৌরী ঐ রেন্ডিটাকে খতম করতে।'

'শান্ত হো যা নাটুয়া। এখন শির গরম করিস না।'

'নেহীঁ—' এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নেয় নাটোয়ার।

ফকিরা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তার অসুস্থ রুগ্ণ দেহের অবশিষ্ট শক্তিটুকু দিয়ে ফের নাটোয়ারকে ধরে ফেলে। 'পাগল হয়ে গেলি নাটুয়া! হোঁশমে আ যা, হোঁশমে আ যা।' সে বোঝাতে থাকে, এখানে গোমতীর গায়ে হাত দিলে তার ফলাফল হবে মারাত্মক। মিছিলের জনতা তো বটেই, টাঙ্গা মোটর এবং জিপ

থেকে নেমে তারানাথজির নিজস্ব বাহিনী নাটোয়ারকে মেরে একেবারে মাটিতে পুঁতে ফেলবে।

এবার খানিকটা কাজ হয়। ফকিরা যা বলেছে তা ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা ঠিক। রথযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটালে দুমরলালেরা তাকে ছেড়ে দেবে না। ওরা তো জানে না, নাটোয়ারের সঙ্গে গোমতীর সম্পর্কটা কী আর ঐ আওরতটা কতখানি বদ! গোমতীর দিকে আর পা না বাড়ালেও মাথার ভেতর অসহ্য রাগ আগুনের চাকার মতো ঘুরতে থাকে। দাঁতে দাঁত ঘষে চাপা হিংস্র গলায় নাটোয়ার বলে, 'তুমি দেখে নিও চাচা, রেন্ডিটাকে আমি ছাড়ব না।' চার বছর ধরে যে প্রতিহিংসা এবং আক্রোশ সে পুষে রেখেছে তা না মেটানো পর্যন্ত তার শান্তি নেই।

ভারতমাতা রথ এক পলকের জন্যও থামে না। বৈশাখের উল্টোপাল্টা হাওয়ায় ব্যান্ডপার্টির মাতিয়ে-দেওয়া সুর ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে যায়, 'বোল রাধা বোল, সঙ্গম হোগা কি নেহীঁ—'

॥ তিন ॥

অনেকক্ষণ চলার পর ফের একটা গ্রামের দেখা পাওয়া যায়। নাম ঘাটমপুরা।

গতকাল আর পরশু দুর্দান্ত পাবলিসিটির কারণে আগে থেকেই গেয়ো লোকজন এসে এখানে হাইওয়ের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। ভিড়ের ভেতর অনেকের হাতেই ফুল আর মালা দেখা যাচ্ছে, মেয়েদের কেউ কেউ শাঁখ নিয়ে এসেছে। ভারতমাথা রথকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এই বিশেষ আয়োজন। অবশ্য আগের গাঁ-টায় এই সব ফুল শাঁখটাখ দেখা যায়নি।

রথ কাছাকাছি এগিয়ে আসতেই শাঁখ বেজে ওঠে। যাদের হাতে ফুলটুল ছিল, তারানাথ মিশ্রর মাটাডোরে খুব ভক্তিভরে অঞ্জলি দেবার মতো করে সেগুলো ছুঁড়ে দেয়।

গ্রাম এলেই ভারতমাতা রথের গতি কমে যায়। ঘাটামপুরাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটে না।

ওদিকে মহাদেও-এর ইঙ্গিতে ব্যান্ড পার্টি ফিল্মের গান থামিয়ে দিয়েছিল। তার বদলে দুমরলালদের মুহুর্মুহু স্লোগানে চারিদিক কেঁপে ওঠে।

'ভারতমাতাকি—'

'জয়।'

'ভবিষ্য যাত্রা—'

'জিন্দাবাদ।'

'ভারতমাতাকে লাল তারানাথজি—'

'জিন্দাবাদ।'

'মহান ধরমকো—'

'রক্ষা কর।'

'মহান ভারতকা—'

'রক্ষা কর।'

স্লোগান থামিয়ে আগের বারের মতোই দুমরলাল রথযাত্রা এবং আধারশিলা প্রতিষ্ঠার মহান উদ্দেশ্য জানিয়ে দেয়। তারপর বড়িয়া ভোজনের টোপ নাকের সামনে ঝুলিয়ে মিছিলের জন্য আরো কিছু লোকজন জুটিয়ে ফেলে।

রথের গতি আবার বেড়ে যায়।

এত স্লোগান, ফুল ছোঁড়া, শাঁখের আওয়াজ, কোনোদিকেই কিন্তু লক্ষ্য নেই নাটোয়ারের। তার চোখ গোমতীর ওপর স্থির হয়ে আছে।

গোমতী মিছিলের সামনের দিকে, দুমরলালদের টাঙ্গার কাছাকাছি রয়েছে। সে এখনও নাটোয়ারকে দেখতে পায়নি।

এধারে একটানা মাইল তিনেক হাঁটার জন্য ক্লান্তিতে হাত-পায়ের জোড় আলগা হয়ে আসছিল ফকিরার। ধুঁকতে ধুঁকতে পা ফেলছে সে। মনে হচ্ছে আর বুঝি পারবে না, মুখ থুবড়ে ঘাড় গুঁজে পড়ে যাবে।

একসময় ফকিরা পাশ থেকে ফ্যাসফেসে, ক্ষীণ গলায় ডাকে, 'নাটুয়া—'

প্রথমটা শুনতে পায় না নাটোয়ার। বার কয়েক ডাকাডাকির পর ফকিরা যখন তার কাঁধের ওপর হেলে পড়েছে সেই সময় চমকে উঠে ফকিরাকে ধরে ফেলে। ফকিরার ক্লান্ত ধসে-পড়া চেহারা দেখে রীতিমত ভয় পেয়ে যায় নাটোয়ার। গোমতীর কথা এখন আর মাথায় নেই তার। উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে চাচা?'

'আমার কোমরটা ভেঙে আসছে।'

'চল, দুমরলালজির কাছে তোমাকে নিয়ে যাই। তোমার বুরা হাল দেখলে জরুর কিরপা করে ছেড়ে দেবে। বলব আমি তোমাকে গাঁয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। তা হলে আমাকেও আটকে রাখবে না।'

ফকিরা আঁতকে ওঠে, 'নেহীঁ নেহীঁ, এতটা রাস্তা এলাম। দুফারের খানা না খেয়ে যাব না। এখন চলে গেলে কে আমাদের খেতে দেবে? তুই আমাকে ধরে ধরে নিয়ে চল।' আকাশের দিকে তাকিয়ে বেলাটা আন্দাজ করে ফের বলে, 'এখন আর মলটারিজির হাউলিতে গিয়ে ফায়দা নেই।'

'হাঁ।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে নাটোয়ার।

চলতে চলতে নাটোয়ারের গায়ের ওপর শরীর এলিয়ে দেয় ফকিরা। যত রুগ্‌ণই হোক, একটা বয়স্ক মানুষের দেহের ভার নিজের দুই হাত এবং বুকের বাঁ পাশে নিয়ে হাঁটতে জিভ বেরিয়ে আসতে থাকে নাটোয়ারের। সেই ভোরবেলা দু'খানা বাসি লিট্টি আর খানিকটা সেদ্ধ রামদানা খেয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। তারপর এক মুহূর্তও না থেমে মাইলের পর মাইল খোলা আকাশের তলা দিয়ে অনবরত হেঁটে চলেছে। খিদেয় পেটের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে। তার ওপর মারাত্মক ক্লান্তি তো রয়েছেই।

ঘাটমপুরার পর চৌহারি, বাজরিয়া, তহশিলা ইত্যাদি গাঁ পেরিয়ে ভারতমাতা রথ একসময় বিরাট এক বাঁকের মাঝখানে এসে যায়। আকাশ-ভরা ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে, সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। বিকেল হতে আর বেশি দেরি নেই।

নাটোয়ার একটু লক্ষ করলে খানিক দূরে হাইওয়ের ডান পাশে একটা বেশ বড় গঞ্জমতো জায়গা দেখতে পেত। কিন্তু কোনোদিকেই তার খেয়াল নেই। নিজের হাত আর বুক ছিঁড়ে পড়লেও খুব যত্ন করে এমনভাবে ফকিরাকে আগলে আগলে নাটোয়ার নিয়ে চলেছে যাতে তার এতটুকু কষ্ট না হয়। কিন্তু নাটোয়ারের নজর বরাবরই রয়েছে সেই বদ মেয়েমানুষ অর্থাৎ গোমতীর ওপর। নাটোয়ার তাকে ছাড়বে না।

গোমতী শিরদাঁড়া সিধে রেখে সামনে তাকিয়ে দুমরলালের টাঙ্গার পেছন পেছন হেঁটে যাচ্ছিল। হঠাৎ কী কারণে কে জানে সে একবার মুখ ফিরিয়ে তাকায় আর তখনই নাটোয়ারকে দেখতে পায় এবং দেখামাত্রই চিনে ফেলে। মুহূর্তে তার মুখ ভয়ে আতঙ্কে একেবারে রক্তশূন্য হয়ে যায়।

ওদিকে মাইকে তখন মহাদেওজির ভারী গলা ভেসে আসছে, 'ভাইয়োঁ আইর বহনোঁ, হামলোগ নহরগঞ্জ পঁহুছ গয়ে।'

সঙ্গে সঙ্গে ভারতমাতা রথ-এর বিশাল কনভয় থেমে যায়।

॥ চার ॥

হাইওয়ের ডান পাশে নহরগঞ্জ মাঝারি ধরনের একটা শহর। শহরটার গা ঘেঁষে প্রচুর ধান চাল গেঁহু তিল তিসি ঘি চিনি ইত্যাদি নানা জিনিসের বিশাল বিশাল আড়ত। আছে কাঠের গুদাম, করাত কল, ইটভাটা, আটা চাকি এবং লেদ আর মোটর সারাইয়ের কারখানা। তা ছাড়া মিঠাই, জামাকাপড় কড়ুয়া তেল থেকে শুরু করে যাবতীয় কিছুর সারি সারি দোকান। হাইওয়ে দিয়ে অজস্র ট্রাক বা বাস চলাচল করে বলে একটা বেশ বড় পেট্রল পাম্পও রয়েছে। বিজলিও এসে গেছে। চারপাশের বিশ পঞ্চাশটা গাঁয়ের মানুষজন তাদের নানা দরকারে এখানে ছুটে আসে।

গঞ্জটা হাইওয়ের গায়েই। জায়গাটা সারাক্ষণই গম গম করতে থাকে।

এই মুহূর্তে অগুণতি মানুষ রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। ঘাটমপুরা, চৌহারি ইত্যাদি গাঁয়ে দু-চারজনকে ফুল বা শাঁখ হাতে দেখা গিয়েছিল। এখানে প্রায় সবার হাতেই ফুল মালা বা শাঁখ।

ভারতমাতা রথ-এর জন্য তারা বোধহয় অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে। রথটা থামতেই একেবারে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। তারানাথ মিশ্রর ওপর চারিদিক থেকে পুষ্পবৃষ্টি শুরু হয়। সেই সঙ্গে ঘন ঘন শাঁখের আওয়াজ।

এরই মধ্যে মাইকে গমগমে গলা চড়িয়ে মহাদেও বলে, 'বোলো ভারতমাতাকি—'

চারপাশের অসংখ্য মানুষ গলা মিলিয়ে সাড়া দেয়, 'জয়—'

রথযাত্রার নানা কাজকর্মকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল তারানাথের লোকজনেরা। সেই অনুযায়ী স্লোগান দেবার কথা দুমরলালের। কিন্তু নহরগঞ্জে পৌঁছে এই দায়িত্বটা সে নিজের হাতেই তুলে নিয়েছে মহাদেও।

মহাদেও থামেনি, সে সমানে চেঁচিয়ে যায়, ভবিষ্য যাত্রা।

'জিন্দাবাদ।'

'তারানাথ মিশ্রজি—'

'জিন্দাবাদ।'

স্লোগানে স্লোগানে বেশ খানিকক্ষণ জায়গাটাকে সরগরম করে রাখে মহাদেও। তারপর একটু থেমে কণ্ঠস্বর খানিকটা নামিয়ে মিছিলের লোকজনের উদ্দেশে বলতে থাকে, 'ভাইয়ো আউর বহনো, আপনারা অনেকটা রাস্তা হেঁটে

এসে বিলকুল থকে গেছেন। এখন ঐ সামিয়ানার তলায় গিয়ে আরাম করুন। পন্দ্র বিশ মিনিটের ভেতর তারানাথজির আধারশিলা বসানো হয়ে যাবে। তারপর আপনাদের ভোজন করানো হবে। হুড়োহুড়ি করবেন না। ধীরেসে পন্ডালের তলায় গিয়ে বসুন—' বলে খানিক দূরে একটা তেরপলের প্রকাণ্ড প্যান্ডেল দেখিয়ে দেয়।

এতটা হেঁটে আসার ধকলে জীবনশক্তি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে ফকিরার। যদিও নাটোয়ার তাকে ধরে ধরে এনেছে তবু তার পা তো ছিল রাস্তার শক্ত, জমাট পীচের ওপর। সেই পা ফেলে ফেলে তাকে নিজের শরীর খানিকটা টানতেও হয়েছে। নাটোয়ারের ওপর পুরোটা নির্ভর করতে হলে তার কাঁধে চড়তে হ'ত। সেটা তো আর সম্ভব ছিল না।

শেষ দিকটায় অসীম ক্লান্তিতে চোখ বুজে গিয়েছিল ফকিরার। চারপাশের হাঁকাহাঁকি আর হইহইতে ধীরে ধীরে তাকায় সে। ডাকে, 'নাটুয়া—'

নাটোয়ার গোমস্তীর দিকে চোখ রেখেই সাড়া দেয়, 'হাঁ—'

'আর খাড়া থাকতে পারছি না রে ; আমাকে কোথাও বসিয়ে দে।'

'সিরিফ বসবে কেন, তোমার শোয়ারও ব্যওস্থাও করে দিচ্ছি। আরেকটু কষ্ট করে চল।'

ওধারে ভারতমাতা রথ থেকে তারানাথ মিশ্রকে সসম্মানে এবং বিপুল সমারোহ করে নামানো হয়েছে। তাঁর গলায় এত ফুলের মালা চড়ানো হয়েছে যে সারা শরীর প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে।

শুধু তারানাথ মিশ্রই নামেননি, ট্রাক টাঙ্গা এবং প্রাইভেট কার থেকে রথযাত্রার অন্য লোকজনেরাও নেমে পড়েছে। ট্রাকে যারা ছিল তারা সেই ঢাউস ঢাউস অগুণতি সিলভারের ডেকচি গামলা হাতা এবং পাঁজা পাঁজা শালপাতা নামিয়ে ধরাধরি করে প্যান্ডেলের দিকে চলে যায়। কয়েকজন আবার সিমেন্ট বালির বস্তা, শ্বেত পাথরের বড় বড় টুকরো বেশ কিছু ইঁট ইত্যাদি নিয়ে চলেছে।

অন্যদিকে তারানাথ মিশ্রকে সামনে রেখে হাতজোড় করে নহরগঞ্জের লোকজনেরা এবং রথযাত্রার সঙ্গে যারা মোটর আর জিপ টিপে এসেছিল তারা সবাই লাইন করে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে আগের সেই স্লোগানগুলো দিতে দিতে প্যান্ডেলের দিকে এগিয়ে যায়।

আর যে হাভাতেরা দল বেঁধে ভারতমাতা রথ-এর পেছনে বঢ়িয়া ভোজনের আশায় মাইলের পর মাইল হেঁটে এসেছে তারাও প্যাণ্ডেলের দিকে চলেছে।

তবে অন্যদের মতো ভদ্র এবং শোভনভাবে নয়। ধাক্কাধাক্কি গুঁতোগুঁতি আর হল্লা করতে করতে তারা দৌড়ুচ্ছে। নিয়ম শৃঙ্খলার ব্যাপারগুলো তাদের ভাবনা চিন্তা এবং আচরণের মধ্যে একেবারেই খাপ খায় না। এদের ভয়, আগে না পৌঁছুতে পারলে ভাল ভাল খাদ্যবস্তুগুলো হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

ফকিরাকে জড়িয়ে ধরে দৌড়ুনো সম্ভব না, তবু যতটা জোরে পারা যাচ্ছে, নাটোয়ার পা চালাতে চেষ্টা করছে। তবে গোমতীকে এক পলকের জন্যও নজরের বাইরে যেতে দিচ্ছে না।

নাটোয়ারের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ার পর গোমতী প্রচণ্ড ভয়ে কী করবে, প্রথমটা ভেবে উঠতে পারেনি। হয়ত সে পালিয়েই যেত কিন্তু অদৃশ্য এক ফাঁদে সে যেন আটকে গেছে। তা ছাড়া গোমতী খুবই ক্ষুধার্ত। স্রেফ পেটের জন্যই এই ভারতমাতা রথ-এর মিছিলে হাঁটতে শুরু করেছিল।

গোমতী জানে তার সম্পর্কে নাটোয়ারের মনোভাব কতটা হিংস্র এবং বিপজ্জনক। তবুও যে সে পালায়নি তার কারণ দুটো। প্রথমত, এখান থেকে চলে গেলে এখন অন্য কোথাও খাবার জোটানোর সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীয়ত, তার মাথায় তার নিজের মতো অন্য একটা অঙ্কও রয়েছে। ভয়ের মধ্যেও সে ভেবে নিয়েছে, নাটোয়ারের মনে যত রাগ আর আক্রোশই থাক না, রথযাত্রার এত সব লোকজনের সামনে সে তার কোনোরকম ক্ষতি অন্তত করতে পারবে না। তবু নাটোয়ারের ভয়ঙ্কর চাউনি তার বুকের ধকধকানি বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। গল গল করে ঘামতে শুরু করেছিল সে। গোটা রাস্তাটা নাটোয়ারকে এড়ানোর জন্য মিছিলের অন্য লোকেদের আড়ালে আড়ালে থাকতে চেষ্টা করেছিল গোমতী কিন্তু নাটোয়ারের চোখে ধুলো দেওয়া যায়নি।

এখন দলে দলে মিছিলের লোকজন যখন প্যান্ডেলের দিকে দৌড়ুচ্ছে, গোমতী তাদের সঙ্গে বেমালুম মিশে যায়। হাইওয়ে থেকে নেমে বেশ কিছুক্ষণ নাটোয়ার তাকে চোখে চোখে রাখতে পেরেছিল কিন্তু একসময় গোমতীকে আর দেখা যায় না।

তবে কি আওরতটা শেষ পর্যন্ত পালিয়েই গেল? এত বছর বাদে প্রায় হাতের মুঠোতেই তাকে পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু স্রেফ ফাঁকি দিয়েই সে উধাও হয়েছে। রাগে, প্রতিহিংসায় এবং আপসোসে নাটোয়ারের মাথা যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। মনে মনে অকথ্য গালাগাল দিয়ে ফকিরাকে সে বলে, 'চাচা, মনে হচ্ছে রেন্ডিটা ভেগে গেছে।'

ফকিরা বলে, 'নেহীঁ। চার পাঁচ মিল হাঁটল, সে কি ভাগার জন্যে? জরুর

না খেয়ে যাবে না। কোথাও না কোথাও ঠিক আছে। লেকেন—'

'কা?'

'যে আওরত চার সাল আগে তোকে ছেড়ে চলে গেছে তার কথা অত ভাবছিস কেন?'

নাটোয়ার উত্তর দেয় না। তার কপালের শিরাগুলো শুধু একটানা দপ দপ করতে থাকে।

ফকিরা অনেক কষ্টে দুই চোখের পাতা ওপরে তুলে নাটোয়ারের দিকে তাকায়। তারপর বলে, 'কা রে, বিলকুল চুপ হয়ে আছিস যে?'

নাটোয়ার বলে, 'কী বলব?'

ফকিরা বলে, 'ও আওরত পুরা বরবাদ হয়ে গেছে। ওর চিন্তা মাথা থেকে বার করে দে। দুমরলালজির হাতে-পায়ে ধরে এখন খাওয়ার ব্যওস্থা করে ফেল। ভুখে জান বেরিয়ে যাচ্ছে।'

নাটোয়ার নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলে, 'হাতে-পায়ে ধরে ফায়দা নেই। ওদের যখন মর্জি হবে তখন দেবে।'

ফকিরার জীর্ণ পাঁজর তোলপাড় করে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। সে বলে, 'হাঁ, ওদের মর্জির ওপর কথা নেই।'

হাইওয়ে থেকে প্যাণ্ডেলটা মিনিট পাঁচেকের পথ। প্যান্ডেল আর কী, অনেকটা জায়গা জুড়ে লম্বা লম্বা বাঁশ পুঁতে সেগুলোর মাথায় রোদের তেজ ঠেকাবার জন্য তেরপল চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে আকাশে আজ মেঘের যা আনাগোনা তাতে প্যান্ডেল না বানালেও চলত। দু-একদিন আগে অবশ্য তেমন মেঘ টেঘ ছিল না। রথযাত্রাওয়ালারা তো হাত গুণতে জানে না। তারা কিভাবে টের পাবে, আজ অদৃশ্য দিগন্তের ওপার থেকে দলে দলে মেঘের টুকরোগুলো উত্তর বিহারের এই এলাকাটায় হানা দিতে শুরু করবে!

মাথার ওপর ছাউনির ব্যবস্থা হয়েছে ঠিকই কিন্তু নিচে এবড়ো খেবড়ো রুক্ষ কাঁকুরে মাটি। তার ওপরেই কোথাও গাদাগাদি করে, কোথাও বা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে পড়েছে হাজারের দল। ফকিরাকে নিয়ে নাটোয়ারও প্যান্ডেলের এক কোণে চলে আসে। এধার ওধার তাকিয়ে সে বুঝতে পারে মাটিতে ফকিরাকে শোয়ানো যাবে না। তা হলে তার হাড় বার-করা গায়ে কাঁকর ফুটে যাবে, অথচ খানিকক্ষণ শুয়ে নিতে পারলে ক্লান্তিটা অনেক কেটে যেত ফকিরার, তারপর পেটে কিছু পড়লে চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারত। আসলে চাঙ্গা হওয়াটা তার পক্ষে খুবই জরুরি। কেননা, এই নহরগঞ্জে থেমে গেলেই চলবে

না, তাদের আরো কয়েক মাইল হেঁটে পৌঁছুতে হবে নমকিপুরায়। রথযাত্রায় জুটে গিয়ে এক বেলার 'ভোজন' হল সাময়িক ঠেকনা দেওয়া, তাদের আসল কামাইয়ের ব্যবস্থা তো মিলিটারি সিং-এর হাতে।

নাটোয়ার একটা মোটা বাঁশের খুঁটির গায়ে ফকিরাকে ঠেসান দিয়ে বসিয়ে দেয়। বলে, 'চাচা, তুমি থোড়া আরাম কর। আমি খানা-উনার খবর নিয়ে আসি।'

ফকিরার চোখ বুজে এসেছিল। নির্জীব গলায় সেই অবস্থাতেই বলে, 'ঝুট।'

নাটোয়ার চমকে ওঠে, 'কা ঝুট?'

'খানা-উনার খবর নিতে তুই থোড়াই যাচ্ছিস।'

'তা হলে কী করতে যাচ্ছি?'

'তোর পুরানো ঘরবলীকে খুঁজতে।'

হকচকিয়ে যায় নাটোয়ার। আচমকা ধরা পড়ে গিয়ে ফকিরার দিকে তাকাতে পারছিল না সে। কোনোরকমে 'নেহীঁ' বলতে বলতে সে প্যান্ডেলের অন্য দিকে চলে যায় এবং ঘুরে ঘুরে ভিড়ের ভেতর গোমতীকে খোঁজাখুঁজি করতে থাকে।

॥ পাঁচ ॥

হাইওয়ে থেকে চোখে পড়েনি কিন্তু প্যান্ডেলের তলা থেকে বাঁয়ে তাকালে দেখা যায়, ডান পাশে লাল সালু আর মখমল দিয়ে বানানো ছোট কিন্তু চমৎকার একটা চাঁদোয়াও রয়েছে। এতক্ষণ সেটা প্যান্ডেলের আড়ালে ঢাকা পড়ে ছিল।

নহরগঞ্জের লোকজন—বিশেষ করে পয়সাওয়ালা আড়তদার, বড় বড় ব্যাপারী, জমিমালিক আর নানা ধরনের কারখানাওলা—সেই সঙ্গে রথযাত্রার উদ্যোক্তারা তারানাথ মিশ্রকে সোজা সেই চাঁদোয়ার তলায় নিয়ে গিয়ে একটা গদি-মোড়া মহা আরামদায়ক চেয়ারে বসায়। বেশ কয়েকজন হাতজোড় করে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে। এদের সঙ্গে দু'টি ঝকঝকে যুবক এবং একটি তরুণীকে দেখা যায়। যুবকদের পরনে দামী প্যান্ট আর শার্ট। মেয়েটিরও তাই। তিনজনেরই কাঁধে ক্যামেরা এবং হাতে বল পেন আর নোট বই। এরা রথযাত্রার কনভয়ে সেই মোটরটায় বসে ছিল। বোঝা যায়, এরা এ অঞ্চলের গাঁ, এমনকি টাউনের বাসিন্দা নয়। নিশ্চয়ই পাটনা বা কলকাতার মতো ভারী

শহর থেকে এসেছে।

চাঁদোয়ার তলায় পুরো জায়গাটা মাটি কেটে সমান করে ধুয়ে, নিকিয়ে তকতকে করে রাখা হয়েছে। একধারে কাঠের নিচু টুলের ওপর রয়েছে একটা মাইক। ঠিক মাঝখানে খানিকটা চৌকো অংশ তামার চকচকে রড পুঁতে, সেগুলোর গায়ে তামারই তিন ফেরতা টান টান চেইন দিয়ে ঘেরা।

ট্রাক থেকে যারা সিমেন্ট বালি ইটটিট নামিয়ে নিয়ে এসেছিল তারা তাদের মালপত্র ঘেরা জায়গাটার পাশে রেখেছে। একজন কোত্থেকে যেন দুটো পেল্লায় বালতি বোঝাই করে জল নিয়ে আসে।

তারানাথ মিশ্রর চেয়ারটার ডান পাশে তাঁর প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল মহাদেও। তারানাথ তাকে ডেকে নিচু গলায় কিছু বলেন। মহাদেও মাথা কাত করে সায় দেয়। তারপর ভীষণ ব্যস্তভাবে মাইকের সামনে গিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকে, 'ভাইয়ো আউর বহনো, আমাদের পরম পূজ্য আদরণীয় শ্রীমান তারানাথ মিশ্রজী এখন আধারশিলা বসাবেন। তার আগে আপনাদের সামনে দো-চার বাত বলবেন। কৃপা করে আপনারা সবাই ছোটা পন্ডালের কাছে এসে দাঁড়ান, শুধ্ মনে তাঁর কথা শুনুন। আইয়ে, চলা আইয়ে—'

প্যাণ্ডেল এবং চাঁদোয়ার অনেকগুলো খুঁটিতে লম্বা মুখওলা লাউডস্পিকার বাঁধা রয়েছে। মুহূর্তে মহাদেও-এর কণ্ঠস্বর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

যে হাভাতের দল বড় প্যাণ্ডেলে পা ছড়িয়ে বসে ছিল তারা তটস্থ হয়ে উঠে পড়ে এবং চাঁদোয়ার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়ায়।

এমন কি যে নাটোয়ার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে গোমতীকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল, সেও থমকে যায়। আপাতত খোঁজাখুঁজিটা স্থগিত রেখে পায়ে পায়ে চাঁদোয়ার কাছে চলে আসে। মহাদেও-এর ডাক অগ্রাহ্য করার সাহস বা স্পর্ধা কোনোটাই নেই তার।

সবাই এসেছে, শুধু একজন বাদ। সে ফকিরা। তার পক্ষে এখন একটা কদম বাড়ানোও অসম্ভব।

ওদিকে ঘোষণাটি করার পর মহাদেও মাইকের সামনে থেকে সরে যায় আর চেয়ার থেকে উঠে তারানাথ মিশ্র সোজা সেখানে গিয়ে দাঁড়ান। মাইকটা এক হাতে ধরে এভাবে শুরু করেন, 'ভাইয়ো আউর বহনো, আজ দেশকা বহুত ভারী দুর্দিন। যেদিকে তাকাবেন গরিবি, ভুখ, ভ্রষ্টাচার, মহাপাপ, স্বজনপোষণ। গরিব দিনের পর দিন আরো গরিব হচ্ছে, ভুখা আরো ভুখা। আপনারা যারা গাঁওয়ের মানুষ, পিছড়ে বর্গকা আদমী, তাদের জন্যে এই দেশে

ভাবার কেউ নেই। লেকিন কেউ যদি না ভাবে, আপনাদের দিকে হাত বাড়িয়ে না দেয়, এই দেশ বিলকুল খতম হয়ে যাবে। এই দুখদ সময়ে আমি ঘরে বসে থাকতে পারিনি। ভেবেছি কিছু একটা করতে হবে, তাই এই ভারতমাথা রথ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি।'

তারানাথের ঘি-মাখন-চৌঁয়ানো বিপুল শরীরের তুলনায় গলার স্বরটি ভীষণ সরু আর পাতলা ফিনফিনে। হঠাৎ শুনলে মনে হয় কোনো বাচ্চা কথা বলছে। তারানাথের দিকে তাকিয়ে তাঁর গলা শুনলে খুবই বেখাপ্পা লাগে।

ওধারে সেই তিন যুবক-যুবতী ক্যামেরা বার করে চটপট তারানাথের ফোটো তুলতে থাকে।

তারানাথ মিশ্র থামেন নি, 'মহাদেওজির কাছে আপনারা আগেই শুনেছেন, আমি এবার এই এলাকা থেকে চুনাওতে নেমেছি। পয়সা আউর ক্ষমতার লালচ আমার নেই। আমি চাই আপনাদের ভালাই। আপনারা সুখে থাকবেন, দু'বেলা ভরপেট 'ভোজন' করতে পারবেন, আপনাদের ছেলেমেয়েরা সচমুচ শিক্ষা পেয়ে মানুষ হয়ে উঠবে—এ সব আমার স্বপ্ন। তবে স্বপ্ন দেখলেই তো হয় না, কাজ করে দেখাতে হয়। তাই ভাল ভাল কাজের জন্যে আমি আধারশিলা বসাতে বসাতে চলেছি। এই নহরগঞ্জে আমি একটা কলেজ বানিয়ে দেবো, যাতে আপনাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা উচ্চ শিক্ষা পেয়ে দেশকে রোশনিতে ভরে দেবে। চুনাও-এর আগে আগাম শিলান্যাস করে রাখছি। এ হল ভবিষ্য ভারতের আধারশিলা। লেকিন কলেজটা শেষ পর্যন্ত হবে কি না হবে, সেটা বিলকুল আপনাদের ওপর নির্ভর করছে। আপনারা যদি ভোট দিয়ে আগলা চুনাওতে জিতিয়ে দেন, তবেই এটা সম্ভব। আমি আপনাদের ওপর পুরা ভরসা রাখছি।'

বক্তব্য শেষ করে তামার রড দিয়ে ঘেরা সেই চৌকো জায়গাটার কাছে চলে আসেন তারানাথ। এর মধ্যে কখন যেন দুটো লোক জলে বালি আর সিমেন্ট গুলে তা দিয়ে ইট গেঁথে সেখানে একটা বেদী বানিয়ে ফেলেছে। পাশেই রয়েছে একটা শ্বেতপাথরের বড় ফলক।

তারানাথ আসতেই একটা লোক পাথরের ফলকটা বেদীর গায়ে খাড়া করে ধরে রাখে। দ্বিতীয় লোকটা লোহার কর্ণিকে গোলা সিমেন্ট বালি তুলে সসম্ভ্রমে তারানাথের হাতে দেয়। তারানাথ সেই সিমেন্ট-বালি ফলকের পেছনে এমনভাবে লাগিয়ে দিতে থাকেন যাতে সেটা বেদীর গায়ে আটকে যায়।

মহাদেও ফের মাইকের কাছে গিয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'সবাই বল ভারতমাতাকি—'

নহরগঞ্জের আকাশ বাতাস তোলপাড় করে জমিমালিক, আড়তদার থেকে শুরু করে ভুখা হাভাতেরা গলার সবটুকু শক্তি দিয়ে চেঁচায়, 'জয়।'

'তারানাথ মিশ্র—'

'জিন্দাবাদ।'

'ভবিষ্য যাত্রা—'

'জিন্দাবাদ।'

'আগলা চুনাওমে কৌন জিতেগা—'

'তারানাথ মিশ্র, তারানাথ মিশ্র।'

শিলান্যাসটি সুচারুভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর মহাদেও স্লোগান থামিয়ে এবার বলে, 'আজ ভারতমাতা রথ নহরগঞ্জে থেকে যাবে। কাল সকালে আবার রথযাত্রা শুরু হবে। ভাইয়ো আউর বহনো, আপনারা এবার বড় প্যান্ডেলে ফিরে যান। পাঁচ মিনিটের ভেতর আপনাদের 'ভোজন'-এর ব্যওস্থা হচ্ছে। আপনাদের কাছে এক নিবেদন, কাল সুবেহ সুবেহ এখানে এসে রথযাত্রায় সামিল হবেন। যে ক'দিন আধারশিলা বসানো হবে, রোজ দুফারে আপনাদের বড়িয়া 'ভোজন' করানো হবে। আপনাদের ওপর ভরসা আছে, রোজ আমাদের সঙ্গে সামিল হয়ে তারানাথজির আশা 'পূরণ' করবেন আর আপনাদের নিজেদের ভালাই-এর জন্যে রথযাত্রা সফল করবেন। বলুন 'ভারতমাতাকি—'

জয়ধ্বনি দিয়ে হাভাতেরা ফের বড় প্যাণ্ডেলে ফিরে আসে। তাদের সবার সঙ্গে নাটোয়ারও। সে সোজা গিয়ে ফকিরার পাশে বসে পড়ে। ফকিরার চোখমুখের চেহারা দেখে কিছু একটা আন্দাজ করে নেয় সে। চাপা গলায় জিজ্ঞেস করে, 'মালুম হচ্ছে, তুমি আধারশিলা বসানো দেখতে যেতে পারনি।'

ফকিরা বলে, 'কী করে যাই? আমার হাল তো দেখছিস।'

উদ্বিগ্ন মুখে নাটোয়ার বলে, 'তুমি যে যাওনি, দুমরলালজিরা টের পেয়েছে?'

'টের পেলে কি আর এতক্ষণ জিন্দা থাকতাম।' ফকিরার মুখে ফিকে হাসি ফোটে।

একটু চুপচাপ।

তারপর ফকিরা চোখের কোণ দিয়ে নাটোয়ারকে লক্ষ করতে করতে ডাকে, 'এ নাটুয়া—'

'হুঁ।'

'যাকে খুঁজতে গিয়েছিলি তাকে পেলি ?'

'নেহী, শালী উধাও হয়ে গেছে।'

ওদের কথাবার্তার মধ্যে দুমরলাল এবং আরো সাত-আটজন শালপাতার ঠোঙায় চারখানা করে শুকনো চাপাটি, ঠাণ্ডা খানিকটা ভাজি আর কয়েক দানা বুন্দিয়া সবার হাতে হাতে দিতে থাকে।

নাটোয়ার তার চাপাটি-টাপাটি বুঝে নিয়ে ভীষণ হতাশ হয়ে পড়ে। বলে, 'দুমরলালজি, সিরিফ চারগো ! আউর দো চারগো দিজিয়ে না—'

চারপাশ থেকে আরো অনেকে তার সঙ্গে গলা মেলায়, 'দিজিয়ে না, দিজিয়ে না—'

দুমরলাল প্রথমে ভাল কথায় বোঝাতে চেষ্টা করে। মাথাপিছু চারখানা করে চাপাটিই বরাদ্দ করা হয়েছে। তার বেশি দেওয়া সম্ভব না। আসছে চুনাওতে তারানাথজি জিতলে এমন ভোজ খাওয়ানো হবে যে সাত রোজ আর কেউ বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না।

কবে চুনাও হবে, আর কবে তারানাথ মিশ্র সেই চুনাওতে জিতবেন, তার কি ঠিক-ঠিকানা আছে ? হাভাতেরা দূর স্বপ্নময় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অত মাথা ঘামায় না, নগদ ব্যাপার নিয়েই তারা ব্যতিব্যস্ত। নাটোয়ার বলে, 'দুমরলালজি আপনি বলেছিলেন, বঢ়িয়া ভোজন করাবেন। লেকেন—' বলতে বলতে খুব সম্ভব ভয়েই থেমে যায়।

দুমরলাল এবার বেশ বিরক্তই হয়। তার কপাল এবং ভুরু কুঁচকে যায়। চোয়াল শক্ত করে নাটোয়ারের দিকে তাকিয়ে বলে, 'শালে, বঢ়িয়া ভোজন ছাড়া কী ! নিজের ঘরে রোজ কী খাস ? মালাই-পোলাও ?'

বেজায় ঘাবড়ে যায় নাটোয়ার। ঢোক গিলে বলে, 'নেহীঁ নেহীঁ। তবে—'

'কী ?'

'সাত আট 'মিল' পথ হেঁটে এলাম। পেটে আগ জ্বলছে। দুমরলালজি। চারগো চাপাটিতে ভুখ মরবে না।'

'আরে ভূচ্চরকি ছৌয়া, আমাদের জন্যে কি হেঁটেছিস !' সিরেফ আপনা ভালাইকে লিয়ে ভারতমাতা রথ-এর সঙ্গে এসে কেত্তে বড় 'পুণ' করেছিস, জানিস ? তার ওপর চার চারগো চাপাটি মুফত মিলে গেল। এখন আবার বাহানা কত—আরো চাই ! শালেদের পেট তো নয়, পুরা এক একগো গুদাম।' গুদামের উপমা দিয়ে দুমরলাল বোধ হয় মনে মনে খানিকটা খুশিই হয়। সে ফের বলতে থাকে, 'যা পেয়েছিস শির ঝুঁকিয়ে খেয়ে যা।'

উৎকৃষ্ট ভোজনের লোভ দেখিয়ে এতটা রাস্তা হাঁটিয়ে আনার পর সামান্য ক'খানা চামড়ার মতো শক্ত চাপাটিতে পেটের একটা কোণও ভরবে না। পোলাও-মালাই না পাওয়া যাক, পেট ভরার মতো খাবারটা তো দেবে। তারা গরিবের চেয়েও গরিব। রথযাত্রাওলাদের এরকম জঘন্য ধাপ্পাবাজিতে ক্ষোভে রাগে হঠাৎ মাথার ভেতর আগুন ধরে যায় নাটোয়ারের। খেপে উঠে সে কিছু বলতে যাচ্ছিল।

কিন্তু তার আগেই ফকিরা তার একটা হাত চেপে ধরে। খুব চাপা গলায় বলে, 'শান্ত হো যা নাটুয়া। মাথা গরম করিস না।' নাটোয়ার খেয়াল করে নি, দুমরলালের সঙ্গে কথাবার্তার সময় আগাগোড়া ফকিরা তার ওপর নজর রেখে যাচ্ছিল এবং মুখচোখের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিল।

নিজেকে খানিকটা সামলে নেয় নাটোয়ার। ফকিরা ঠিক সময়েই তাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। কেননা সে বুঝতে পারে, এখন উত্তেজনার ঝোঁকে কিছু করে বসলে তার ফল হবে মারাত্মক। দুমরলালরা তার হাড়-মাংস আলাদা করে ফেলবে। ঘাড় গোঁজ করে অগত্যা খেতে শুরু করে নাটোয়ার। গোড়াতেই রথযাত্রাওলারা যদি সাফ সাফ জানিয়ে দিত, শুখা চাপাটি খাওয়াবে, তাদের আক্ষেপ থাকত না। কিন্তু বঢ়িয়া ভোজনের নামে ওরা এতগুলো গরিব মানুষের লোভটাকে উসকে দিয়েছে। তারা স্বপ্ন দেখেছিল দুনিয়ার সবচেয়ে সুস্বাদু সবচেয়ে দুর্লভ খাদ্য তাদের দেওয়া হবে। তার বদলে এমন নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনায় এখন নাটোয়ারের চোখে জল এসে যায়।

নাটোয়ারের মনোভাব বুঝতে পারছিল ফকিরা। সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বলে, 'আমাদের নসীবই অ্যায়সা নাটুয়া। কী আর করা যাবে বল। যা মিলেছে তা-ই খা। ভুখা থাকার চেয়ে তবু তো পেটে কিছু পড়বে। না খেলে আর হাঁটতে পারবি না।'

ঘাড় গোঁজ করে নিঃশব্দে খাওয়া শুরু করে নাটোয়ার। ফকিরাও দুনিয়ার সবটুকু খিদে নিয়ে গোগ্রাসে চাপাটি খেতে থাকে।

বেলা আরো ঢলে পড়েছে। মেঘের ফাঁক দিয়ে যে রোদটুকু চুঁইয়ে চুঁইয়ে আসছে তার তেজও তেমন নেই। আরামদায়ক জলকণাহীন ফুরফুরে হাওয়া নহরগঞ্জের ওপর দিয়ে দূরে হাইওয়ের ওধারে ফাঁকা মাঠের দিকে হু হু বয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ কার ডাক কানে আসতে মুখ তোলে নাটোয়ার। দেখে সেই ঝকঝকে চেহারার তিন যুবক-যুবতী তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের একজনের

হাতে একটা টেপ-রেকর্ডার, অন্য একজনের হাতে ক্যামেরা। শুধু যুবতীটির হাতে কিছু নেই। তার গলাই শুনতে পেয়েছিল নাটোয়ার।

তরুণী বলে, 'আপনার নাম ?'

নাটোয়ার অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার মতো হতচ্ছাড়া চেহারার দেহাতীদের কাছে এইরকম দামী দামী পোশাক-পরা সুন্দর চেহারার ছেলেমেয়েরা এসে দাঁড়াবে, সে ভাবতেও পারেনি। সসম্ভ্রমে নাটোয়ার বলে, 'আপলোগ ?'

তরুণীটি বলে, 'আমরা পত্রকার।'

পত্রকার ব্যাপারটা মাথায় ঢোকে না নাটোয়ারের। সে জিজ্ঞেস করে, 'পত্রকার মতলব ?'

'খবরের কাগজ দেখেছেন তো ?'

'হাঁ হাঁ, জরুর।'

'আমরা সেখানে কাজ করি।'

কতটা কী বুঝল নাটোয়ারই জানে। সে আস্তে মাথা কাত করে বলে, 'অব সমঝ গিয়া। আপ, কাঁহাকে রহনেবালে হ্যায় ?'

তরুণী উত্তর দেয়, 'পাটনা।' নিজের দুই সঙ্গীকে দেখিয়ে বলে, 'এরা আমার বন্ধু। আমরা তিনজন তিন খবরের কাগজ থেকে এসেছি। আপনাদের সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে চাই।'

বিমূঢ়ের মতো নাটোয়ার বলে, 'কহিয়ে—'

'আপনারা কবে থেকে ভারতমাতা রথ-এর সঙ্গে ঘুরছেন ?'

'আজসে। তবে শুনেছি, অনেকে কাল থেকেই ঘুরছে।'

নাটোয়ার খেয়াল করেনি, একটি যুবক টেপ রেকর্ডার চালিয়ে তার কথাগুলো ধরে রাখছে।

তরুণী জিজ্ঞেস করে, 'এই ভারতমাতা রথ-এর সঙ্গে ঘুরতে কেমন লাগছে ?'

'বঢ়িয়া ভোজন'-এর কথা বলে সামান্য ক'খানা শুকনো চাপাটি দেওয়ায় মেজাজ আগেই খারাপ হয়ে ছিল নাটোয়ারের। সে বলে, 'বহোত বহোত বুরা। 'মিল'-এর পর 'মিল' হাঁটতে কার আর ভাল—'

কিন্তু কথাটা আর শেষ করতে পারে না নাটোয়ার। তার আগেই পাঁজরায় ফকিরার কনুইয়ের খোঁচা খায়। ইঙ্গিতটা পরিষ্কার। অচেনা লোকেদের কাছে এ জাতীয় কথা বলা যে ঠিক নয় সেটা তক্ষুনি বুঝতে পারে নাটোয়ার। কে

বলতে পারে পাটনার এই পত্রকারদের মারফত রথযাত্রা সম্পর্কে তার অপ্রিয় কটু মতামত দুমরলালদের কানে গিয়ে উঠবে না। সেটা তার পক্ষে যথেষ্ট বিপজ্জনক। পলকে হুঁশিয়ার হয়ে নাটোয়ার বলে, 'নেহীঁ নেহীঁ, আচ্ছাই লাগতা হ্যায়। ভারতমাতা রথ-এর সঙ্গে যাওয়াটা বহোত 'পুণ্'কা কাম।'

তরুণীটির ঠোঁটে বাঁকা একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়। চোখ সামান্য কুঁচকে মজার গলায় সে বলে, 'স্রেফ 'পুণ্'-এর জন্যে এসেছেন, না খাওয়ার লোভে ?'

এই ছোকরি পত্রকারকে ধোঁকা দেওয়ার কোনো উপায়ই নেই। শ্বাস-টানা গলায় নাটোয়ার বলে, 'নেহীঁ নেহীঁ—'

মেয়েটি এ প্রসঙ্গে আর কোনো প্রশ্ন করে না। একেবারে অন্য কথায় চলে যায়, 'তারানাথ মিশ্র এই যে রথযাত্রায় বেরিয়েছেন তাতে আপনাদের কিছু লাভ হবে ?'

একটু চিন্তা করে নাটোয়ার বলে, 'এত্তে বড়ে আদমী যখন রথ নিয়ে বেরিয়েছেন জরুর ফায়দা হবে।'

তরুণীটি তার সঙ্গীদের দিকে ফিরে হাসে। ইংরেজিতে বলে, 'ইলিটারেট হলে কী হবে, ভেরি কেয়ারফুল অ্যান্ড ডিপ্লোম্যাটিক।'

দুই যুবক তরুণীর দিকে তাকিয়ে আস্তে মাথা কাত করে সায় দেয়, 'রাইট, রাইট।'

নাটোয়ারের কাছে এই সব ইংরেজির একটি বর্ণও বোধগম্য নয়। তবে এটুকু সে বোঝে, তারই সম্বন্ধে ওরা আলোচনা করছে।

তরুণী আবার নাটোয়ারের দিকে মুখ ফেরায়। প্রশ্ন করে, 'তারানাথজি বলেছেন চুনাওতে জিতলে এখানে কলেজ করে দেবেন। তার জন্যে আধারশিলাও বসালেন।'

'হাঁ।'

'কলেজ হলে আপনাদের ভাল হবে ?'

'হামনিলোগ নেহীঁ জানতা। তব্—'

'তব্ কী ?'

'রথবালারা যখন বলছে তখন জরুর ভালই হবে।'

'তারানাথজি কি জিতবেন ?'

'কৌন জানে। তব্ এত্তে বড়ে আদমী যখন চুনাওতে নামতে যাচ্ছেন, মালুম হোতা জরুর জিতবেন।'

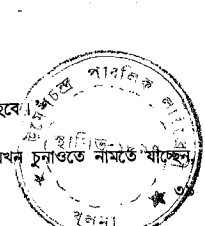

যে যুবকটির হাতে ক্যামেরা রয়েছে এবার সে নাটোয়ার এবং ফকিরার ফোটো তুলে নেয়। তারপর তিন পত্রকার নাটোয়ার আর ফকিরার সামনে থেকে অন্যদের কাছে চলে যায়। সবাইকেই এই রথযাত্রা, আগামী নির্বাচন, সেই নির্বাচনে তারানাথ মিশ্রর জেতার সম্ভাবনা আছে কি না, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করে তাদের জবাবগুলো টেপ-এ তুলে নেয় এবং প্রতিটি দেহাতীর ফোটো তোলে।

খেতে খেতে নাটোয়ার জিজ্ঞেস করে, 'আমাদের ফোটোক খিঁচল কেন চাচা ?'

'কৌন জানে !' ফকিরা এর পর যা বলে তা এইরকম। লোকে পঞ্ছী, পাহাড়, সমুন্দর, ময়ুর, হরিণ, শের, সুন্দর সুন্দর মানুষ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি তোলে। কিন্তু তাদের মতো গা থেকে খই-ওড়া হতচ্ছাড়া চেহারার ভুখা আধন্যাংটো দেহাতীদের ছবি তুলে বড় টৌনের পত্রকারদের কী ফায়দা হবে, কে বলবে। নিশ্চয়ই ঐ তিন পত্রকারের মাথায় কিছু গোলমাল রয়েছে। কতরকম 'আজীব' মানুষ যে দুনিয়ায় জন্মেছে।

'হাঁ—' আবছাভাবে উত্তর দিয়ে আস্তে ঘাড়টা কাত করে দেয় নাটোয়ার।

ওদিকে চাঁদোয়ার তলা থেকে মহাদেও-এর ভারী গমগমে গলা ভেসে আসে। 'ভাইয়োঁ আউর বহনোঁ, আপনাদের যাদের যাদের ইচ্ছে রাতটা এখানে প্যাণ্ডেলের তলায় থেকে যেতে পারেন। কাল ভোরসে ফির রথযাত্রা শুরু হবে। এখন আপনাদের বহোত দরকার। আজকের মতো কালও তারানাথজির আধারশিলা বসানোর পর বঢ়িয়া ভোজন করানো—'

মহাদেও-এর কথা শেষ হওয়ার আগে নাটোয়ারের বাঁ ধারের কয়েকটি দেহাতী চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, দশ 'মিল' গতরচুরণ হাঁটার পর চামড়ার মতো চারগো শুখা চাপাটি ! আমরা আর এর ভেতর নেই। খেয়েই এখান থেকে ভেগে যাব ইত্যাদি। কেউ কেউ আবার বলে, দশ 'মিল' হাঁটলে তবু তো একবেলার খাবার পাওয়া যাচ্ছে। এখান থেকে গেলে তাই বা আমাদের কে দিচ্ছে ! রাতটা এখানেই কাটিয়ে দেবো। যে ক'টা দিন রথ চলবে একটা বেলা খাদ্য তো মিলবে। তারপর দেখা যাবে।

নাটোয়ার এবং ফকিরা ভেগে পড়ার দলে। নাটোয়ার বলে, 'চাচা, খাওয়া হলেই নমকিপুরা রওনা হবে ?'

আকাশের দিকে তাকিয়ে বেলাটা আন্দাজ করে নেয় ফকিরা। বলে, 'এতটা রাস্তা হেঁটে বহোত থকে গেছি। মনে হচ্ছে হাড্ডিউড্ডি ভেঙে চুর চুর হয়ে

গেছে। আজ আর পারব না। কাল ভোরে আন্ধেরা থাকতে থাকতেই আমরা ভেগে পড়ব।'

'সেই ভাল।' বলতে বলতে হঠাৎ নাটোয়ারের চোখে পড়ে, ডান দিকে প্যাণ্ডেলের একেবারে শেষ মাথায় একটা খুঁটির আড়ালে বসে চাপাটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে গোমতী। তার মানে সে পালিয়ে যায়নি। নাটোয়ার কিছুক্ষণ আগে যখন তাকে খোঁজাখুঁজি করছিল সেই সময় সে নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে ছিল। মুহূর্তে যে রাগ এবং আক্রোশটা চাপা পড়ে গিয়েছিল, সেটা মাথার ভেতরে নতুন করে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেয়। মুখ পাথরের মতো শক্ত হয়ে ওঠে তার। আবার যখন গোমতীকে দেখা গেছে লহমার জন্যেও তাকে চোখের বাইরে যেতে দেওয়া হবে না।

গোমতীও নাটোয়ারের ওপর নজর রেখেছিল। চোখের কোণ দিয়ে আড়ে আড়ে তার আগেকার মরদকে দেখতে দেখতে দ্রুত চাপাটি খেয়ে যাচ্ছিল সে।

নাটোয়ার আগের মতো তাড়াহুড়ো করে না। সে জানে, এত লোকজনের মধ্যে গোমতীর গায়ে একটা আঁচড়ও কাটা যাবে না। সুযোগের জন্য তাকে ওত পেতে বসে থাকতে হবে। গোমতীকে নির্জনে একা একা কোথাও পাওয়া দরকার।

এই সময় ব্যান্ডপার্টির বাজনা ফের ভেসে আসে। অনেকক্ষণ থেমে থাকার পর বাজনদারেরা নতুন উদ্যমে বাজাতে শুরু করে দিয়েছে। 'বোল রাধা বোল, সঙ্গম হোগা কি নেহীঁ—' রথযাত্রায় যারা মিছিল করে এসেছিল তাদের 'ভোজন'-এর সময় দিলচস্প গান বাজিয়ে আনন্দ দেওয়া হচ্ছে।

ব্যান্ডপার্টিটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বাজাচ্ছে না, গোটা প্যাণ্ডেলের ধার দিয়ে কখনও বা ভেতরে ঢুকে বাজাতে বাজাতে চলেছে। প্রাণের ভেতর 'লহর তোলা' গানটা নিয়ে আদৌ মাথাব্যথা নেই নাটোয়ারের। সে পলকহীন সজাগ চোখে গোমতীর ওপর লক্ষ রেখে যাচ্ছে। কিন্তু আচমকা ব্যান্ডপার্টিটা গোমতীর এধারে এসে পড়ে এবং সে বাজনদারদের আড়ালে পড়ে যায়। এখন আর তাকে দেখা যাচ্ছে না।

নাটোয়ার অস্থির হয়ে ওঠে। কখনও ঘাড় হেলিয়ে, কখনও তেরছা হয়ে বসে, কখনও বা হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে খানিকটা উঁচু হয়ে বাজনদারদের বাদ্যযন্ত্র বা পায়ের ফাঁক দিয়ে গোমতীকে দেখতে চেষ্টা করে কিন্তু বৃথাই।

এক মিনিটও নয়, তার অনেক আগেই ব্যাণ্ডপার্টি ডান দিকে চলে যায় কিন্তু গোমতীর চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। বদ আওরতটা বাজনদারদের আড়ালে

পড়ামাত্র উধাও হয়ে গেছে।

নাটোয়ারের খাওয়া শেষ হয়নি। তবু লাফিয়ে উঠে পড়ে সে, দৌড়ে সেই খুঁটিটার দিকে যায়, তারপর ডাইনে-বাঁয়ে, এমন কি ওধারে যেখানে মখমলের চাঁদোয়ার তলায় আধারশিলা বসানো হয়েছে, সেখানেও দেখে আসে। কিন্তু নেই নেই, কোথাও নেই গোমতী, বেমালুম হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে আওরতটা।

রাগটা মাথার ভেতর দপ দপ করতে থাকে নাটোয়ারের। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড হতাশাও। ভূচ্চরের ছৌয়া আওরতটাকে বার বার হাতের কাছাকাছি পেয়েও শেষ পর্যন্ত ধরা যাচ্ছে না।

এলোমেলো পা ফেলে আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসে নাটোয়ার। শালপাতার থালায় এখনও দেড়খানা চাপাটি পড়ে আছে। সেদিকে নজর নেই তার। নিজের ভেতর গনগনে আগুনের অসহ্য জ্বালা নিয়ে জ্বলন্ত চোখে দূরে মাঠের দিকে তাকিয়ে সে বসে থাকে।

ফকিরা কিছু একটা আন্দাজ করে নিয়েছিল। সে জিজ্ঞেস করে, 'খেতে খেতে আচানক কোথায় গিয়েছিলি?'

চমকে মুখ ফেরায় নাটোয়ার। বলে, 'এই, ওদিকটা দেখে এলাম।'

'আমাকে কি আন্ধা মনে করিস নাটুয়া?'

'এমন কথা বলছ কেন চাচা?'

'খানিক আগে দেখলাম তোর পুরানা ঘরবালী ঐ ওখানে বসে খাচ্ছিল।' বলে দূরের খুঁটিটা দেখিয়ে দেয় ফকিরা, 'তুই তো তাকে ধরার জন্যেই দৌড়ে গেলি।'

নাঃ, এই আধবুড়ো বীমারী ফকিরাকে এড়িয়ে কিছু করার উপায় নেই নাটোয়ারের। সে চুপ করে থাকে।

ফকিরা এবার বলে, 'তোকে তখনও বলেছি, এখনও বলছি, আওরতটাকে মাথা থেকে বার করে দে। পেটের ধান্দায় আমরা মরছি। বেফায়দা এই সব ঝামেলা জোটাচ্ছিস কেন?'

নাটোয়ার উত্তর দেয় না। মুখ ফিরিয়ে ফের মাঠের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে থাকে।

ফকিরা বুঝতে পারে নাটোয়ারের মাথা থেকে গোমতীকে কোনোভাবেই বার করা যাবে না। হতাশভাবে সে একটু কাঁধ ঝাঁকায়। তারপর বলে, 'তোর চাপাটি তো পড়ে রইল। খেয়ে নে—'

অন্যমনস্কর মতো শালপাতার থালার দিকে হাত বাড়ায় নাটোয়ার।

॥ ছয় ॥

এখনও ভাল করে ভোর হয়নি। যেদিকে যতদূর চোখ যায়, ঝাপসা অন্ধকার। কাল সন্ধের পর আকাশে চাঁদ উঠেছিল। কখন সেটা ডুবে গেছে, কে জানে। চাঁদ না থাকলেও তারা আছে, চাঁদির ফুলের মতো আকাশ জুড়ে অগুণতি রুপোলি তারা।

কাছে এবং দূরে গাছের গুঁড়ির অদৃশ্য গর্তে বসে রাতজাগা কামারপাখিরা মাঝে মাঝে ভৌতিক আওয়াজ করে উঠছে। এ ছাড়া সমস্ত চরাচরে আর কোথাও কোনো শব্দ নেই। গাঢ়, গভীর ঘুমের আরকে গোটা পৃথিবী এখন ডুবে আছে।

হঠাৎ তিন চারটে কামার পাখি একসঙ্গে গলা চড়িয়ে ডেকে ওঠায় ঘুম ভেঙে যায় নাটোয়ারের। চোখ মেলে প্রথমটা সে বুঝতে পারে না কোথায় শুয়ে আছে। পরক্ষণেই অবশ্য সব মনে পড়ে যায়। কাল রাতে তারা নহরগঞ্জের প্যাণ্ডেলেই শুয়ে পড়েছিল। বাঁয়ে তাকাতেই চোখে পড়ে, ফকিরা মড়ার মতো পড়ে আছে। তার দুই চোখ বোজা, খুব ধীরে শ্বাসপ্রশ্বাসের তালে তালে তার রোগা দুর্বল বুক ওঠা-নামা করছে।

কয়েক পলক ফকিরাকে লক্ষ করে নাটোয়ার। তারপর তার দুই চোখ বিশাল প্যাণ্ডেলটার নানা দিকে ঘুরতে থাকে। কাল বিকেলেই ভাজি চাপাটি আর বুন্দিয়ার 'বঢ়িয়া ভোজন' চুকিয়ে মিছিলের লোকজনেরা বেশির ভাগই চলে গেছে। যারা নেহাতই হাভাতের চাইতে হাভাতে, রাত পোহালে একদানা খাদ্য জোটানোর সম্ভাবনাও যাদের নেই তারাই শুধু এধারে ওধারে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। 'ভারতমাতা রথ' যে ক'দিন চলবে, একটা বেলার জন্য তো অন্তত তারা নিশ্চিন্ত। কাল ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, দুমরলালজি, মহাদেওজির কাছে আর্জি জানাবে কৃপা করে তাদের যেন দু'বেলাই খাওয়ানো হয়। তাতে কাজ না হলে সোজা তারানাথজির পায়ে পড়ে যাবে। ছুখা গরিবদের কথা তিনি নিশ্চয়ই শুনবেন। তাদের 'ভালাই'-এর জন্যই তো তিনি এত 'তখলিফ' করে রথযাত্রা শুরু করেছেন, আর তাঁরাও এত তখলিফ করে তাঁর রথের পেছন পেছন মাইলের পর মাইল হেঁটে তাঁকে মদত দিচ্ছে।

অন্ধকার তেমন গাঢ় না থাকায় ঘুমন্ত লোকগুলোকে মোটামুটি দেখা যাচ্ছে কিন্তু এদের ভেতর কোথাও গোমতী নেই। নির্ঘাত সে পালিয়ে গেছে।

মুখ ফিরিয়ে ফকিরার দিকে তাকায় নাটোয়ার। তার গায়ে আস্তে ঠেলা দিয়ে ডাকে, 'চাচা, হো চাচা—'

ফকিরা এক ডাকেই ধড়মড় করে উঠে বসে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলে, 'কা রে, কা হুয়া ?'

'ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। চল, বেরিয়ে পড়ি।'

'হাঁ, চল—'

দু'জনে খুব সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে প্যাণ্ডেলের বাইরে চলে আসে। আর তখনই দেখা যায়, ডান পাশে সেই মখমলের চাঁদোয়ার তলায় দুমরলালরা ঘুমোচ্ছে। তাদের শোওয়ার জন্য অবশ্য রাজকীয় ব্যবস্থা। চওড়া ফিতের চৌপায়ার ওপর ফিনফিনে নেটের মশারি খাটানো রয়েছে। আর নাটোয়াররা কিনা স্রেফ মাটির ওপর শুয়ে হাতে মাথা রেখে সারাটা রাত কাটিয়ে দিল।

প্যাণ্ডেল এবং চাঁদোয়া পেছনে ফেলে একটু এগুতেই চোখে পড়ে, ভারতমাতা রথ-এর পুরো কনভয়টা দাঁড়িয়ে আছে। তিনটে টাঙ্গা থেকে ঘোড়াগুলোকে খুলে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। প্রাণীগুলোর ওপর রথযাত্রার প্রচণ্ড ধকল যাচ্ছে। সেগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে আর লেজ নেড়ে নেড়ে মশা তাড়াচ্ছে।

প্যাণ্ডেল, কনভয়, ঘোড়া, ইত্যাদি এক পাশে রেখে বাঁয়ে খানিকটা হাঁটলেই হাইওয়ে। সড়কটা এই নহরগঞ্জ থেকে সাপের মতো এঁকেবেঁকে দূরে মিলিয়ে গেছে।

হাইওয়ে ধরলে নমকিপুরায় যেতে কম করে মাইল আটেক হাঁটতে হবে। কিন্তু বাঁ দিকের মাঠে নেমে কোণাকুণি পা চালালে রাস্তা বেশ কিছু কমে যাবে। তবে মাঠ যেভাবে এবড়োখেবড়ো ফুটিফাটা হয়ে আছে তাতে হাঁটতে বেশ কষ্ট হয়। অবশ্য এমন কষ্ট করার অভ্যাস নাটোয়ারদের আছে।

ওরা হাইওয়ে পেরিয়ে ওধারের মাঠে নেমে পড়ে।

অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। শেষ রাতের গা-জুড়নো আরামদায়ক হাওয়ায় সর্বন গাছের সুবাস ভেসে আসছে। চারিদিকে, কাছে এবং দূরে বিশাল বিশাল সব গাছ ডালপালা ছড়িয়ে কতকাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে! সেগুলোর মাথা থেকে পাখিদের চেঁচামেচি আর ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ ভেসে আসছে। অর্থাৎ পাখিদের ঘুম ভাঙতে শুরু করেছে।

রোগে-ভোগা অসুস্থ শরীর টেনে টেনে কাল কয়েক মাইল হাঁটার ধকলটা

মাত্র চারখানা শুকনো চাপাটি আর এক রাতের ঘুমে কাটিয়ে উঠতে পারেনি ফকিরা। এই ভোর রাত্তিরে কর্কশ উঁচুনিচু ফাটলে-ভরা মাঠের ওপর দিয়ে পা ফেলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল তার। তা ছাড়া কাল বিকেল থেকেই সে টের পাচ্ছিল, ফের জ্বর আসছে। এখন তার গা বেশ গরম, মাথার ভেতরের রগগুলো যন্ত্রণায় টিপ টিপ করছে। কিন্তু এ সব কথা নাটোয়ারকে জানায় না সে। কোনোরকমে মিলিটারি সিং-এর কাছ থেকে ক'টা টাকা কামাই করে ঘরে ফিরে কমসে কম দিন সাতেক টান টান হয়ে শুয়ে থাকবে।

এই ভোরবেলায় অন্ধকার যখন দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে, দূর দিগন্তে খুব আবছা আলো ফুটতে শুরু করেছে, সমস্ত চরাচর জুড়ে যখন স্নিগ্ধ পবিত্রতা, গাছপালার মাথায় পাখিদের ডাকাডাকি, তখন সে সব দিকে নাটোয়ার বা ফকিরার নজর নেই। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে প্রকৃতির এই আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্যাবলী দেখার মতো মন বা চোখ তাদের নেই। ফকিরার মতো নাটোয়ারও মিলিটারি সিং-এর কথাই ভাবছিল। কাল রথযাত্রার জন্য পারা যায়নি, আজ নিশ্চয়ই মিলিটারিজির সঙ্গে দেখা হবে। চলতে চলতে মনে মনে সময়ের হিসেব কষে নেয় নাটোয়ার। এখনও সকাল হয়নি। তার মানে নমকিপুরায় দুপুরের অনেক আগেই তারা পৌঁছে যাবে।

চলতে চলতে একটা উঁচুমতো জায়গায় ঠোকর লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল ফকিরা। প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধরে ফেলে নাটোয়ার। বলে, 'হুঁশিয়ারিসে পা ফেল চাচা।'

ফকিরা বলে, 'হাঁ, আন্ধেরাতে ঠিক দেখতে পাইনি, তাই ঠোক্কর লেগে বেসামাল হয়ে গেলাম।'

ফকিরাকে ছাড়েনি নাটোয়ার। তাকে দু হাতে ধরে ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ হাতের তেলোতে তীব্র উত্তাপ টের পেয়ে চমকে ওঠে। বলে, 'কা চাচা, আবার কি জ্বরটা এল ! তোমার গা পুড়ে যাচ্ছে। বিলকুল আগ য্যায়সা—'

ফকিরা বলে, 'ও কিছু না। ফিকর নায় করনা।'

ফকিরা উড়িয়ে দিতে চাইলে কী হবে, নাটোয়ারের উদ্বেগ ভয়ানক বেড়ে যায়। এই 'বীমার' রুগ্‌ণ লোকটাকে টানাহ্যাঁচড়া করে নমকিপুরা পর্যন্ত জ্যান্ত নিয়ে যাওয়া যাবে কি না, সে সম্বন্ধে তার মনে ঘোর সংশয় দেখা দেয়। তার আগেই হয়ত এই জনশূন্য মাঠের মাঝখানে তার প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। নাটোয়ার বলে, 'নমকিপুরা পর্যন্ত তুমি কি পায়দল যেতে পারবে চাচা ?' ফকিরার বাড়ি থেকে তাকে নিয়ে আসার সময় এই প্রশ্নটা আরো একবার

করেছিল সে।

ফকিরা বলে, 'পারব, পারব। আমাকে পারতেই হবে।'

'বেফায়দা জেদ করো না চাচা। এখনও বেশি দূর আমরা যাইনি। চল, নহরগঞ্জে ফিরে যাই। ওখানে জিরিয়ে নিও। তারপর লরীবালাদের হাতে-পায়ে ধরে তাদের গাড়িতে তুলে দেবো। ওরা জরুর তোমাকে তোমাদের গাঁও-এ পৌঁছে দেবে।'

ফকিরা এবার খেপে যায়। দুর্বল শরীরে গলার স্বর যতটা চড়ানো যায়—চড়িয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'মতলব কী তোর? আমি, আমার জরু, বালবাচ্চা সবাই না খেয়ে মরি? মেহেরবানি করে তুই সিরিফ আমাকে ধরে নিয়ে চল।'

ফকিরা কেন এতটা জেদ ধরেছে তা তো আর নাটোয়ারের অজানা নয়। সে বলে, 'ঠিক হ্যায়, তোমার যা মর্জি—' ফকিরার কথামতো তাকে ধরে ধরে নিয়ে চলে নাটোয়ার।

একসময় দিগন্তের তলা থেকে সূর্য উঠে আসে। তবে কালকের মতো আজও আকাশ জুড়ে প্রচুর মেঘ রয়েছে। সে সবের ফাঁক দিয়ে সোনার লম্বা লম্বা ফলার মতো রোদ এসে পড়ছে মাঠঘাট গাছপালার ওপর। পরদেশী শুগার ঝাঁক উড়ে উড়ে চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। আর চলেছে সিল্লি এবং মানিকপাখির দল। অনেক দূরে আবছা আবছা একটা পাহাড়ের রেঞ্জ আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হোঁচট খাওয়ার পর বেজায় কাবু হয়ে পড়েছিল ফকিরা। এখন অনেকটা সামলে উঠেছে। সে বলে, 'এবার আমাকে ছেড়ে দে নাটুয়া।'

নাটোয়ার বলে, 'ছেড়ে দিলে হেঁটে যেতে পারবে?'

'দেখি কোসিস করে। না পারলে তুই তো আছিসই।'

'ঠিক হ্যায়।'

দিনের আলো ফোটায় এখন সব কিছুই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেখেশুনে ধীরে ধীরে পা ফেলছে ফকিরা।

ওরা এখন যেখানে এসে পড়েছে তার সামনের দিকে ট্যারাবাঁকা চেহারার অগুণতি সিসম আর পিপর গাছের জটলা।

ফকিরার পাশাপাশি চলতে চলতে হঠাৎ নাটোয়ারের চোখে পড়ে, একটা মেয়েমানুষ সিসম আর পিপর গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে দিয়ে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে। তার মুখটা সামনের দিকে, তাই পেছন থেকে দেখা যাচ্ছে না। তবে ওভাবে

পা ফেলে হাঁটার ভঙ্গিটা নাটোয়ারের খুবই চেনা। তা ছাড়া সবুজ রঙের ঐ শাড়ি আর লাল জামাটাও তার অচেনা নয়। কাল প্রায় সারাদিনই গোমতীর গায়ে ওগুলো দেখা গেছে।

নাটোয়ারের চোখ ধারাল হয়ে ওঠে। মাথার ভেতর যে আক্রোশটা সাময়িক চাপা পড়ে গিয়েছিল, ফের সেটা দপ্ করে জ্বলে ওঠে। পরক্ষণে উন্মাদের মতো সে সিসম গাছগুলোর দিকে দৌড়ুতে থাকে।

ফকিরাও গোমতীকে দেখতে পেয়েছিল। যদিও তার স্নায়ু দুর্বল, নতুন করে জ্বর আসায় মস্তিষ্কে ভাবার মতো শক্তি বিশেষ নেই, তবু নাটোয়ার তার বিশ্বাসঘাতিনী পুরনো ঘরবালীকে ধরতে পারলে ফলাফল কী হতে পারে, মুহূর্তে আন্দাজ করে নেয়। ভয়ার্ত গলায় সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'মাত্ যা নাটুয়া, মাত্ যা—'

গোঁয়ার, প্রতিহিংসাপরায়ণ নাটোয়ারের কানে কিছুই ঢোকে না। অন্ধ এক খ্যাপামি তার কাঁধে ভর করে তাকে ছুটিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। ফকিরা বেঁচে থাকতে কিছুতেই চোখের সামনে হত্যাকাণ্ড ঘটতে দেবে না; বিশেষ করে নারীহত্যা। ভাঙাচোরা, বোখারে জীর্ণ শরীরে যেটুকু শক্তি এখনও তলানির মতো পড়ে রয়েছে তা জড়ো করে অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে গাছের সেই জটলাটার দিকে সে-ও তীরের মতো ছুটে যায়।

ওদিকে গোমতীর কাছাকাছি চলে এসেছিল নাটোয়ার। পায়ের শব্দে চমকে পেছন ফিরতেই আতঙ্কে গোমতীর মুখ একেবারে ছাইবর্ণ হয়ে যায়, চোখদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। কোনোরকমে একটা হাত ওপরে তুলে সে বলে, 'নেহীঁ নেহীঁ—'

মাথায় খুন চড়ে গিয়েছিল নাটোয়ারের। তার চোখ এখন টকটকে লাল, একজোড়া রক্তের ডেলার মধ্যে যেন দুটো কালচে তারা ধক ধক করছে। তার গলার ভেতর থেকে জান্তব আওয়াজ বেরিয়ে আসতে থাকে, 'শালী, রেণ্ডি কাঁহিকা, কাল থেকে আমার আঁখে দশবার ধুলো দিয়েছিস। অব্ নেহীঁ ছোড়ুঙ্গা। জরুর তুহারকা জান লে লুঙ্গা—' বলে হিংস্র বুনো শুয়োরের মতো সে গোমতীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে, সেই সময় মেয়েমানুষটির মস্তিষ্কে কী এক প্রতিক্রিয়া ঘটে যায়। সে প্রায় লাফ দিয়ে সটান নাটোয়ারের পায়ের ওপর পড়ে যায়। দুই হাতে তার দুই পা প্রবল শক্তিতে আঁকড়ে ধরে মাথা ঠুকে ঠুকে বলতে থাকে, 'হামনিকো মাফ কর, মাফ কর। বহোত বড়া পাপ কিয়া হামনি, বহোত কসুর হুয়া।'

ঘটনার আকস্মিকতায় একেবারে থ হয়ে যায় নাটোয়ার। সে ভেবেছিল, তাকে দেখামাত্র ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাবার চেষ্টা করবে গোমতী কিন্তু এভাবে তার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়বে, তা কে জানত !

জ্বলন্ত চোখে দুশ্চরিত্র আওরতটার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে নাটোয়ার, তারপর প্রচণ্ড শক্তিতে পা ঝাড়া দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করে কিন্তু এত জোরে মেয়েমানুষটা তার পা নিজের বুকের ভেতর জাপটে ধরে রেখেছে যে কিছুতেই ছাড়ানো যায় না। অগত্যা ছাড়াবার জন্য গোমতীর রুক্ষ জট-পাকানো চুলের গোছা ধরে যখন সে টানতে যাবে, হাঁপাতে হাঁপাতে ফকিরা এসে পড়ে। এতটা দৌড়ে আসার কারণে তার হাড়পাঁজরা-বার-করা শীর্ণ বুক তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে, চোখ আর জিভ ঠেলে বেরিয়ে আসছে। তারই মধ্যে সে শ্বাস-টানা তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করতে থাকে, 'আওরতের গায়ে হাত তুলিস না নাটুয়া। উসকো মাত্ মার, মাত্ মার—' বলতে বলতে নাটোয়ারের কোমর ধরে প্রাণপণে তাকে টানতে থাকে। গোমতীকে বলে, 'ছোড় দে উসকা পাও, ছোড় ছোড়—'

ফকিরা এসে পড়ায় খানিকটা কাজ হয়। গোমতী অনেকখানি ভরসা পেয়ে যায়। নাটোয়ারের সঙ্গে শাদি হওয়ার পর থেকেই সে ফকিরাকে চেনে। এমন সাদাশুধা ভালমানুষ দুনিয়ায় ক্বচিৎ কখনও চোখে পড়ে। গোমতী ব্যাকুলভাবে বলে, 'হামনিকা বচাও চাচা, বচাও—'

'ঠিক হ্যায়। তুই পা ছাড় আগে—'

ফকিরার কথায় হাতের বাঁধন আলগা করে দেয় গোমতী। ভীত, সতর্ক ভঙ্গিতে নাটোয়ারের দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে উঠে বসে।

ফকিরা এসে পড়ায় নাটোয়ারের মাথায় যে রাগটা চড়ে গিয়েছিল সেটা অনেকটা ঠাণ্ডা হয়। তবে গলার ভেতর থেকে সেই চাপা জান্তব আওয়াজটা বেরুতেই থাকে, 'শালী, ভুচ্চরকা ছৌরী—'

উত্তেজনায় ক্লান্তিতে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না ফকিরা। সে মাটির ওপর শুয়ে পড়ে জোরে জোরে শ্বাস টানতে থাকে। ফুসফুসের সঙ্গে বাইরের বাতাসের যোগাযোগ রাখতে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল।

ফকিরার ডান পাশে মুখ নিচু করে চুপচাপ বসে আছে গোমতী। বাঁ ধারে তেরছা হয়ে বসেছে নাটোয়ার। আর মাঝে মাঝেই আরক্ত চোখে বিশ্বাসঘাতিনী পুরনো স্ত্রীকে লক্ষ করছে। তার দৃষ্টিতে দুনিয়ার সবটুকু ঘৃণা রাগ এবং বিদ্বেষ। নেহাত ফকিরা চাচা এসে পড়েছিল, নইলে গলা টিপে

আওরতটাকে শেষ করে ফেলত সে।

অনেকক্ষণ সাঁই সাঁই করে শ্বাস টানার পর কিছুটা সামলে নেয় ফকিরা একসময় হাতের ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসে। প্রথমে নাটোয়ারকে দেখে সে, তারপর মুখ ফিরিয়ে গোমতীকে লক্ষ করে। বলে, 'একগো বাত পুছুঙ্গা বহু ?' গোমতীকে চার বছর আগে 'বহু' বলেই ডাকত সে, সেটা এখনও ভোলেনি।

প্রায় হাঁটুর কাছে থুতনি নামিয়ে এখনও বসে আছে গোমতী। আবছা গলায় সে বলে, 'কা ?'

'তোর ওপর নাটুয়া কেন এত গুস্সা হয়ে আছে, জরুর জানিস— কা রে ?'

গোমতী উত্তর দেয় না।

ফকিরা ফের বলে, 'কী হল, জবাব দিচ্ছিস না কেন ?'

গোমতী আস্তে মাথা নাড়ে শুধু, অর্থাৎ জানে।

'বিয়াহী আওরত ভেগে গেলে কোন মরদের মাথার ঠিক থাকে বল ? সব মরদেরই এটা ইজ্জৎকা সওয়াল।'

গোমতী চুপ করে থাকে।

ফকিরা এবার জিজ্ঞেস করে, 'তুই আমার বেটি বরাবর, আমাকে চাচা বলিস। একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে। চার সাল আগে নাটুয়াকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলি কেন ?'

তৎক্ষণাৎ জবাব দেয় না গোমতী। তার মাথাটা মাটিতে মিশে যায় যেন। বেশ কিছুক্ষণ পর সে বলে, 'বড়ী শরমকি বাত চাচা। শুনে কী লাভ ?'

'লাভ লুকসান আমি বুঝব। তুই বল—' বলে একটু থামে ফকিরা। কী ভেবে ফের শুরু করে, 'নাটুয়া তোর ওপর গুস্সা পুষে রেখেছে ; রাগের মাথায় কবে কী যে করে বসবে ! বহোত গাঁওয়ার। এখন আমি আছি। সব বলে নিজেদের ভেতর ফয়সলা করে নে।'

ফকিরার মতো শুভাকাঙ্ক্ষী হয় না। সে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে। নাটোয়ার যেরকম বদমেজাজি এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ তাতে ফকিরার সামনেই বোঝাপড়াটা হয়ে যাওয়া ভাল। মুখ না তুলে জড়ানো গলায় সে যা বলে যায় তা এইরকম। চার সাল আগে তার কাঁধে নিশ্চয়ই শাঁখরেল চেপেছিল, নইলে একটা বদ লোক লোভ দেখাল, আর সে কিনা লালচে পড়ে 'আপনা মরদ' আর ঘর ছেড়ে তার পিছু পিছু চলে গেল ধানবাদ। লোকটা তাকে কত রঙিন স্বপ্নই না দেখিয়েছে ! মোতির হার, চাঁদির কাংনা, সোনার করণফুল কিনে দেবে।

দামি দামি জমকালো শাড়ি আর জেবরে তাকে মুড়ে সিনেমা দেখাবে রোজ একটা করে, নৌটঙ্কি দেখাবে, সার্কাস দেখাবে। রেলের ডিব্বায় চড়িয়ে বেড়াতে নিয়ে যাবে ভারী ভারী সব টৌনে—পাটনা, টাটানগর, কলকাতা, বম্বাই। ঐ সব শহর নাকি 'সিরিফ' স্বপ্ন দিয়ে তৈরি। সেখানে হাজার মজা, হাজার রংতামাসা। তখন গোম্‌তীর বয়স কম। লোকটা তার চোখে ঘোর লাগিয়ে দিয়েছিল। কোনো কিছু তলিয়ে ভাবার বা বোঝার শক্তি তার ছিল না।

কিন্তু ধানবাদে নিয়ে মাস ছয়েক ফুর্তিফার্তা করার পর লোকটা একদিন গোম্‌তীকে ফেলে উধাও হয়ে যায়। তারপর কী কষ্ট করে যে কহলগাঁও-এ তার মা-বাপের কাছে চলে এসেছে শুধু সে-ই জানে। মা-বাপ তাকে কিছুতেই ঘরে তুলবে না। তিন দিন না খেয়ে উঠোনে পড়ে ছিল। তারপর মা-বাপের ক্ষমা পায়। বহুবার গোম্‌তী ভেবেছে নাটোয়ারের কাছে চলে যাবে, মহা পাপের জন্য 'মাফি মাঙবে', কিন্তু সাহসে কুলোয়নি। দু'পা এগিয়ে সে দশ পা পিছিয়ে গেছে। কেননা গোম্‌তী জানে তার মরদের মতো গোঁয়ার, রগচটা, হঠকারী আদমী দুনিয়ায় খুব বেশি জন্মায় না। হিংস্র পশুর মতো তার গোঁ এবং রাগ।

ফকিরা জিজ্ঞেস করে, 'সেই যে ধানবাদ থেকে এলি, তারপর থেকে কি বাপের ঘরেই আছিস?'

আস্তে মাথা নাড়ে গোমতী, 'হাঁ।'

'আর চুমৌনা (দ্বিতীয় বিয়ে) করিসনি?'

'নেহীঁ।'

একটু চুপচাপ।

তারপর ফকিরা কী ভেবে বলে, 'বাপ-মা ছাড়া আর কে কে আছে তোর?'

গোম্‌তী বলে, 'মা দো সাল আগে মরে গেছে। ঘরে বাপ আর একটা ভাই ছাড়া কেউ নেই।'

'বাপ আর ভাই কাম-উম কী করে?'

'কুছ নেহীঁ।'

'মতলব?'

'কী করে করবে? বাপের এক সাল ধরে বুখার, কী হয়েছে কে জানে। দিনরাত বিছানায় শুয়ে থাকে। অসপাতাল নিয়ে গিয়েছিলাম। ডাগদরসাব বুঝিয়ে দিল বেশিদিন বাঁচবে না। বড় জোর এক-দো মাহিনা। ছোটে ভাইটা

নহরগঞ্জে মাল বইত। ভারী বস্তা তুলতে গিয়ে কোমরে চোট লেগে সে-ও বিছানায় পড়ে আছে। কবে খাড়া হয়ে আবার কামাই করতে পারবে, রামচন্দরজি জানে।'

ফকিরাকে রীতিমত চিন্তিত দেখায়। গোম্‌তীর দিকে ঝুঁকে বলে, 'তা হলে পেট চালাস কী করে?'

'যখন যা কাজ পাই তাই করে চালাই।' গোম্‌তী বলতে থাকে, 'আমি ছাড়া আর কে চালাবে?'

আস্তে আস্তে সামনে-পেছনে মাথা নাড়ে ফকিরা। বলে, 'কাল তোকে বড় সড়কের ধারে উঁচা টিবি পার হয়ে আসতে দেখলাম। কোত্থেকে আসছিলি বহু?'

'কহলগাঁও-এ আমার বাপুর ঘর থেকে। চাল ডাল আঁটা গেঁহু, কুছ নেহীঁ ঘরমে। দো রোজ না খেয়ে আছি আমরা তিন তিনগো আদমী। তাই দো-চার পাইসা কামাই-এর জন্যে বেরিয়ে পড়েছিলাম। কিছু না নিয়ে ফিরলে বাপু আর ভাইটা বিলকুল ভুখা মরে যাবে।' বলে কিছুক্ষণ দম নিয়ে ফের শুরু করে গোম্‌তী, 'তারপর তো রথবালাদের জুলুসে তোমাদের সঙ্গে দেখাই হয়ে গেল।'

ফকিরা জিভের ডগায় চুক চুক শব্দ করে খুব আন্তরিক গলায় বলে, 'বড়ী দুখকা বাত।' আসলে গোম্‌তী যা বলে গেল তার সঙ্গে তাদের দুঃখকষ্ট এবং অনন্ত জীবনযুদ্ধের এতটুকু তফাত নেই। একই রকম উঞ্ছবৃত্তি করে তাকেও তিন-তিনটে মানুষের খাদ্য জোগাড় করতে হচ্ছে।

ফকিরার ডান পাশে বসে চুপচাপ গোম্‌তীর কথা শুনে যাচ্ছিল নাটোয়ার। খানিক আগের আক্রোশ এবং জান্তব রাগ এখন অনেক পড়ে গেছে। যে খুনটা মাথায় চড়ে গিয়েছিল সেটা নামতে শুরু করেছে। বিদ্বেষ এবং ঘৃণার বদলে গোম্‌তীর জন্য সে এক ধরনের সহানুভূতিই বোধ করতে থাকে। রাগের মাথায় মেয়েমানুষটাকে খুন করে ফেলার পর তার এই চার বছরের ভয়াবহ কষ্টদায়ক ইতিহাস জানতে পারলে আপসোসের আর শেষ থাকত না নাটোয়ারের।

হঠাৎ কিছু মনে পড়ায় ফকিরা জিজ্ঞেস করে, 'হাঁ রে বহু, কাল রথবালাদের চাপাটি উপাটি খাওয়ার পর তুই কোথায় পালিয়েছিলি?'

গোম্‌তী জানায়, সে পালিয়ে যায়নি। নাটোয়ারের ভয়ে প্যাণ্ডেলে না থেকে, আধারশিলা যেখানে বসানো হয়েছে সেই চাঁদোয়াটার ওধারে নহরগঞ্জ

বাজারের একটা ফাঁকা চালার তলায় সন্ধের পর শুয়ে পড়েছিল। নাটোয়ারের মুখচোখ দেখে তার মনে হয়েছিল, ধরতে পারলে সে তাকে বেঁচে থাকতে দেবে না। তাই দিনের আলো ফোটার আগেই সে বেরিয়ে পড়েছিল। ভেবেছিল, কোণাকুণি মাঠের ওপর দিয়ে সামনের কোনো শহরে বা গঞ্জে চলে যাবে। নাটোয়ার যদি হাইওয়ে ধরে বরাবর হাঁটতে থাকে, তাকে আর দেখতে পাবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাটোয়ারকে এড়ানো গেল না, গোমতীকে ধরা পড়তেই হল।

এরপর বেশ খানিকক্ষণ কেউ কিছু বলে না। সিসম এবং পিপর গাছগুলোর মাথায় পাখিদের ডাক ছাড়া চারপাশে কোথাও এখন আর কোনো শব্দ নেই।

একসময় ফকিরা বলে, 'তুই পাইসা কামাইয়ের জন্যে বেরিয়েছিস, আমরাও তা-ই। আমরা এখন নমকিপুরায় যাব। ইচ্ছে হলে আমাদের সঙ্গে আসতে পারিস। ওখানে গিয়ে দ্যাখ কাম-ধান্দা যদি কিছু জুটে যায়।'

গোমতীর মুখচোখ দেখে বোঝা যায়, এতে তার তেমন আপত্তি নেই। দু-দুটো পুরুষ সঙ্গে থাকলে কাজকর্ম জোগাড় করতে কিছু সুবিধাও হতে পারে। কিন্তু নাটোয়ার সম্পর্কে তার সংশয় পুরোপুরি কাটেনি। চোখের কোণ দিয়ে তাকে দেখিয়ে ভয়ে ভয়ে, খুব নিচু গলায় গোমতী ফকিরাকে বলে, 'লেকেন ও যদি—' কথা শেষ না করেই সে থেমে যায়।

তার মনোভাব চট করে বুঝে নেয় ফকিরা। সে বলে, 'নেহীঁ নেহীঁ, নাটুয়া কিছু করবে না।' নাটোয়ারের দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কা রে নাটুয়া, তোর গুস্সা পড়ল?'

নাটোয়ার গলার ভেতর আধফোটা আওয়াজ করে। খেপে যখন ওঠেনি তখন বোঝা যায়, রাগ অনেকটাই পড়ে গেছে।

ফকিরা ফের বলে, 'বহুকে মারবি না তো?'

চোখ কুঁচকে একবার গোমতীকে দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় নাটোয়ার।

কিছুক্ষণ বাদে দেখা যায়, মাঠের ওপর তিনজন পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে নমকিপুরার দিকে চলেছে। মাঝখানে ফকিরা, তার ডাইনে নাটোয়ার এবং বাঁয়ে গোমতী।

চলতে চলতে ফকিরাই যা দু-একটা কথা বলছিল। অন্য দু'জন একেবারে চুপ। মাঝে মাঝে ফকিরার রোগা কাঁধের ওপর দিয়ে গোমতী আর নাটোয়ার

পরস্পরের দিকে আড়ে আড়ে তাকায়। চোখাচোখি হলেই দ্রুত দু'জনেই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

॥ সাত ॥

নমকিপুরা ছোটখাটো শহর। নর্থ বিহারের এ জাতীয় অন্য সব শহরে যেমন দেখা যায়, এখানে তেমনি টিন বা টালির চালের বাড়িঘরই বেশি। ফাঁকে ফাঁকে বেঢপ চেহারার একতলা দোতলা, এমনকি চারতলাও চোখে পড়বে। খোয়া-ওঠা ভাঙাচোরা রাস্তাগুলো আধ হাত পুরু ধুলোর নিচে ডুবে আছে। দু'ধারে কাঁচা নর্দমার ওপর দিন রাত লক্ষ কোটি মশা ভন ভন করছে। এখানে দু পা হাঁটলেই একটা করে রামসীতা বা বজরঙ্গবলীর মন্দির। আর আছে বেথাপ্পা ধরনের দুটো সিনেমা হল। যানবাহন বলতে মান্ধাতার আমলের বয়েল আর ভৈসা গাড়ি, আর আছে টাঙ্গা, অটো, সাইকেল রিকশা, ক্বচিৎ দু-চারটে মোটর। এখানে অজস্র দোকানপাট। তবে মাইকের দোকানগুলোর দাপট সবচেয়ে বেশি। সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত নিষ্ঠাভরে সেগুলো হিন্দি সিনেমার রেকর্ড বাজিয়ে থাকে। এ শহরে অবশ্য একটা মিউনিসিপ্যালিটি আছে, বিজলিও এসে গেছে। ঘিঞ্জি শহরটার হট্টগোল, আবর্জনা, দুর্গন্ধ, মশামাছি, ধুলো ইত্যাদি থেকে দূরে একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে তিন একর জায়গা জুড়ে মিলিটারি সিং-এর হাভেলি।

নমকিপুরায় ঢোকার দু'টো মুখ। মাঠ পেরিয়ে পেছন দিক দিয়ে যেমন এ শহরে ঢোকা যায় তেমনি উলটো দিক দিয়েও। যে হাইওয়ের ওপর দিয়ে তারানাথ মিশ্রর 'ভারতমাতা রথ' চলেছে, সেটাই ঘুরে ঘুরে নমকিপুরা টাউনের সামনে দিয়ে চলে গেছে। বেশির ভাগ মানুষ ওখান দিয়েই এ শহরে আসে।

জ্বরটা আগে থেকেই ছিল ফকিরার। নমকিপুরায় পৌঁছুবার মুখে সেটা হঠাৎ খুব বেড়ে যায়। গা এখন পুড়ে যাচ্ছে। চোখ দুটো লাল। আলটাকরা পর্যন্ত জিভটা শুকিয়ে খরখরে হয়ে উঠেছে। জড়ানো গলায় ফকিরা বলে, 'আর পারছি না রে নাটুয়া, তোরা আমাকে ধর। নইলে পা ফেলতে পারব না।'

দু পাশ থেকে নাটোয়ার এবং গোমতী ফকিরাকে ধরে ফেলে। নাটোয়ার উদ্বিগ্ন মুখে বলে, 'চল, ওখানে বসে একটু জিরিয়ে নেবে।' দূরে একটা ঝাঁকড়া-মাথা সিমার গাছের তলায় ঘনছায়া দেখিয়ে দেয় সে।

ঘোর-লাগা আরক্ত চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে উতলা হয়ে পড়ে ফকিরা, 'নেহীঁ নেহীঁ, দুফার হয়ে আসছে। মলটারিজির সঙ্গে আজ দেখা করতেই হবে। চল—'

দু'জনে ধরে ধরে ফকিরাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলে।

মিলিটারি সিং-এর হাভেলির সামনে বিশাল গেটটার কাছে রাইফেল আর গলায় টোটার মালা নিয়ে একটা বিপুল চেহারার ভোজপুরি দারোয়ান উঁচু টুলে বসে হাতের তেলোতে খৈনি ডলছিল। নাটোয়ারদের দেখে তার দু চোখ নেচে ওঠে। সে ওদের চেনে। বলে, 'আরে নাটুয়া উস্তাদ, ফকিরাচাচা, আচানক তোমরা এখানে?'

নাটোয়ার বলে, 'বড়ে সরকারের সঙ্গে দেখা করব। কিরপা করে দর্শন করিয়ে দিন—'

নাটোয়ার এবং ফকিরার দিক থেকে দারোয়ানের নজর এবার গিয়ে পড়ে গোমতীর ওপর। চাপা লোভে তার চোখ চকচক করতে থাকে। গোমতীকে দেখতে দেখতেই সে জবাব দেয়, 'বড়ে সরকার তো নেই। কাল দিল্লি গেছেন।' তারপরেই গোমতী সম্পর্কে প্রচণ্ড কৌতূহলী হয়ে ওঠে, 'এ আওরত কৌন রে?'

মিলিটারি সিং নেই, শোনামাত্র নাটোয়ার একেবারে মুষড়ে পড়ে। এতটা রাস্তা অসুস্থ রোগগ্রস্ত ফকিরাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসাটা পুরোপুরি বরবাদ হয়ে গেল। তার মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে, নৈরাশ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে যায় সে। গোমতীর আসল পরিচয়টা না দিয়ে রুদ্ধ গলায় বলে, 'ও আমাদের সঙ্গে এসেছে। আচ্ছা দারবানজি, বড়ে সরকার কবে ফিরবেন?'

'কৌন জানে!'

নাটোয়ার উদ্বিগ্ন মুখে এবার জানতে চায়, মিলিটারি সিং-এর দু-চার দিনের ভেতর ফেরার সম্ভাবনা আছে কিনা।

নাটোয়ারের এ সব প্রশ্ন সম্পর্কে আদৌ কোনো আগ্রহ নেই দারোয়ানের। সে বলে, 'আওরতটার সঙ্গে তোদের কোথায় দেখা হল? কা নাম? কাঁহাকি রহনেবালী?'

দারোয়ানের কৌতূহল মেটানো আর হয় না। তার আগেই হাভেলির ভেতর দিক থেকে মিলিটারি সিং-এর মুন্সি চতুরলালজি গেটের কাছে চলে আসে। হঠাৎ দেখলে তাঁকে সাধু ধর্মাত্মা গোছের কেউ মনে হয়। সুখে-থাকা

গোলাকার চেহারা। স্থানীয় ঢংয়ে ধুতির কাছা পাকিয়ে পেছন দিকে গুঁজে দেওয়া, ওপরে গেরুয়া পাঞ্জাবি। কপাল জুড়ে চন্দনের 'রামসীতা' ছাপ। মোটা টিকিতে ফুল বাঁধা। দু হাতের আঙুলে হীরে চুনি পান্না ইত্যাদি মিলিয়ে গোটা সাতেক আংটি। গলায় সোনার চেইনে কুলগুরুর ছবিওলা লকেট। পায়ে মোটা চামড়ার চপ্পল।

বাইরের এই খোলসটা প্রথম দেখলে ভক্তিতে যে কেউ গদগদ হয়ে উঠবে কিন্তু চতুরলালের মতো ধূর্ত ধড়িবাজ লোক দুনিয়ায় দু-চারটের বেশি সৃষ্টি হয়নি। তার পেটে হাজারটা জিলিপির প্যাঁচ। কখন যে কাকে পথে বসিয়ে দেবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। নিজের সম্বন্ধে এমন একটা ভীতিকর আবহাওয়া সে তৈরি করে ফেলেছে যে সবাই তাকে ভয় পায়।

চতুরলাল বলে, 'কা রে নাটুয়া ফকিরা, বহোত রোজ বাদ তোদের দেখলাম।'

নাটোয়ার বলে, 'হাঁ মুন্সিজি—'

'তোদের তো বড়ে সরকার ডেকে পাঠাননি। তা হলে আমি জানতে পারতাম।' বলে মাথা নাড়তে থাকে চতুরলাল, 'বিনা ডাকে যে এলি, কোঈ জরুরত হ্যায়?'

এটা সত্যি, ডেকে না পাঠালে নাটোয়াররা নমকিপুরায় আসে না। এখানে আজ হানা দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য যে কিছু কামাই করে নিয়ে যাওয়া, সেটা গোপন রেখে নাটোয়ার বলে, 'ছে মাহিনা আগে বড়ে সরকারকে চাকুর খেল দেখিয়ে গেছি। ইচ্ছে হল আজ আবার দেখাই। লেকেন দারবানজি বলল, হুজৌর দিল্লি গেছেন।'

'হাঁ। দিল্লি থেকে বোম্বাই মাদ্রাজ কলকাত্তা হয়ে ফিরবেন। কমসে কম পুরা এক মাহিনা হুজৌরকে নমকিপুরায় পাওয়া যাবে না।'

মিলিটারি সিং-এর হাভেলির সামনে এসে ফকিরার হাত ছেড়ে দিয়েছিল নাটোয়ার। তবে গোমতী তাকে ধরেই আছে। জ্বরের তাড়সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধুঁকছিল সে। গভীর হতাশায় ভেঙে পড়ে ফকিরা। কাঁপা গলায় বলে, 'হামনিলোগনকা বহোত বুরা নসীব। হুজৌর ফিরলে যেন ডাক পাই। সেলাম মুন্সিজি, চলি। চল রে নাটুয়া, চল বহু—'

শুকনো গলায় নাটোয়ারও বলে, 'নমস্তে মুন্সিজি—'

ফিরে যাওয়ার জন্য ওরা যখন পা বাড়িয়েছে সেই সময়, চতুরলালের মাথায় কিছু একটা মতলব খেলে যায়। সে বেশ ব্যস্তভাবেই বলে, 'এখন ফিরতে হবে

না। এক কাম কর, তোরা পেছনের কোঠিতে চলে যা।'

মিলিটারি সিং-এর এই সুবিশাল হাভেলির পেছন দিকে ফাঁকা মাঠের ধার ঘেঁষে আরেকটা মাঝারি মাপের দোতলা বাড়ি আছে। তাঁর হাজার রকমের শখ। শিকার খেলা, কালোয়াতি গানবাজনা, নাচ, নৌটঙ্কি—কোনো কিছুতেই মিলিটারিজির অরুচি নেই। নাটোয়ারের ছুরির খেলাও তাঁর খুবই পছন্দ। শিকার তো আর ঘরে বসে হয় না, সে জন্য জঙ্গলে যেতেই হয়। তবে অন্য শখগুলো মেটানোর জন্য পেছনের ঐ বাড়িটা করিয়েছেন, সেখানে প্রায়ই জমজমাট আসর বসান মিলিটারি সিং। তখন বড় বড় 'আদমী'দের প্রচুর খাতিরদারি করে নিয়ে আসা হয়। শুধু এই শহরেরই না, ধানবাদ পাটনা টাটানগর, এমন কি সুদূর কলকাতা থেকেও মান্যগণ্য মেহমানরা আসেন। বাড়ির কমপাউন্ডে দামী দামী মোটরের লাইন লেগে যায়।

এই সব আসরে মিলিটারি সিং-এর স্থায়ী ম্যানেজার মুন্সি নৌকর ড্রাইভার দারোয়ান কোচোয়ান—কাউকেই ঢুকতে দেওয়া হয় না। এই আসরগুলো শুধুমাত্র তাঁর এবং তাঁর বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য সংরক্ষিত। মেহমানদের 'সেবা'র জন্য পাটনা থেকে কয়েক দিনের কড়ারে 'চুন চুনকে' (বাছাই করে) বয় বেয়ারা বাবুর্চি আনিয়ে নেন মিলিটারি সিং। তাঁর এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবদের খাদ্যাখাদ্যের বিচার নেই, জাতপাতের সওয়াল নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামান না।

'চাক্কুকা খেল' দেখানো ছাড়া পেছনের বাড়িতে নাটোয়ারদের ঢোকার প্রশ্নই নেই। মিলিটারি সিং-এর বিনা হুকুমে তবু কেন চতুরলাল ওখানে যেতে বলছে, ভেবে পায় না নাটোয়ার। রীতিমত অবাক হয়ে বলে, 'লেকেন—'

তার দ্বিধা এবং বিস্ময়ের কারণ বুঝতে পারছিল চতুরলাল। বলে, 'আরে যা না, গাধে কাঁহিকা!'

এরপর আর কোনো প্রশ্ন করতে সাহস হয় না নাটোয়ারের সে শুধু বলে, 'ঠিক হ্যায়, আপকো যো হুকুম—'

ফকিরা এবং গোমতীকে সঙ্গে করে পেছনের বাড়িটায় চলে যায় নাটোয়ার।

॥ আট ॥

বড় হাভেলি আর মাঝারি কোঠির মাঝখানে একটা উঁচু পাঁচিলের গায়ে দরজা বসানো রয়েছে। সেই দরজা দিয়ে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাতায়াত করা যায়। চতুরলাল সেদিক দিয়ে এসেছে আর নাটোয়াররা এসেছে

বাইরের রাস্তা ঘুরে।

এ বাড়ির ছোট গেটেও একটা দারোয়ান টোটা বন্দুক সমেত মোতায়েন রয়েছে। চতুরলাল এসে তাকে গেট খুলে দিতে বলে। মিলিটারি সিং-এর বাড়িঘর জমিজমা এবং প্রোপার্টির ব্যাপারে তাঁর পরেই যার সব চেয়ে বেশি দাপট, সে হল মুন্সি চতুরলাল। নাটোয়ারদের মতো দারোয়ানটা অবাক হলেও চতুরলালের হুকুম মুহূর্তে তামিল করে।

নাটোয়াররা ভেতরে ঢোকে। কী উদ্দেশ্যে তাদের এখানে আসতে বলা হয়েছে, বুঝতে না পেরে তারা খুবই অস্বস্তি বোধ করতে থাকে।

চতুরলাল বলে, 'আয় আমার সঙ্গে।' তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে সে সোজা দোতলায় উঠে যায়।

দোতলায় মোটে দু'খানা ঘর, আর অ্যাটাচড্ বাথরুম। এ ছাড়া বাকি অংশটা জুড়ে বিশাল হল্। হল্টা দামি কার্পেটে আগাগোড়া মোড়া। তার একধারে দু ফিট পুরু গদির ওপর ধবধবে ফরাস পাতা। আরাম করার জন্য মখমলের ঢাকনা-দেওয়া প্রচুর তাকিয়া ওটার ওপর ছড়ানো রয়েছে। এখানেই মিলিটারি সিং মাসে দু চার বার আসর বসান।

হল্-এ ঢুকে বিমূঢ়ের মতো নাটোয়ার বলে, 'মুন্সিজি, আমাদের এখানে নিয়ে এলেন—' কথা শেষ না করেই সে থেমে যায়।

নাটোয়ার কী বলতে চায়, বুঝতে অসুবিধা হয় না চতুরলালের। সে আর কোনোরকম হেঁয়ালির মধ্যে তাদের রাখে না। বলে, 'পাঁচ সাত সাল তুই আর ফকিরা স্রিফ বড়ে সরকারকে 'চাক্কুকা খেল' দেখাচ্ছিস। আমরা বাদ পড়ে যাচ্ছি। আজ মওকা মিলেছে। খেলটা আমাদের দেখাবি। সেই জন্যেই এখানে ধরে নিয়ে এলাম।'

ভয়ে গলা শুকিয়ে গিয়েছিল নাটোয়ারের। সে বলে, 'লেকেন—'

'কী?'

'হুজৌর জানতে পারলে—'

নাটোয়ারকে থামিয়ে দিয়ে চতুরলাল বলে, 'তোরা যদি না বলিস জানতে পারবেন না। আর সরকারকে যদি খবরটা দিস—' একটা মারাত্মক ইঙ্গিত দিয়ে নিঃশব্দে হাসে সে।

চতুরলালের এই হাসিটা নাটোয়ারের শিরদাঁড়ার ভেতর কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়। সে জানে মিলিটারি সিং খেপে গেলে দুনিয়ায় এক সেকেন্ডও সে বেঁচে থাকতে পারবে না। এ দিকে চতুরলাল মুন্সি মিলিটারিজির চেয়ে কম

বিপজ্জনক নয়। তার হুকুমমতো না চললে সে যে কতটা ক্ষতি করতে পারে, ভাবতেও সাহস হয় না। মিলিটারি সিং তো ফিরবেন একমাস বাদে। কিন্তু এই মুহূর্তে চতুরলাল যদি অসন্তুষ্ট হয়, তাকে কে বাঁচাবে ? দম-আটকানো গলায় নাটোয়ার বলে, 'নেহীঁ নেহীঁ, হুজৌরকে খবর দিয়ে আমাদের কী ফায়দা ?'

'কথাটা মনে রাখিস।'

'রাখব মুন্সিজি।'

ওদিকে হল্-এ ঢুকে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না ফকিরা। টলতে টলতে একধারে সে বসে পড়ে। গোমতী তাকে ছাড়েনি, তার পিঠটা এক হাতে ঘিরে রেখে জড়সড় ভঙ্গিতে পাশাপাশি বসে।

চতুরলাল বুঝিবা খবর দিয়ে এসেছিল। এখন দেখা যায়, হল্-ঘরের চারটে দরজা দিয়ে মিলিটারি সিং-এর নৌকর বাহিনী, রসুইকর, কোচোয়ান, দারোয়ান, ড্রাইভার ইত্যাদি মিলিয়ে বিশ বাইশজন ভেতরে ঢুকে পড়েছে। চতুরলাল একদিক থেকে অতি মহান ব্যক্তি। মিলিটারি সিং-এর নৌকর টৌকররা তার মতোই 'চাকুকা খেল' কোনোদিনই চোখে দেখেনি, অথচ দেখার ইচ্ছাটা ষোল আনা। সুযোগ যখন একটা পাওয়া গেছে, এদের বঞ্চিত করে একা একা নিজে তা দেখার কথা সে ভাবতেও পারেনি। তা ছাড়া সবাইকে ডেকে আনার পেছনে তার সুচতুর চালও রয়েছে। নিজে সে যতই ক্ষমতাবান আর ক্ষতিকারক হোক না, মিলিটারি সিং-এর একজন দামি নৌকর ছাড়া কিছুই নয়। যারা ছুরির খেলা দেখতে পাবে না তাদের কে কখন হুজৌরের কাছে গোপনে লাগিয়ে দেবে তার তো কিছু ঠিক নেই। কাজেই আগেভাগে সবার জবান বন্ধ করাটা ভীষণ জরুরি।

চতুরলাল বলে, 'সবাই এসে পড়েছে। এবার তোর হাতের জাদু দেখা নাটুয়া।' বলে ফরাসে উঠে তিন-চারটে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে আধশোয়া ভঙ্গিতে বিপুল শরীর এলিয়ে দেয়—রাজকীয় চালে যেভাবে মিলিটারি সিং এবং তাঁর মেহমানরা দিয়ে থাকেন।

ড্রাইভার দারোয়ানদের অবশ্য ফরাসে ওঠার সাহস হয় না। তারা নিচে দেওয়ালের ধার ঘেঁষে লাইন দিয়ে বসে পড়ে। সবার চোখমুখ আগ্রহ এবং উত্তেজনায় ঝকমক করছে।

নাটোয়ার কাঁচুমাচু মুখে ঢোক গিলে বলে, 'লেকেন মুন্সিজি—'

চতুরলালের চোখ কুঁচকে যায়। জিজ্ঞেস করে, 'কী হল ?'

নাটোয়ার জানায়, কাল শেষ বেলায় রথযাত্রাওলারা মাত্র চারখানা শুকনো চাপাটি খাইয়েছে, তারপর থেকে এতটা বেলা পর্যন্ত এক দানা খাদ্যও জোটেনি। অসহ্য খিদেয় পেট জ্বলে খাক হয়ে যাচ্ছে। মাথা খাড়া রেখে তারা দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। শরীরের যা হাল তাতে পেটে কিছু না পড়লে তাদের পক্ষে ঐ রকম খতারনাক মরণ-বাঁচনের খেলা দেখানো অসম্ভব।

চতুরলাল বলে, 'ঠিক হ্যায়।' তারপর দেয়াল ঘেঁষে বসে-থাকা মিলিটারি সিং-এর রসুইকরকে ডেকে নিচু গলায় নাটোয়ারদের তিনজনের জন্য খাবার আনতে বলে।

পনের মিনিটের মধ্যে খাঁটি ভৈসা ঘি-মাখানো প্রচুর চাপাটি, কুঁদরু এবং আলু-পটলের তরকারি, মটর-পনীর, অড়হরের ডাল, শুখা মরিচের আচার, বালুসাই এবং প্যাঁড়া এসে পড়ে।

নাটোয়ার এবং গোমতী গলা পর্যন্ত বোঝাই করে খায়। জ্বরের ঘোরে খেতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল ফকিরার কিন্তু এমন উৎকৃষ্ট ভোজন জীবনে আর পাওয়া যাবে কি না, চিন্তা করে সে-ও প্রায় গোগ্রাসে গিলতে থাকে। চতুরলালরা খাওয়ানো দাওয়ানোর ব্যাপারে রথযাত্রাওলাদের মতো চামার নয়। ওদের মুঠি থেকে কিছু গলতেই চায় না। সেদিক থেকে চতুরলালদের মন এবং হাত দুই-ই দরাজ।

খাওয়া দাওয়া চুকে গেলে চতুরলাল জিজ্ঞেস করে, 'কা রে, আচ্ছা ভোজন হুয়া ?'

ঢেকুর তুলে নাটোয়ার বলে, 'হাঁ মুন্সিজি, বহোত আচ্ছা।' যে উদ্দেশ্যে এতদূরে এত কষ্ট করে ছুটে এসেছে, তার আশা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিল সে। এখন আবার নতুন করে সেটা তাকে চনমনে করে তোলে। চতুরলাল এত ভাল যখন খাইয়েছে, দু হাত খুলে কি আর বখশিস দেবে না ? নাটোয়ারের ধারণা, নিশ্চয়ই দেবে। আগে-ভাগেই চতুরলালের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করতে শুরু করে নাটোয়ার। ভাবে, জীবনের সেরা খেলাটা আজ সে এদের দেখাবে।

চতুরলাল জিজ্ঞেস করে, 'পেট ভরেছে ?'

'হাঁ, বহুত খেয়েছি। জী ভরকে খায়া হ্যায় মুন্সিজি।'

এ বাড়ির সব কিছু নাটোয়ারের মুখস্থ। তার চোখ বেঁধে দিলেও কোথায় কী আছে, ঠিক বার করে ফেলতে পারবে। প্রথমে হল্-এর লাগোয়া একটা ঘর থেকে কাঠের চওড়া বোর্ড এনে লোহার ফ্রেমে আটকে দেওয়ালের সমস্তরাল

করে দাঁড় করিয়ে রাখে। তারপর নিয়ে আসে একটা প্রকাণ্ড স্টিলের বাক্স। বাক্সটার ভেতর রয়েছে গোটা বিশেক ধারালো ছুরি। সেগুলোর প্রত্যেকটার ফলা ন' ইঞ্চি লম্বা এবং মুখ খুব ছুঁচলো।

ছুরি বার করে কাঠের স্ট্যান্ডটা থেকে প্রায় পনের ফিট দূরে সেগুলো পর পর সাজিয়ে রাখে নাটোয়ার। তারপর চলে আসে ফকিরার কাছে।

জ্বরের তাড়সে এবং গলা পর্যন্ত ঠেসে খাওয়ার কারণে সোজা হয়ে বসে থাকতে পারছিল না ফকিরা। যদিও গোমতী তাকে ধরে রেখেছে তবু তার ঘাড় ভেঙে মাথা হাঁটুর ওপর ঝুলে পড়েছে।

ফকিরাকে এভাবে দেখে খুব মায়া হচ্ছিল নাটোয়ারের। এই অবস্থায় তাকে বিপজ্জনক ছুরির খেলার ভেতর টেনে আনা ঠিক নয়। কিন্তু উপায়ও নেই। তাদের বেঁচে তো থাকতে হবে। দ্বিধান্বিতভাবে নাটোয়ার ডাকে, 'চাচা—'

ফকিরা মাথাটা সামান্য তুলে আরক্ত চোখে তাকায়। বলে, 'কা রে ?'

'সব নিয়ে এসেছি। ঐ দেখ—'

ফকিরা ঘোর ঘোর চোখে তাকায়। ছুরি, দেওয়ালের গায়ে কাঠের স্ট্যান্ড—সমস্ত কিছুই তার জন্য প্রস্তুত। সে আস্তে মাথা নাড়ে, 'হাঁ—'

খুব নরম গলায় নাটোয়ার জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি পারবে চাচা ?'

'পারতেই হবে রে নাটুয়া।' হাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে ফকিরা কিন্তু প্রথম বার পেরে ওঠে না, হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে। দু'তিন বারের চেষ্টায় নাটোয়ারের হাত ধরে শেষ পর্যন্ত সে খাড়া হতে পারে।

ধরে ধরে কাঠের স্ট্যান্ডটার দিকে ফকিরাকে নিয়ে যেতে যেতে নাটোয়ার বলে, 'খেলটা বন্ধই করে দিই চাচা—'

এবার বিরক্তই হয় ফকিরা। বলে, 'বললাম তো পারব। খেল বন্ধ হলে আমাদের চলবে ?'

নাটোয়ার আর কিছু বলে না। কাঠের স্ট্যান্ডের কাছে এসে সেটার গায়ে ফকিরাকে দাঁড় করিয়ে দেয়, তার হাত দুটো ঝুলিয়ে স্থির করে রাখতে বলে। অবশ্য এত সব বলার দরকার নেই। ছুরির খেলার যাবতীয় প্রক্রিয়া ফকিরা জানে।

নাটোয়ার দু পা পিছিয়ে তাকে লক্ষ করতে থাকে। মাথাটা অল্প অল্প কাঁপছে ফকিরার। এ এমন এক মরা-বাঁচার দুঃসাহসিক খেলা যে ফকিরার ডাইনে বাঁয়ে সামান্য এক আঙুলও যদি হেলে পড়ে সর্বনাশ হয়ে যাবে। নাটোয়ার ভেতরে ভেতরে ভীষণ ঘাবড়ে যায়। এমন 'সাথী' নিয়ে ছুরির খেলা

অসম্ভব কিন্তু ফকিরা জেদ ধরেছে কোনোভাবেই খেলা বন্ধ করা চলবে না। সে বলে, 'চাচা, তোমার মাথা ডাইনে বাঁয়ে হিলছে। আমার বহোত ডর লাগছে।'

কাঁপা জড়ানো গলায় ফকিরা বলে, 'কিসের ডর রে ?'

'আগর কুছ হো যায় তো—'

'আরে নেহীঁ নেহীঁ, আমি সিধা দাঁড়াচ্ছি। মাথা আর হিলবে না। তুই তোর জায়গায় গিয়ে চাকু ফেঁকতে থাক।'

'বহোত হোঁশিয়ার চাচা—'

'হাঁ হাঁ, হোঁশিয়ার। ফিকর মাত্ করনা।'

পনের ফিট দূরে যেখানে ছুরিগুলো সাজানো রয়েছে সেখানে গিয়ে একটা ছুরি তুলে নিয়ে চোখ বুজে নাটোয়ার বিড় বিড় করে বলতে থাকে, 'হো রামজি, হো কিষুণজি, চাচার যেন কিছু না হয়। তা হলে আমি দুনিয়ায় মুখ দেখাতে পারব না, সিরিফ গলায় রশি দিতে হবে।' রামজি কিষুণজির কাছে আর্জি পেশ করে সে পুরা হল্-ঘরটা একবার দেখে নেয়। সবাই চুপচাপ রুদ্ধশ্বাসে তার আর ফকিরার দিকে তাকিয়ে আছে।

আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে নেয় নাটোয়ার। সামনের দিকে ঝুঁকে একটা ছুরি তুলে আঙুলের ডগা দিয়ে সেটার ছুঁচলো মুখটা পরখ করে নেয়। না, জংটিং ধরেনি। তারপর হাতির দাঁতে তৈরি ছুরিটার বাঁটের মাঝখানটা দু আঙুলে চেপে ধরে নিজেকে প্রস্তুত করে সোজা ফকিরার দিকে তাকায়। ছুরির এই খেলাটা দেখানোর সময় সে নিজের ভেতর এতই ডুবে যায় যে দুনিয়ার কোনোদিকেই তার নজর থাকে না। চারপাশের সমস্ত দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ এবং মানুষজন তার সামনে থেকে একেবারেই মুছে যায়। শুধু বোর্ডের গায়ে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ফকিরার শরীরের কাঠামো ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পায় না।

এক মুসলমান ওস্তাদের কাছে এই 'চাক্কুকা খেল্'টা শিখেছিল নাটোয়ার। ওস্তাদ তাকে পাখি পড়ানোর মতো করে উঠতে বসতে কানের কাছে অনবরত বলে যেত, নাটোয়ার যখন খেলা দেখাবে তখন মনের ভেতর অন্য কোনো চিন্তা যেন ঢুকতে না দেয়। শরীর আর মনকে পুরোপুরি একমুখি করে রাখতে হবে। দুনিয়া হেজেমজে জাহান্নামে যাক, নাটোয়ারের নজর শুধু থাকবে হাতের ছুরি আর তার লক্ষ্যবস্তুর দিকে। মহাভারত সীরিয়ালে অর্জুনকে লক্ষ্যভেদ করতে দেখেছিল সে। জলে মাছের ছায়া দেখে তীর দিয়ে সেটার চোখ

বিঁধেছিল অর্জুন। ছুরির খেলাটা অনেকটা সেইরকম।

ছুরিসুদ্ধ ডান হাতটা খুব ধীরে ধীরে অনেকখানি ওপরে তোলে নাটোয়ার। তার সামনে থেকে ফকিরার শরীরের চারপাশে ঘিরে একটা সরু লাইন ছাড়া আর সব কিছুই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমন কি ফকিরাকেও এখন সে আর দেখতে পাচ্ছে না। ঐ লাইনটার ওপর কুড়িটা ছুরি কয়েক ইঞ্চি পর পর তাকে বিঁধিয়ে যেতে হবে। অর্জুনের সেই মৎস্যচক্ষুর মতো ফকিরাকে ঘিরে কাল্পনিক রেখাটা হচ্ছে তার একমাত্র লক্ষ্য।

ছুরিটা যখন নাটোয়ার ছুঁড়তে যাবে, সেই সময় মেয়ে গলায় আতঙ্ক-ভরা শীর্ণ চিৎকার কানে আসে, 'রুখ যাও, রুখ যাও—'

নাটোয়ারের ঘোর পলকে কেটে যায়। চমকে উঠে সে দেখে গোমতী ঘরের কোণ থেকে কখন যেন উঠে দাঁড়িয়েছে। সে সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে; ভয়ে তার দুই চোখ বুঝিবা ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। গোমতী আঙুল বাড়িয়ে ফকিরাকে দেখিয়ে দেয়।

দ্রুত মুখ ফেরাতেই নাটোয়ার দেখতে পায়, ফকিরার শরীর কাঠের স্ট্যান্ডের গা থেকে হেলে নিচে পড়ে যাচ্ছে। গোমতী পাশ থেকে জানায়, ফকিরাকে হেলতে দেখে সে চেঁচিয়ে উঠেছিল।

নাটোয়ার কিছুই শুনতে পায় না, উদভ্রান্তের মতো দৌড়ে গিয়ে ফকিরা নিচে পড়ে যাওয়ার আগেই তাকে ধরে ফেলে।

ওধারে চতুরলাল থেকে শুরু করে রসুইকর দারোয়ান পর্যন্ত সবাই গভীর উৎকণ্ঠায় উঠে দাঁড়ায়। চতুরলাল শশব্যস্তে জিজ্ঞেস করে, 'কা হুয়া রে নাটুয়া, ফকিরাকো কা হুয়া?'

'চাচা বেহুঁশ হো গিয়া—' বলে খুব সন্তর্পণে কার্পেটের একধারে ফকিরাকে শুইয়ে দেয় নাটোয়ার।

প্রবল জেদ এবং ইচ্ছাশক্তিতে ফকিরা কাঠের স্ট্যান্ডের গা ঘেঁষে ছুরির খেলার জন্য দাঁড়িয়েছিল ঠিকই, কিন্তু দুর্বল শরীর আর নতুন করে আসা জ্বরের কারণে নিজেকে শেষ পর্যন্ত খাড়া রাখতে পারেনি; পুরোপুরি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

চতুরলাল একটা নৌকরের উদ্দেশে বলে, 'এ ঘেঁসুয়া, তুরন্ত পানি লেকে আ—'

ঘেঁসুয়া নামধারী নৌকরটি ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে যায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যে এক বালতি জল নিয়ে ফিরে আসে।

কিছুক্ষণ জলের ঝাপটা দিতে হুঁশ ফিরে আসে ফকিরার। সে চোখ মেলে তাকায়। তাকে ঘিরে নাটোয়ার আর গোমতীই শুধু নয়, দারোয়ান নৌকররাও দাঁড়িয়ে আছে। কখন তারা ফকিরার কাছে চলে এসেছিল, কেউ লক্ষ করেনি। সকলে এলেও চতুরলাল কিন্তু ফরাস থেকে নামেনি। সেখান থেকেই সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'কা রে, গাধ্‌ধেটা আঁখ মেলেছে?'

কে যেন উত্তর দেয়, 'হাঁ মুন্সিজি—'

খেলা শুরু হওয়ার মুখে আচমকা বাধা পড়ায় খুবই বিরক্ত হয়েছিল চতুরলাল। হারামজাদের ছৌয়াটা বেহুঁশ হওয়ার আর সময় পেলে না! যাই হোক, তার জ্ঞান ফিরে আসায় খানিকটা আরাম বোধ করে চতুরলাল। বলে, 'তব্ তো ঠিক হ্যায়। খেল চালু করে দে—'

নাটোয়ার উত্তর দেয় না। ফকিরার মুখের ওপর ঝুঁকে সে বলে, 'এখন কেমন লাগছে চাচা?'

ফকিরা খানিকক্ষণ চুপচাপ পড়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসতে বসতে বলে, 'মাথায় কেমন করে যে চক্কর লেগে গেল, বুঝতে পারিনি। চোখের সামনে সব কুছ আন্ধেরা হয়ে গিয়েছিল। এখন ঠিক আছি।'

গলা নামিয়ে নাটোয়ার বলে, 'মুন্সিজি তো খেল্ শুরু করার কথা বলছে।'

'হাঁ, শুনলাম।'

'পারবে কী?'

তক্ষুনি উত্তর দেয় না ফকিরা। বেশ কিছুক্ষণ বাদে অনিশ্চিতভাবে বলে, 'দেখি কোসিস করে।'

নাটোয়ার লক্ষ করে, আগের মতো গোঁ বা আত্মবিশ্বাস কোনোটাই নেই ফকিরার। বেহুঁশ হওয়ার পর মনের দিক থেকে সে কমজোর হয়ে পড়েছে। নাটোয়ার বলে, 'কোসিস করে দরকার নেই।' বলে মুখ ফিরিয়ে চতুরলালের উদ্দেশে হাতজোড় করে বলে, 'মুন্সিজি, মাফি মাঙতা হুঁ। চাচার যা হাল, তাতে আপনাদের চাকুকা খেল দেখাতে পারব না।'

চতুরলাল ভেংচে ওঠে, 'দেখাতে পারব না! শালে ভূচ্চরের পাল, যা আভ্‌ভি, খেল্ শুরু কর।'

অগত্যা ফকিরা আরো বারকয়েক হাতের ভর দিয়ে উঠে কাঠের স্ট্যান্ডটার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু সেখানে পৌঁছুবার আগেই হুড়মুড় করে পড়ে যায়।

নাটোয়ার মনস্থির করে ফেলে, ফকিরাকে নিয়ে আজ কিছুতেই বিপজ্জনক

'চাকুকা খেল্'টা দেখাবে না। এতে যা হওয়ার হবে। সে হাত জোড় করেই ছিল। বলে, 'মুন্সিজি, আপনি নিজের চোখেই সব দেখলেন। এরপরও যদি চাচাকে নিয়ে খেলি—'

এবার ধৈর্য হারিয়ে ফেলে চতুরলাল। রাগে উত্তেজনায় মাথার ভেতর রক্তবাহী শিরাগুলো যেন মুহূর্তে ছিঁড়ে যায় তার। একটা জমজমাট আসর শুরু হতে না হতেই এভাবে মাটি হয়ে যাবে, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না সে। এমনিতে চতুরলাল খুবই শান্ত, কোনো কারণেই মাথা গরম করে না, মুখের চিরস্থায়ী স্বর্গীয় হাসিটি সর্বক্ষণ অটুট থাকে তার। কিন্তু এই মুহূর্তে স্বভাববিরুদ্ধ কাজটি করে বসে। চিৎকার করে বলে, 'কুত্তাগুলোকে এত্তে আচ্ছা 'ভোজন' করালাম। এখন বলে কি না, খেল দেখাতে পারবে না। যতক্ষণ না দেখাচ্ছিস, এখান থেকে এক কদমও তোদের বেরুতে দেওয়া হবে না। সমঝা শালে ?'

নাটোয়ার উত্তর দেয় না, ভীত বিমর্ষ মুখে চতুরলালের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মেঝেতে কার্পেটের ওপর বসে ছিল ফকিরা। সে ডাকে, 'এ নাটুয়া—নাটুয়া—' নাটোয়ার তার দিকে মুখ ফেরাতে বলে, 'যা হওয়ার হোক, তুই আমাকে ধরে ধরে কাঠের পাটার গায়ে দাঁড় করিয়ে চাকু ফেঁকতে থাক।'

নাটোয়ার কিছু বলে না, ফকিরার দিকে হাতও বাড়িয়েও দেয় না।

আচমকা গোমতী ওধার থেকে ভয়ে ভয়ে নাটোয়ারকে ডাকে, 'এ আদমী, থোড়া ইধর আও—'

ফকিরার মধ্যস্থতায় এবং পরামর্শেই গোমতীর সঙ্গে মোটামুটি একটা বোঝাপড়া আগেই হয়ে গিয়েছিল। সে একরকম বুঝিয়ে দিয়েছে এই নষ্ট আওরতটার গায়ে হাত অন্তত তুলবে না। তাই বলে মন থেকে সবটুকু বিদ্বেষ আর ঘৃণা বেমালুম উবে গেছে, এমন ভাবার কারণ নেই। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে গোমতীর দিকে মুখ ফেরায় নাটোয়ার। কর্কশ গলায় বলে, 'কা ?'

নাটোয়ারের মুখচোখের ভঙ্গি দেখে এবং তার গলার স্বর শুনে যথেষ্ট দমে যায় গোমতী কিন্তু সাহস করে বলে, 'কাছে এস, বলছি।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পায়ে পায়ে গোমতীর সামনে গিয়ে দাঁড়ায় নাটোয়ার। আগের স্বরেই জিজ্ঞেস করে, 'কী দরকার ?'

গোমতী ভীরু গলায় যা জানায় তা এইরকম। অসুস্থ রুগ্ণ ফকিরাকে কাঠের স্ট্যান্ডের গায়ে দাঁড় করানো উচিত হবে না। খেলা না দেখে মুন্সিজিরা

যখন কিছুতেই তাদের মুক্তি দেবে না তখন ফকিরার বদলে তাকে নিয়েই 'চাকুকা খেল্'টা দেখাক নাটোয়ার।

এই কারণে গোমতী ডাকতে পারে, ভাবা যায়নি। নাটোয়ার চমকে ওঠে। বলে, 'কী বলছিস তুই জানিস ? এ হল জিন্দগি আউর মৌতকা খেল।'

'জানি।' নাটোয়ারের চোখের দিকে তাকিয়ে গোমতী বলে, 'চার সাল আগে তোমার কাছে এই খেল্টার কথা অনেক বার শুনেছি।'

নাটোয়ারের মনে পড়ে যায়, তার ক্ষণস্থায়ী বিবাহিত জীবনে গোমতীর কাছে ছুরির খেলার খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে তাকে একেবারে চমৎকৃত করে দিয়েছিল। তার খেলা দেখে মিলিটারি সিং এবং সরগনা মেহমানরা কী ধরনের তারিফ করেছেন আর দু হাত খুলে বখশিস দিয়েছেন—এ সব শুনতে শুনতে চোখের পাতা পড়ত না গোমতীর। নাটোয়ারের কথার ফাঁকে ফাঁকে মাথা ঈষৎ কাত করে গালে হাত রেখে সে শুধু বলত, 'হাঁ। অ্যায়সা।'

নাটোয়ার বলে, 'লেকেন তুই আওরত। এ সব পারবি না।'

'জরুর পারব। তুমি সিরিফ আমাকে একটু শিখিয়ে দাও।' গোমতী বলতে থাকে, 'খেল্টা দেখাতে পারলে যা পাব, তিনজনে ভাগাভাগি করে নেবো। পাইসার বহোত জরুরত।'

ফকিরা খানিক দূর থেকে সবই শুনেছিল। উদ্বেগের সুরে সে বলে, 'নেহীঁ নেহীঁ, বহুঁকে নিয়ে এই খতারনাক খেল্ দেখাস না নাটুয়া।'

গোমতী ফকিরার কথা শুনতেই পায় না। নাটোয়ারকে বলে, 'আও হামনিকে সাথ—' বলে সোজা কাঠের স্ট্যান্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

নিজের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা, কিছুই নাটোয়ারের ওপর কাজ করছিল না। অদৃশ্য, প্রবল কোনো আকর্ষণে গোমতী যেন তার দিকে ওকে টেনে নিয়ে যায়।

পেছন থেকে দম-আটকানো, কাতর গলায় ফকিরা সমানে গোঙানির মতো আওয়াজ করে বলে যায়, 'নেহীঁ নেহীঁ নেহীঁ—'

নাটোয়ার গোমতীর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। গোমতী তাকে শান্ত গলায় বলে, 'কিভাবে দাঁড়াতে হবে, বলে দাও।'

অবাক নাটোয়ার লক্ষ করে, আওরতটার চোখেমুখে বা গলার স্বরে ভয়ডর বা আতঙ্কের চিহ্নমাত্র নেই। বেঁচে থাকার জন্য যে কোনোরকম ঝুঁকি নিতে সে প্রস্তুত।

নাটোয়ার জবাব দেয় না, পলকহীন তাকিয়েই থাকে। আজ সকালেই এই

মেয়েমানুষটাকে সে খুন করতে চেয়েছিল। একটু আগেও তার সম্বন্ধে নাটোয়ারের মাথায় ঘৃণা আর বিদ্বেষ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। কিন্তু এখন তার মনোভাবটা পালটে যেতে শুরু করেছে। গোম্‌তীকে নিয়ে খেলা দেখালে সে-ই শুধু টাকা পাবে না, নাটোয়ার এবং ফকিরারও কয়েকটা দিন বাঁচার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। নিজের অজান্তে তার প্রতি খানিকটা কৃতজ্ঞতাই কি বোধ করতে থাকে নাটোয়ার ?

গোম্‌তী তাড়া লাগায়, 'কী হল। বল—'

চমক ভেঙে যেন জেগে ওঠে নাটোয়ার। গোম্‌তীর দু হাত ধরে কাঠের স্ট্যান্ডটার গায়ে তাকে একটা মূর্তির মতো দাঁড় করিয়ে দেয়। হাত দুটো শরীরের দু পাশে নামিয়ে স্থির করে রাখতে বলে। তারপর কয়েক পা পিছিয়ে, ডাইনে বাঁয়ে নিজের মাথাটা হেলিয়ে গোম্‌তীকে ভাল করে লক্ষ করতে থাকে। যখন বোঝে দাঁড়ানোটা সঠিক হয়েছে তখন বলে, 'যেমন আছিস বিলকুল সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবি।'

গোম্‌তী বলে, 'ঠিক হ্যায়।' তার শরীর এক চুল নড়ে না। কথা বলার জন্য ঠোঁটদুটো সামান্য ফাঁক হয় মাত্র।

'কোনোদিকে হিলবি না।'

'ঠিক হ্যায়।'

'হিললে জান চলে যেতে পারে। মনে থাকবে ?'

'থাকবে-।'

'আমি যখন বলব আঁখ বন্ধ করে ফেলবি।'

'ঠিক হ্যায়।'

এত সব হুঁশিয়ারি দেওয়ার পরও হঠাৎ নাটোয়ার টের পায় তার বুকের ভেতরটা ভীষণ দুলছে। সে একজন দুর্ধর্ষ 'চাকুকা খেল্'-এর জাদুকর। তার নিশানা এতই নির্ভুল যে টার্গেটে ছুরি ছোঁড়ার সময় হাত বিন্দুমাত্র কাঁপে না। পাকা ওস্তাদের কাছে তালিম নিয়ে সে এমনই তৈরি হয়ে গেছে যে আজ পর্যন্ত একবারের জন্যও তার ছুরি নিশানার বাইরে গিয়ে লাগেনি।

এতকাল যাদের নিয়ে নাটোয়ার ছুরির খেলা দেখিয়েছে তারা সবাই পুরুষ। গোড়ায় দু-এক বছর নির্দিষ্ট কেউ ছিল না। রামপেয়ার, দাসারি, ঘটেলু—এমনি যখন যাকে পাওয়া গেছে তাকে নিয়েই খেলা দেখিয়েছে সে। ইদানিং কয়েক বছর ফকিরা তার সঙ্গে স্থায়ীভাবে লেগে আছে। কিন্তু আজ এই প্রথম মেয়েমানুষ নিয়ে তাকে খেলা দেখাতে হবে। আর সেই মেয়েমানুষটা কিনা

গোম্‌তী। যার জন্য চার সাল সে আক্রোশ পুষে রেখেছে তার জন্য বুকের ভেতর কাঁপুনি ধরে কেন ?

একটা বদ আওরতের জন্য দুশ্চিন্তা করে এই মুহূর্তে নিজেকে হয়রান করা ঠিক নয়। মন শক্ত করে নেয় নাটোয়ার। আরো একবার গোম্‌তীকে সতর্ক করে দিয়ে খানিকটা নিস্পৃহ ভঙ্গিতে পনের ফিট দূরে আগের সেই জায়গাতে ফিরে যায়।

দর্শকরা ফের বসে পড়েছে। তারা এতদিন শুনে এসেছে, এই রক্ত-জমানো খেলাটা পুরুষরাই দেখিয়ে থাকে। কিন্তু ফকিরার জায়গায় গোম্‌তীকে দেখে তাদের উত্তেজনা এবং হৃৎপিণ্ডের ধকধকানি কয়েক গুণ বেড়ে যায়। চোখের পাতা টান করে তারা গোম্‌তীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

নাটোয়ারের কথামতো চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে গোম্‌তী। হাতদুটো দু'ধারে মুঠো পাকিয়ে ঝুলছে। শরীর একেবারে স্থির। দেখে মনে হয়, তার শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে।

একটা ছুরি তুলে নেয় নাটোয়ার। সেটার ফলা ঠোঁটের কাছে আলগোছে ঠেকিয়ে চোখ বুজে বিড় বিড় করে বলে, 'হো রামজি, হো কিষুণজি, তেরে কিরপা।' তারপর ওস্তাদের উদ্দেশে সেলাম জানিয়ে বলে, 'তেরে মেহেরবানি।' যখনই সে খেলা দেখায়, প্রতিটি ছুরি ছোঁড়ার আগে মনে মনে এভাবে রামজি আর কৃষ্ণজি এবং ওস্তাদের কৃপা চেয়ে নেয়। দুই দেবতা এবং ওস্তাদ যেন তার সহায় হয়, কোনোরকম দুর্ঘটনা যেন না ঘটে এবং তার সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকে।

একসময় চোখ মেলে গোম্‌তীকে আরো একবার দেখে নেয় নাটোয়ার। সে টের পায় তার ওপর অদৃশ্য একটা শক্তি যেন ভর করছে। বুঝতে পারে, আর তার ভয় নেই।

ধীরে ধীরে ছুরিটা ওপরে তুলে নাটোয়ার ছুঁড়ে দেয়। সেটা বিজলি চমকের মতো ঝিলিক দিয়ে গোম্‌তীর মাথার চার আঙুল ওপরে গিয়ে গেঁথে যায়। তারপর একের পর এক ছুরি নাটোয়ারের হাত থেকে ছুটে গিয়ে গোম্‌তীর শরীরটাকে ঘিরে কাঠের বোর্ডের গায়ে গেঁথে যেতে থাকে।

কুড়ি নম্বর ছুরিটা ছোঁড়ার পর দু হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ে নাটোয়ার। প্রচণ্ড ঘামতে শুরু করেছে সে। মুহূর্তে তার জামা এবং প্যান্ট ভিজে সপসপে হয়ে যায়। সারা শরীরের শিরাগুলো টান টান করে খেলা দেখিয়েছে সে, এখন সেগুলো আলগা হয়ে যাচ্ছে। নাটোয়ার টের পায়, যে অলৌকিক শক্তিটা তার

ওপর ভর করেছিল সেটা তাকে ছেড়ে গেছে।

ওদিকে যারা দমবন্ধ করে খেলা দেখছিল, এতক্ষণে তাদের ফুসফুসের ভেতর থেকে আটকানো বাতাস বেরিয়ে আসে। তারা একসঙ্গে তারিফের সুরে হইচই বাধিয়ে দেয়। তবে সব আওয়াজ ছাপিয়ে চতুরলালের গলা কয়েক পর্দা উঁচুতে চড়ে, 'সাবাস রে নাটুয়া, সাবাস।'

খানিকটা ধাতস্থ হয়ে আস্তে আস্তে মুখ থেকে হাত সরায় নাটোয়ার। তারিফের কথাগুলো তার মাথায় বিশেষ ঢোকে না। এ রকম বাহবা সে আগে বহু পেয়েছে।

হঠাৎ ডান পাশের দেওয়ালের কাছ থেকে ফকিরার গলা কানে আসে, 'আরে নাটুয়া, বহুটাকে তো দ্যাখ—'

চমকে সামনে তাকায় নাটোয়ার। কুড়িটা ছুরির মাঝখানে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে গোমতী। খেলা যে শেষ হয়ে গেছে, আওরতটা কি টের পায়নি? না কি ভয়ে সিঁটিয়ে রয়েছে? দৌড়ে সে গোমতীর কাছে চলে যায়। উদ্বিগ্ন মুখে ডাকে, 'এ গোমতী— গোমতী—'

চোখ মেলে তাকায় গোমতী। তাকে দেখে মনে হয় না, এতটুকু ভয় পেয়েছে। যেন কিছুই ঘটেনি, এমন একটা ভঙ্গিতে সে জিজ্ঞেস করে, 'খেল্ খতম হো চুকা?'

মেয়েমানুষটার দুর্জয় সাহসে অবাক হয়ে যায় নাটোয়ার। চার বছর আগে যে গোমতীকে সে চিনত সে ছিল ভীরু, দুর্বল। অন্তত এ জাতীয় দুঃসাহসী খেলায় তার এগিয়ে আসার কথা ভাবাই যেত না। চার বছরে গোমতী আগাগোড়া বদলে গেছে। হয়ত তার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর নানাভাবে ধাক্কা খেতে খেতে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য মরিয়া হয়েই গোমতীকে মনের জোর বাড়াতে হয়েছে। নইলে চারপাশের খতারনাক দুনিয়া তাকে শেষ করে দিত।

নাটোয়ার বলে, 'হাঁ।'

'আবার কি খেল্ দেখানো হবে?'

'নেহীঁ।'

ছুরির ঘেরের ভেতর থেকে খুব সতর্কভাবে বেরিয়ে আসে গোমতী। তাকে আর কিছু বলে না নাটোয়ার। সবচেয়ে জরুরি কাজটা এখনও বাকি। দ্রুত বোর্ড থেকে ছুরিগুলো স্টিলের বাক্সে পুরে ফেলে সে। তারপর কাঠের স্ট্যান্ড সুদ্ধু বোর্ডটা এক হাতে, বাক্সটা আরেক হাতে ঝুলিয়ে পাশের ঘরে জায়গা মতো

রেখে ফের হল্-এ ফিরে আসে।

দারোয়ান নৌকররা এখনও চলে যায়নি। তারা তারিফের মাত্রাটা ক্রমশ বাড়িয়েই চলেছে। এমন চাক্কুকা খেল পুরা দুনিয়ায় কেউ কখনও দেখেনি, এটা না দেখলে জীওনভর আপসোস থেকে যেত, ইত্যাদি।

শুধু তারিফ শুনে তো পেট ভরে না। নাটোয়ার সোজা চতুরলালের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। চতুরলালও আরেক দফা বাহবার বান ডাকিয়ে দেয়। তারিফের তোড় একটু কমলে হাতজোড় করে নাটোয়ার বলে, 'এবার আমরা যাব মুন্সিজি—'

চতুরলাল বলে, 'যাবি? ঠিক হ্যায়। লেকেন একগো বাত। বড়ে সরকার ফিরবেন পুরা এক মাহিনা পরে। এর ভেতর আরেক বার এসে তোর খেলটা আমাদের দেখিয়ে যাস।'

'যাব মুন্সিজি। এবার তা হলে—'

'কী?'

'কিরপা করে আমাদের বখশিসটা যদি দ্যান—'

ঘাড়টা সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকিয়ে চতুরলাল জিজ্ঞেস করে, 'বখশিস? মতলব রুপাইয়া?'

ঢোক গিলে আস্তে মাথা নাড়ে, 'হাঁ।' বড়ে সরকার খেল্ দেখে আমাদের খুশি করে দিতেন।'

নাটোয়ারের অবিশ্বাস্য আবদারের কথা শুনে একেবারে থ বনে যায় চতুরলাল। অনেকক্ষণ সোজাসুজি তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর আচমকা পটকা ফাটার মতো আওয়াজ করে সারা শরীর দুলিয়ে প্রবল তোড়ে হাসতে হাসতে নৌকর কোচোয়ানদের উদ্দেশে বলতে থাকে, 'শুন, শুন তোরা, খেল্ দেখিয়ে নাটুয়া শালে রুপাইয়া চাইছে!' রুপাইয়া কী রে, ভূচ্চরটাকে হীরা মোতি সোনা চাঁদি চাইতে বল—' বলতে বলতে ফের নাটোয়ারের দিকে মুখ ফেরায়, 'আরে শালে, এত আচ্ছা খিলালাম পিলালাম, তারপর্ পাইসা চাইছিস! যা, ভাগ—' আঙুল দিয়ে দরজা দেখিয়ে দেয় সে।

মাথায় আগুন ধরে যায় নাটোয়ারের। এত কষ্ট করে, প্রায় একটা দুরূহ অভিযান চালিয়েই তারা এখানে এসে পৌঁছেছে। আর চতুরলালরা কিনা স্রেফ এক পেট খাইয়ে প্রায় মুফতে খেলাটা দেখে নিল! কে ভাবতে পেরেছিল চতুরলাল মুন্সি তাঁকে এভাবে ধোঁকা দেবে! ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়ে একেবারে মরিয়া হয়ে ওঠে নাটোয়ার। হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো বলে,

'পাইসা আমাদের চাই-ই মুন্সিজি। তিন আদমীর কমসে কম শও রুপাইয়া—'

চতুরলাল মুন্সির মুখের ওপর কেউ এ রকম দাবি জানাতে পারে, সেটাই এক আশ্চর্যজনক ঘটনা। সমস্ত হল্-ঘরটায় মুহূর্তে স্তব্ধতা নেমে আসে। পাক্কা একটি মিনিট পর শান্ত মুখে মসৃণ হাসি ফুটিয়ে নৌকর দারোয়ানদের হুকুম দেয়, 'ভুচ্চরগুলোকে কোঠিসে নিকাল দে—'

গলার শিরা ছিঁড়ে চেঁচিয়ে ওঠে নাটোয়ার, 'নেহীঁ নেহীঁ—'

কিন্তু তার কথায় কেউ কান দেয় না। যারা এতক্ষণ তার খেলার তারিফ করছিল তারাই এখন হিংস্র জন্তুর মতো চারিদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তিনটি মানুষকে টেনে ছিঁচড়ে, ধাক্কা মারতে মারতে নিচে নামিয়ে আনে।

গোম্‌তী আর ফকিরা কোনোরকম বাধা দিচ্ছিল না কিন্তু নাটোয়ার এই প্রতারণা আদৌ মেনে নিতে পারে না। উন্মত্তের মতো আঁচড়ে, কামড়ে, এলোপাথাড়ি হাত-পা চালিয়ে নৌকর দারোয়ানদের একেবারে নাস্তানাবুদ করে দিতে থাকে। সেই সঙ্গে চিৎকার এবং অকথ্য গালাগালও করে যায়। নৌকরেরা মুখ বুজে আঁচড় কামড় হজম করছিল না, তারাও বেধড়ক মেরে নাটোয়ারের নাক মুখ ফাটিয়ে দিচ্ছে।

ফকিরা সমানে নৌকরদের উদ্দেশে আর্জি জানিয়ে যাচ্ছে, 'মাত মারো নাটুয়াকো, মাত মারো ভেইয়া।' নাটোয়ারকে বলছিল, 'হোঁশমে আ নাটুয়া, হোঁশমে আ—'

গোম্‌তীও সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে সেই একই কথা বলে যাচ্ছে, 'আদমীটাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। এত মারলে সিরিফ মরে যাবে।'

একা এতগুলো লোকের সঙ্গে একটানা লড়াই চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত নৌকর দারোয়ানরা তিনজনকে গেটের বাইরে খোয়ার রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

ফকিরা আর গোম্‌তী বাধা না দেওয়ায় তারা তেমন মার খায়নি, ফলে চোটটোট লেগেছে কম। কিন্তু নাটোয়ারের নাক মুখ ফেটে রক্ত পড়ছে। ডান ভুরুর ওপরে এবং কণ্ঠার কাছে অনেকটা জায়গা টিবির মতো ফুলে উঠেছে। তা ছাড়া খোয়ার রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলার জন্য সারা গায়ে এখানে ওখানে চামড়া ছড়ে অনেকটা করে ছাল উঠে গেছে।

হাতের পেছন দিয়ে মুখের রক্ত মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ায় নাটোয়ার। আগুন-ঝরা চোখে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে ক্ষোভে, রাগে, প্রবল আক্রোশে রাস্তায় বারকয়েক লাথি মারে, তারপর চতুরলালের উদ্দেশে এক নাগাড়ে

অনেকগুলো খিস্তি আউড়ে তিনবার থুতু ছুঁড়ে দেয়, 'থুঃ, থুঃ, থুঃ—ঘৃণায় তার মুখ কুঁচকে বেঁকে যেতে থাকে।

রাস্তা থেকে গোম্‌তী আর ফকিরাও উঠে পড়েছিল। জ্বরটা তো রয়েছেই, তার ওপর নৌকরদের টানাটানি এবং ধাক্কায় ফকিরা আরো কাহিল হয়ে পড়েছে। কোনোরকমে টাল সামলাতে সামলাতে দাঁড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করছে সে। আর গোম্‌তী উৎকণ্ঠিতের মতো নাটোয়ারকে লক্ষ করছিল। তার কাছে এগিয়ে এসে বলে, 'তোমার নাক থেকে ওঠ্ থেকে খুন বেরুচ্ছে।'

বার বার মুছে ফেলা সত্ত্বেও রক্ত বন্ধ হচ্ছিল না নাটোয়ারের, চুঁইয়ে চুঁইয়ে ক্রমাগত খাপচা খাপচা দাড়ি গোঁফের ওপর গড়িয়ে পড়ছে। সে এতই উত্তেজিত যে শারীরিক কষ্ট টের পাচ্ছিল না। মুখ ফিরিয়ে গোমতীকে বলে, 'বেরোক।'

গোম্‌তী এবার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'একটা জিনিস দেবো, তোমার নাকে আর ওঠে লাগাবে?'

নিরাসক্ত সুরে নাটোয়ার বলে, 'কেন?'

'তা হলে খুনটা বন্ধ হয়ে যাবে।'

নাটোয়ার চুপ করে থাকে। বোঝা যায়, তার আপত্তি নেই।

গোমতী রাস্তার ধার থেকে কচি দূর্বা ছিঁড়ে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে নাটোয়ারের ক্ষতের জায়গাগুলোতে পুরু করে লাগিয়ে দেয়।

বহুকাল বাদে মেয়েমানুষের ছোঁয়ায় নাটোয়ারের গায়ে সামান্য কাঁটা দিয়ে ওঠে। হোক নষ্ট আওরত, তবু গোম্‌তী তার এক কালের ঘরবালী তো ঠিকই। তার এই সেবাটুকু ভালই লাগে।

একসময় নাটোয়ার বলে, 'চল এবার—' বলে চতুরলালদের উদ্দেশে আরো বারকয়েক থুতু ফেলে দু পা পিছিয়ে ফকিরার একটা হাত ধরে এবং চোখের ইশারায় গোম্‌তীকে অন্য হাতটা ধরতে বলে। তারপর দু'জনে ফকিরাকে ধরাধরি করে বরাবর পশ্চিম দিকে হাঁটতে থাকে।

ফকিরা জিজ্ঞেস করে, 'পাইসা উইসা তো কিছুই মিলল না। এখন কোথায় যাবি নাটুয়া?'

নাটোয়ার জানায়, 'ধোঁকেবাজেরা আমাদের এভাবে ঠকাল! এক মিনিটও আর নমকিপুরায় থাকব না। আগে পাক্কীতে (হাইওয়েতে) তো যাই। যেতে যেতে ভেবে দেখি কোথায় যাওয়া যায়।'

'আউর কোঈ ভরসা নেহীঁ নাটুয়া—'

'কিসের ভরসা ?'

'পাইসার। দো-চারগো রুপাইয়া নিয়ে না গেলে কী যে হবে ! বিবি বাচ্চা সুদ্ধু সিরিফ ভুখা মরে যাব।'

মিলিটারি সিং-এর বাড়িতেই যখন কিছু পাওয়া গেল না তখন আদৌ কোথাও কিছু জুটবে বলে মনে হয় না। ফকিরাকে আশা-ভরসা দেবার মতো কিছুই নেই। নাটোয়ার চুপ করে থাকে।

পেছন দিকের মাঠ পেরিয়ে নমকিপুরা টাউনে ঢুকেছিল নাটোয়ারেরা। এখন তারা হাঁটুভর ধুলো মাড়িয়ে, মানুষজনের ভিড় ঠেলে, টাঙ্গা অটো সাইকেল-রিকশা ভৈসা আর বয়েল গাড়ির পাশ কাটিয়ে সামনের দিকে চলেছে। হাইওয়েটা ওধারেই।

বিকেল হয়ে আসছে। কালকের মতোই আজও আকাশ জুড়ে এলোমেলো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। সূর্য মাঝে মাঝে মেঘের আড়ালে চলে যায়, আবার বেরিয়ে পড়ে।

একসময় তিনজন নমকিপুরা টাউন পেছনে রেখে হাইওয়েতে পৌঁছে যায়, আর তখনই সেই চেনা গানের সুরটা বাতাসে ভেসে আসতে থাকে, 'বোল রাধা বোল, সঙ্গম হোগা কি নেহীঁ—'

॥ নয় ॥

চমকে নাটোয়াররা পেছন ফিরে যা দেখতে পায় সেটা তাদের খুবই পরিচিত দৃশ্য। দূরে হাইওয়ের একটা বাঁক ঘুরে হিন্দি গানের সুর বাজাতে বাজাতে প্রথমে আসছে সেই ব্যান্ড পার্টিটা, তার পর মহাদেওজির রথ, জিপ, জিপের পর তারানাথ মিশ্রর সুসজ্জিত মাটাডোর, তারপর পত্রকারদের মোটর, দুমরলালদের টাঙ্গা এবং সবার শেষে হাভাতে মানুষদের জুলুস। কাল যেমনটি দেখা গিয়েছিল হুবহু সেইভাবেই গাড়িটাড়িগুলো পর পর রেখে মিছিল বার করা হয়েছে।

গোমতী বলে, 'ভারতমাতা রথ।'

ফকিরা বলে, 'হাঁ। এদিকে কোথাও আধারশিলা বসাতে আসছে।' একদৃষ্টে তারানাথের রথটথের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছিল নাটোয়ার। সে বলে, 'একটা কাজ করলে কেমন হয় চাচা ?'

ফকিরা জিজ্ঞেস করে, 'কা ?'

নাটোয়ার জানায়, এই মুহূর্তে তাদের নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য তো নেই। কোথায় যাওয়া যায় যতক্ষণ সেটা ঠিক না হচ্ছে, ততক্ষণ 'ভারতমাতা রথ-এর জুলুসের সঙ্গেই না হয় হাঁটা যাক।

'বেফায়দা হেঁটে কী হবে ?'

'মতলব ?'

ফকিরা খুবই সতর্ক এবং হিসেবী মানুষ। সে যা বলে তা এইরকম। দিন অনেকখানি হেলে গেছে, বিকেল হতে বেশি বাকি নেই। ভারতমাতাওলারা নিশ্চয়ই এর ভেতর মিছিলের লোকজনকে 'দুফারের ভোজন' করিয়ে দিয়েছে। আজকের মতো খাওয়া-দাওয়াই যদি চুকে গিয়ে থাকে অকারণে রথের পেছন দৌড়ে নিজেদের ক্লান্ত করে লাভ নেই।

সংশয়ের গলায় নাটোয়ার বলে, 'দুফারের ভোজনের পর আর কি ওরা জুলুস বার করে ? কাল কিন্তু করেনি।'

অনিশ্চিতভাবে হাওয়ায় একটা হাত ঘুরিয়ে ফকিরা বলে, 'কৌন জানে !'

নাটোয়ার বলে, 'ওরা কাছে এলে পুছতাছ করে দেখি।'

'দ্যাখ।'

ব্যান্ড পার্টিতে সেই গানটার সুর বাজাতে বাজাতে ভারতমাতা রথ এগিয়ে আসতে থাকে। 'বোল রাধা বোল, সঙ্গম হোগা কি নেহীঁ—'

নাটোয়ার একদৃষ্টে রথওলাদের জুলুসের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছিল। হঠাৎ কিছু মাথায় আসতে ফকিরাকে ডাকে, 'চাচা—'

ফকিরা আস্তে সাড়া দেয়, 'কী বলছিস ?'

নাটোয়ার জানায়, বেলা হেলে গেছে। আজ আর কোথাও গিয়ে কামাই-এর সম্ভাবনা নেই। কিছুক্ষণ বাদে সন্ধে নেমে যাবে। রাতে তারা কোথায় থাকবে, ঠিক নেই। রথবালাদের সঙ্গে গেলে যদি খাবার না-ও মেলে, রাতটা অন্তত নিশ্চিন্তে কাটানো যাবে। নিশ্চয়ই ওদের জন্য কোনো টাউনে বা গঞ্জে কালকের মতো সামিয়ানা খাটানো রয়েছে। রাতটা ওদের সঙ্গে কাটিয়ে কাল সকালে উঠে ভেবেচিন্তে কিছু একটা করা যাবে।

নাটোয়ার যা বলেছে, আপাতত তার চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কিছু হয় না। ফকিরা বলে, 'ঠিক হ্যায়।'

আগে নাটোয়াররা লক্ষ করেনি। হঠাৎ তাদের চোখে পড়ে নমকিপুরা টাউনের অগুণতি মানুষ দৌড়ুতে দৌড়ুতে হাইওয়ের দিকে আসছে। তাদের

অনেকের হাতে শাঁখ, ঝুরো, ফুল, ফুলের মালা। কাল নহরগঞ্জে এবং তার আগে আরো দু-একটা গাঁয়ে যা দেখা গিয়েছিল, হুবহু সেই দৃশ্য।

একসময় ভারতমাতা রথ নাটোয়ারদের সামনে এসে থামে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যান্ড পার্টির বাজনা বন্ধ হয়ে যায়।

কালকের মতোই দুমরলালরা গলার শির ফুলিয়ে স্লোগান দিতে থাকে।

'ভারতমাতাকি—'

'জয়।'

'ভবিষ্য যাত্রা—'

'জিন্দাবাদ।'

'দেশপ্রেমী তারানাথ মিশ্র—'

'জিন্দাবাদ।'

এর মধ্যেই চারিদিকে শাঁখ বেজে ওঠে। তারানাথ মিশ্রর মাটাডোরে নমকিপুরার লোকজনেরা পরম ভক্তিভরে ফুল ছুঁড়তে থাকে; কেউ কেউ এগিয়ে তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দেয়।

ওদিকে স্লোগানে সমস্ত এলাকাটা সরগরম করে তোলার পর দুমরলাল প্রবল আবেগের গলায় রথযাত্রার মহৎ উদ্দেশ্য, গাঁয়ে-গঞ্জে-শহরে তারানাথজির আধারশিলা বসাতে বসাতে যাওয়ার কারণ, ইত্যাদি জানিয়ে দর্শকদের উদ্দেশে বলতে থাকে, 'আইয়ে আইয়ে, জুলুসমে সামিল হো যাইয়ে—' মিছিলে যোগ দিলে উৎকৃষ্ট 'ভোজন' যে করানো হবে, তার ওপর বিশেষভাবে জোর দেয় সে।

ভোজনের টোপটা ব্যর্থ হয় না। কাল যেমন দেখা গিয়েছিল, আজও তেমনি মিছিলের লেজের দিকটা মুহূর্তে পনের বিশ হাত বেড়ে যায়।

নাটোয়ার ফকিরার একটা হাত ধরে রেখেছিল। হাতটা ছেড়ে দিয়ে মিছিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে একটা মাঝবয়সী ক্ষয়াটে চেহারার গেঁয়ো লোককে জিজ্ঞেস করে, 'কখন থেকে তুমি জুলুসের সঙ্গে ঘুরছ?'

লোকটা বলে, 'সুবেসে।'

মনে মনে আন্দাজ করে নিয়ে নাটোয়ার বলে, 'তা হলে নহরগঞ্জ থেকে আসছ?'

'তুমি জানলে কী করে?'

'আমি কাল রথবালাদের সঙ্গে নহরগঞ্জে ছিলাম।'

ছিলই যদি, তা হলে কখন এই নমকিপুরায় এসে হাইওয়ের ধারে দাঁড়িয়ে

আছে, সে সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করে না লোকটা। আসলে তা নিয়ে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

নাটোয়ার শুধোয়, 'তারানাথজি আজ ক'টা আধারশিলা বসিয়েছেন?'

লোকটা বলে, 'সিরিফ একগো।'

'আরো বসাবেন?'

'হাঁ। গয়ারপুরে আউর একগো বসিয়ে আজকের মতো কাম খতম। কাল সুবে ফের রথ বেরুবে।'

গয়ারপুর এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়, জোর মাইল তিনেক। সন্ধের ঢের আগেই ভারতমাতা রথ সেখানে পৌঁছে যাবে। কিন্তু গয়ারপুর নিয়ে আদৌ মাথাব্যথা নেই নাটোয়ারের। সে এবার আসল প্রসঙ্গে চলে আসে। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করে, 'আজ দুফারকা ভোজন কি হয়ে গেছে?'

লোকটা মাথা নাড়ে, 'নেহীঁ ভেইয়া। রথবালারা বলেছে গয়ারপুরে আধারশিলা বসাবার পর খিলাবার ব্যওস্থা করবে।'

এই অত্যন্ত জরুরি খবরটা নাটোয়ারকে চাঙ্গা তো করে তোলেই, সে যখন গিয়ে ফকিরাদের জানায় তাদের ক্লান্ত ধসে -পড়া হাত-পায়ে বিজলি চমকে যায়। রথযাত্রাওলাদের দৌলতে অন্তত আরো একটা বেলার জন্য তারা নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

ফকিরা বলে, 'চল, জুলুসে ঢুকে যাই।'

ওরা মিছিলের শেষের দিকে যায় না, ধাক্কাধাক্কি করে সামনের দিকে ঢুকে দুমরলালদের টাঙ্গার পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়।

একসময় ব্যান্ড পার্টি 'বোল রাধা বোল—' সুর বাজিয়ে ফের চলতে শুরু করে। তার পেছনে একে একে মহাদেওজির জিপ, তারানাথজির মাটাডোর, তিন পত্রকারকে নিয়ে মোটর, ট্রাক, দুমরলালদের টাঙ্গা এবং সবার শেষে মিছিলও নমকিপুরা টাউনকে বাঁয়ে রেখে এগিয়ে যায়।

দুমরলাল টাঙ্গার ব্যাক সিটের মিছিলের দিকে মুখ করে বসে আছে। নাটোয়ারদের মুখের ওপর চোখ পড়তে তার ভুরু দুটো নেচে ওঠে। সে ওদের চিনতে পেরেছে। বলে, 'কা রে ভুচ্চরেরা, কাল তোরা জুলুসে ছিলি না?'

নাটোয়ার বলে, 'হাঁ দুমরলালজি—'

'সুবে উঠে তোদের দেখতে পেলাম না। কোথায় গায়েব হয়ে গিয়েছিলি?'

লোকটার গিধের চোখ। জুলুসের এত লোকজনের মধ্যে তাদের গতিবিধি ঠিক লক্ষ করেছে।

নাটোয়ার অবশ্য নমকিপুরায় গিয়ে মিলিটারি সিং-এর বাড়িতে ছুরি খেলার কথাটা জানায় না। দুনিয়ার সবচেয়ে সরল ভোলাভালা মানুষটার মতো মুখ করে বলে, 'থোড়া কুছ জরুরত থা। তাই ওধারের একটা গাঁওয়ে গিয়েছিলাম।' বলে পশ্চিম দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয়। সেদিকে গাঁ-টা কিছুই চোখে পড়ে না, শুধু ধুধু ফাঁকা মাঠ, মাঠের পর ঝাপসা পাহাড়ের রেঞ্জ। এই রেঞ্জটা বরাবর দিগন্তের গা ঘেঁষে পশ্চিম থেকে সোজা পুবে চলে গেছে।

দুমরলাল ভুরু কুঁচকে বলে, 'হারামজাদকা বেটোয়া, ধান্দাটা ভালই করেছিস।'

বুঝতে না পেরে বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে নাটোয়ার।

দুমরলাল এবার বলে, 'সুবে থেকে ভারতমাতা রথ-এর সঙ্গে হাঁটতে হল না। আরামসে এই বিকেলে দেড় দো ঘন্টা হেঁটে পুরা 'ভোজন' মিলে যাবে।'

তাদের কৌশলটা যে এভাবে দুমরলাল ধরে ফেলবে, নাটোয়ার ভাবতে পারেনি। গলার ভেতর হিক্কা তোলার মতো আওয়াজ করে সে বলে, 'নেহীঁ নেহীঁ দুমরলালজি। সচ্ সচ্ বলছি, ওধারের গাঁওয়ে যাওয়ার বহোত জরুরত ছিল। তাই—'

সেয়ানা উকিলদের মতো আর জেরাটেরা করে না দুমরলাল। শুধু বলে, 'এখন থেকে জুলুসের সঙ্গে পুরা টাইম না হাঁটলে ভোজন বন্ধ। সমঝা?'

'সমঝ গিয়া দুমরলালজি।'

দুমরলাল আর কিছু বলে না। নাটোয়ারদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে টাঙ্গায় তার ডাইনে যে দু'জন বসে ছিল তাদের দিকে ফিরে গল্প জুড়ে দেয়। নাটোয়ারদের উদ্বেগ অনেকটাই কেটে যায়।

উল্টোপাল্টা হাওয়ায় আকাশে যে ছন্নছাড়া মেঘের টুকরোগুলো এলোমেলো ভেসে বেড়াচ্ছিল, কখন সেগুলো পশ্চিম দিকে জড়ো হতে শুরু করেছে, কে জানে। আকাশের যা গতিক তাতে আজই হয়ত সন্ধের দিকে বৃষ্টি নেমে যাবে। রোদে এখন আর ধার নেই। মরা সোনার মতো ম্যাড়মেড়ে আলো মাঠঘাট আর গাছপালার গায়ে লেগে আছে।

কিছুক্ষণ আগেও রঙিন কাগজের টুকরোর মতো মাথার ওপর অজস্র পাখি উড়ে বেড়াচ্ছিল। এখন তারা বোধহয় ঝড়বৃষ্টির গন্ধ পেয়ে গেছে, তাই আকাশ ফাঁকা করে ঝাঁকে ঝাঁকে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যাচ্ছে।

এখন ঘাম দিয়ে ফকিরার জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে। ফলে আরো খানিকটা কাহিল হয়ে পড়েছে সে। দু পাশ থেকে তার দু হাত ধরে আগের মতোই হাঁটিয়ে নিয়ে

চলেছে গোমতী এবং নাটোয়ার।

একসময় ফকিরা ডেকে ওঠে, 'নাটুয়া রে—'

নাটোয়ার ভাবছিল ভারতমাতা রথ-এর পেছন একমাত্র একবেলা খাওয়ার আশায় মাইলের পর মাইল হেঁটে যাওয়াটা কোনো ক্রমেই লাভজনক নয়। কিন্তু মিলিটারি সিং-এর হাভেলিতে ব্যর্থ অভিযানের পর টাকার জন্য আর কী করা যেতে পারে, সেটা তার মাথায় একেবারেই আসছিল না। ফকিরার ডাক কানে আসতেই চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়, বলে, 'কা চাচা?'

'মালুম হচ্ছে আমি আর বেশিদুর হাঁটতে পারব না। হাত-পা বিলকুল ভেঙে আসছে।'

ফকিরার দু-ধারে নাটোয়ার আর গোমতী বেশ ঘাবড়েই যায়। উদ্বিগ্ন মুখে নাটোয়ার বলে, 'তা হলে কি জুলুস থেকে বেরিয়ে যাব?' সড়কের ধারে বসে জিরিয়ে নেবে?'

ফকিরা বলে, 'আকাশের হালচাল দেখেছিস? বারীষ নামলে সিরিফ ভিজতে হবে। কাছাকাছি গাঁও নেই যে সাহারা মিলবে। তারানাথজিরা তো গয়ারপুরে যাচ্ছে?'

'হাঁ।'

'আমাকে গয়ারপুর পর্যন্ত টেনে টেনে নিয়ে চল। এখন জুলুস থেকে বেরিয়ে গেলে একবেলার খানাটা খোয়া যাবে।'

অশক্ত শরীরেও ফকিরার মস্তিষ্ক যে কাজ করে যাচ্ছে তা জেনে নাটোয়ার চমৎকৃত। 'উৎকৃষ্ট ভোজন'টি সে কোনোমতেই হাতছাড়া করতে রাজী নয়। ব্যস্তভাবে নাটোয়ার বলে, 'হাঁ হাঁ, ঠিক বাত।'

'জুলুসের সেই লোকটা তখন তোকে বলছিল, তারানাথজিরা আজকের রাতটা গয়ারপুরে থাকবেন। জরুর ওখানে সামিয়ানা উমিয়ানা খাটানো রয়েছে।'

'হোগা অ্যায়সা।'

'ছিটা পড়লে ভিজতে হবে না।'

'হাঁ।'

'রাতটা আমরা ওখানেই কাটিয়ে দেবো। সুবে উঠে ট্রাকবালাদের হাতে পায়ে ধরে একটা গাড়িতে উঠব। ওরা আমাদের গাঁওয়ের নজদিগ পৌঁছুলে নেমে যাব।' বলে একটু থামে ফকিরা। জোরে জোরে শ্বাস টেনে ফের শুরু করে, 'তোরা কি আমার সঙ্গে ফিরে যাবি?'

নাটোয়ার জানায়, একবার যখন ঘর ছেড়ে বেরিয়েই পড়েছে, খালি হাতে সে অন্তত কিছুতেই ফিরে যাচ্ছে না।

এবার ফকিরা গোমতীকে জিজ্ঞেস করে, 'আর তুই ?'

গোমতীও একই উত্তর দেয়। টাকাপয়সা জোগাড় করতে না পারলে তার পক্ষেও ফেরা সম্ভব নয়।

ফকিরা নির্জীব স্বরে বলে, 'ঠিক হ্যায়। আমার বুখারটাই সব বরবাদ করে দিল।'

মাইলখানেক যাওয়ার পর পাশাপাশি দু'খানা গ্রাম পড়ল। ভারতমাতা রথ সেখানে আসতে দেখা যায়, হাইওয়ের দু'ধারে সামান্য কিছু লোকজন ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খুব সম্ভব ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় তেমন ভিড় হয়নি।

এত অল্প মানুষকে খুশি করার জন্য ভারতমাতা রথ-এর গতি কমানোর মানে হয় না। তা ছাড়া উদ্যোক্তাদের মাথায় আসন্ন ঝড়বৃষ্টির ব্যাপারটা হয়ত কাজ করছে।

'বোল রাধা বোল—' সুর বাজাতে বাজাতে রথ এগিয়ে যায়। অবশ্য এর মধ্যে রাস্তার ধারের লোকেরা তারানাথজিকে ফুলটুল দিয়ে কৃতার্থ বোধ করে। আর মহাদেও-এর আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা এবং জনতার উদ্দেশে জুলুসে যোগ দেবার জন্য দুমরলালের আমন্ত্রণ জানানোটাও হয়ে যায়। বিশেষ করে উৎকৃষ্ট ভোজনের কথাটা বার বার জানিয়ে দিতে ভোলে না দুমরলাল।

বেলা থাকতে থাকতেই ভারতমাতা রথ গয়ারপুর পৌঁছে যায়।

॥ দশ ॥

গয়ারপুর শহরও না, গ্রামও না। গ্রাম এবং শহরের মাঝামাঝি একটা জায়গা। নমকিপুরার মতো অত না হলেও প্রচুর লোকজন রাস্তার দু'ধারে ফুল মালা শাঁখ ইত্যাদি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানেও বড় প্যান্ডেলের পাশে ছোট জমকালো সামিয়ানা দেখা যাচ্ছে। আধারশিলা ঐ সামিয়ানার তলায় প্রতিষ্ঠা করবেন তারানাথ মিশ্র।

যথারীতি 'বোল রাধা বোল—' বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, শাঁখ বাজিয়ে ফুলমালা দিয়ে গয়ারপুরের লোকেরা তারানাথজিকে অভ্যর্থনা জানায়। তারপর তাঁকে সসম্ভ্রমে নামিয়ে নিয়ে সামিয়ানার তলায় সিংহাসনের মতো একটি দামী

আরামদায়ক প্রকাণ্ড চেয়ারে বসানো হয়।

নহরগঞ্জে যা যা হয়েছিল, একে একে এখানে সে সব ঘটে যায়। রথযাত্রার উদ্দেশ্য জানিয়ে কাঁপা গলায় তারানাথজির আবেগময় বক্তৃতা, আগামী চুনাও অর্থাৎ নির্বাচনের জন্য ভোট প্রার্থনা, শিলান্যাস, ইত্যাদি। এখানকার শিলান্যাসটা করা হয়েছে একটা বড় হাসপাতালের জন্য। ভবিষ্যতে নির্বাচনে জিততে পারলে এই হাসপাতালটা হবে গয়ারপুর এবং আর আশেপাশের দশ-বারটা গ্রামের জনগণকে তাঁর তরফে সামান্য উপহার।

শিলান্যাসের পর বড় প্যান্ডেলের তলায় মিছিলের লোকদের কাতার দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়। এবার শালপাতার ঠোঙায় তাদের খাবার দেওয়া হবে।

একধারে বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে আছে ফকিরা, তার দু'পাশে গোমতী আর নাটোয়ার।

হাঁটুর ভেতর থুতনি রেখে ফকিরা কিছু ভাবছিল। সে খুব নিচু গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কা রে নাটুয়া, আমি তো কাল সুবে সুবে চলে যাব। তোরা কী করবি ? জুলুসের সঙ্গে ঘুরবি ?'

নাটোয়ার জোরে জোরে মাথা নাড়ে, 'নেহীঁ, কভী নেহীঁ চাচা। আন্ধেরা থাকতে থাকতে আমিও চলে যাব।' মুখ ঘুরিয়ে গোমতীকে দেখাতে দেখাতে বলে, 'ও আওরত কী করবে, আমি জানি না।'

গোমতী সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, 'আমিও বেফায়দা জুলুসের সঙ্গে ঘুরব না।'

ফকিরা জিজ্ঞেস করে, 'তব্।'

'দেখি কী করা যায়। রাতটা তো কাটুক—'

একটু চুপচাপ।

তারপর গলার স্বর আরো খাদে ঢুকিয়ে ফকিরা বলে, 'একটা কথা ভাবছিলাম রে নাটুয়া—'

নাটোয়ার বলে, 'কা চাচা ?'

'আজ দুমরলালজিরা যে খানাউনা দেবে, আজ রাত্তিরে ওটা খেয়ে ফেলব না।'

নাটোয়ার অবাক হয়ে যায়। বলে, 'কী করবে তা হলে ?'

ফকিরা বলে, 'রেখে দেবো। কাল খানা জুটবে কিনা, জুটলে কখন জুটবে, কৌন জানে। হাতে কিছু রেখে দেওয়া ভাল।'

কথাটা ঠিকই বলেছে ফকিরা। লোকটা সত্যিই দূরদর্শী। নাটোয়ার আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'হাঁ। লেকেন—'

'কী ?'

'সবার সঙ্গে বসে না খেলে দুমরলালেরা গুস্‌সা হবে।'

'আরে বাবা, যতক্ষণ আমরা খাব, পুরা টেইম (টাইম) কি আর ওরা আমাদের ওপর নজর রাখতে পারবে! মওকা বুঝে চাপাটি উপাটি ঝোলায় সরিয়ে ফেলব।'

পরের দিনের জন্য খাবার মজুত করে রাখাটাই স্থির হয়। পাওয়ামাত্র খেয়ে ফেললে দুঃসময়ে চলবে কী করে ?

একসময় খাবার এসে যায়। আজ খাদ্যবস্তুর ঘটা কিছু বেশি। দুমরলাল এবং তার সঙ্গীরা শালপাতার থালায় ছ'খানা করে চাপাটি, প্রচুর ভাজি, বুন্দিয়া এবং একটি করে বড় গুলাবজামুন সাজিয়ে সবার হাতে হাতে দিতে থাকে।

নাটোয়াররা খুবই খুশি। তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে। ফকিরা ফিসফিসিয়ে বলে, 'না এলে ঠকে যেতাম রে নাটুয়া।'

নাটোয়ার তৎক্ষণাৎ সায় দেয়, 'হাঁ।'

এই সময় প্যান্ডেলের চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়। স্বয়ং তারানাথ মিশ্র সবার খাওয়ার তদারকি করতে এসেছে। সারা মুখে বিগলিত স্বর্গীয় একটি হাসি ফুটিয়ে মধুর গলায় বলেন, 'তোমরা আমার আপনা আদমী। পেট ভরে ভোজন কর। আরো চাপাটি দরকার হলে চেয়ে নেবে।'

তারানাথ গোটা প্যান্ডেলময় ঘুরতে থাকেন। তাঁর সঙ্গে সেই তিন পত্রকারও ঘুরছে। তাদের কেউ ক্যামেরা তাক করে ছবি তুলছে, কেউ জুলুসের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে ছোট খাতায় কী সব লিখে নিচ্ছে। আরেক জন তারানাথের গায়ের সঙ্গে লেগে থেকে সমানে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছে। তিনি জুলুসের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে হাসিমুখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন।

তারানাথ যখন নাটোয়ারদের কাছাকাছি এসেছেন সেই সময় এক পত্রকার তাঁকে জিজ্ঞেস করে, 'একটা কথা জানার খুব ইচ্ছে হচ্ছে তারানাথজি—'

তারানাথ বলে, 'হাঁ হাঁ, বোলিয়ে—'

'এমন 'গম্ভীর' কারণে রথযাত্রা শুরু করেছেন। কিন্তু চটকদার হিন্দি ফিল্মের সুর বাজাতে বাজাতে চলেছেন কেন ? কোই পেট্রিওটিক গানের মিউজিক বাজালে হ'ত না ?' বলে পত্রকার তারানাথজির মুখের দিকে তাকায়।

তারানাথ মিশ্র মুখ টিপে চোখ কুঁচকে সামান্য হাসেন। ঘাড় হেলিয়ে শ্লোকা গলায় বলেন, 'পত্রকারজি, আপনি তো বহুত বুদ্ধিমান আদমী, আপনিই

আন্দাজ করুন না—'

'পারছি না।'

অত্যন্ত গোপন আর দামী খবর দেবার ভঙ্গিতে তারানাথ বলেন, 'ফিল্মি গানার সুর না বাজালে লোক আসবে ? পলটিকসের সঙ্গে ফিলিম না মেলালে আজকাল জন-সংযোগটা পুরা হয় না। পীপলের সঙ্গে কনটাক্টের জন্যে ফিলিমটা বহুত জরুরি।'

পত্রকার কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, তারপর তারিফের গলায় হেসে হেসে বলে, 'ফাইন, ফাইন। তারানাথজি আপনাকে রুখতে পারবে না কেউ।'

'ধন্যবাদ।'

ওদিকে নাটোয়াররা বেশ কয়েক বার চাপাটি ভাজি চেয়ে নিয়েছে। প্রচুর খাবারদাবার পেয়ে যাওয়ায় খানিকটা তারা খেয়ে ফেলে, অনেকটাই কালকের জন্য থলেতে ভরে রাখে। দেখা যায়, শুধুমাত্র তারাই দূরদর্শী নয়, জুলুসের প্রায় সবাই তাদের মতোই ধুরন্ধর। সবার চিন্তাভাবনা প্রায় একই খাতে বইছে। ওরাও ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে খাবারের বেশির ভাগটাই পরের দিনের জন্য জমিয়ে রাখে।

'ভোজন' মিটতে মিটতে সন্ধে নেমে যায়। দুমরলালেরা কয়েকটা হ্যাজাক জ্বেলে প্যান্ডেলে এবং সামিয়ানায় টাঙিয়ে দিতে দিতে জানিয়ে দেয়, পাক্কা এক ঘণ্টা এই আলো জ্বালিয়ে রাখা হবে। এর ভেতর যেন সবাই শোবার ব্যবস্থা করে ফেলে।

ঠিক ঘণ্টাখানেক বাদে হ্যাজাকগুলো নিভিয়ে ফেলা হল। অবশ্য ততক্ষণে সবাই প্যান্ডেলের চারিদিকে ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছে। কেউ কেউ গল্পসল্প করছে। বেশির ভাগেরই চোখ ঘুমে জড়িয়ে এসেছে। সারাদিন মাইলের পর মাইল হেঁটে কতক্ষণ আর জেগে থাকা যায়!

এতক্ষণে আকাশে মেঘ আরো জমাট বেঁধেছে। থেকে থেকেই বিজলি চমকে যাচ্ছে। গুর গুর করে ভারী গম্ভীর ভয়ঙ্কর একটা আওয়াজ আকাশের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। আয়োজনটা পুরোপুরিই হয়ে আছে। এখন যে কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি নেমে যাবে।

প্যান্ডেলের একধারে নাটোয়াররা তিনজন শুয়ে পড়েছিল। ফকিরা মাঝখানে। তার ডাইনে নাটোয়ার, বাঁয়ে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে গোমতী। মাটিতে পিঠ ঠেকানোমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে ফকিরা। তবে নাটোয়ার এখনও জেগেই আছে। হ্যাজাকের আলো আটকাবার জন্য চোখের ওপর দুই

হাত আড়াআড়ি রেখে দিয়েছে। গোমতী ঘুমিয়েছে কিনা সে জানে না।

কথামতো ঠিক এক ঘণ্টা পরেই হ্যাজাক নিভিয়ে দেয় দুমরলালেরা। মুহূর্তে চারিদিক অন্ধকারে ভরে যায়। অন্ধকারটা এতই গাঢ় যে পাঁচ হাত দূরে নজর চলে না।

সারা শরীরে অসীম ক্লান্তি, আকাশ জুড়ে ঘন কালো মেঘ, ঠাণ্ডা হাওয়া—এক ঘুমে রাত কাবার করে দেবার মতো সব উপকরণই মজুত, তবু ঘুম আসছে না নাটোয়ারের। টাকাপয়সার চিন্তাটা তার মাথায় সমানে ঘুরছে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ঘাটানিয়া টাউনের টহলরামজির কথা মনে পড়ে যায়। ঘাটানিয়া এখান থেকে মাইল পাঁচেক উত্তর-পুবে। টহলরাম ঐ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ঠিকাদার। বারোমাসই গোটা উত্তর বিহার আর নেপাল জুড়ে তার কিছু না কিছু কাজ চলতেই থাকে। সড়ক বানানো, জঙ্গল কাটাই, কারখানার জন্য জমি দুরস্ত করা, পাথর দিয়ে নদীর বাঁধ তৈরি, ইত্যাদি হাজার রকমের কনট্রাক্ট নিয়ে থাকে সে। তার কাছে অনেক বার কাজ করেছে নাটোয়ার। লোকটার বিপুল চেহারার মধ্যে বিশাল একটি দিল রয়েছে। অন্য ঠিকাদারের চেয়ে সে ঢের বেশি মজুরি দিয়ে থাকে এবং কাজ শেষ হওয়ামাত্র পাই পাই হিসেব মিটিয়ে দেয়। অনেক সময় পরে কাজ করে দেবার জন্য আগাম টাকাও দিয়ে থাকে। বিশেষ করে নাটোয়ারের ওপর তার অগাধ আস্থা। টহলরাম জানে তাকে আগাম টাকা দিলে মার যাবে না।

নাটোয়ার ঠিক করে ফেলে কাল রাত থাকতে থাকতে এখান থেকে বেরিয়ে পড়বে। টহলরামজি যদি আপাতত কাজ না-ও দিতে পারে, পরে কাজ করে দেবার কড়ারে কিছু টাকা চেয়ে নেবে। আকাশে মেঘের যে সাজগোজ তাতে আজ থেকেই বৃষ্টি নামার সম্ভাবনা। আর বৃষ্টি মানেই চাষবাস। কিন্তু জমিতে লাঙল নামালেই জমি-মালিকেরা মজুরি দেবে না, তার জন্য দু-চারদিন সবুর করতে হবে। সেই ক'টা দিন পেট চালাতে হবে তো।

টহলরামের কথা মনে পড়তে দুশ্চিন্তা কেটে যায় নাটোয়ারের। বেশ আরামই বোধ করে সে। আগেই যদি তার কথা মাথায় আসত ভারতমাতা রথ-এর পেছন পেছন অকারণ এতটা হাঁটাহাঁটি করতে হ'ত না, নমকিপুরা থেকে মাঠ ভেঙে সোজা ঘাটানিয়ায় চলে যাওয়া যেত।

আস্তে আস্তে চোখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে চারিদিকে তাকায় নাটোয়ার। দূরে দূরে দু-একজনের চাপা ঘুমন্ত গলা শোনা যাচ্ছে। কী বলছে বোঝা যায় না। ওরা ছাড়া আর বোধ হয় কেউ জেগে নেই। ডান পাশ থেকে

ফকিরার জোরে জোরে শ্বাসটানার আওয়াজ আসছে। কাত হয়ে নাটোয়ার দেখতে পায়, ফকিরার সরু রোগা বুক হাপরের মতো ওঠানামা করছে। তার দু চোখ বোজা। ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক হয়ে রয়েছে। গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে সে।

খানিকক্ষণ ফকিরাকে লক্ষ করে নাটোয়ার। একসময় তার ওপর দিয়ে নাটোয়ারের চোখ চলে যায় গোমতীর দিকে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, ঘন অন্ধকারে মেয়েমানুষের শরীরের আবছা একটা কাঠামো শুধু পড়ে আছে।

গোমতী পালিয়ে যাবার পর চারটে বছর নারীসঙ্গহীন নিরুৎসব জীবন কাটাচ্ছে নাটোয়ার। মেয়েমানুষ সম্পর্কে তার ঘৃণা আর বিদ্বেষ এমনই তীব্র হয়ে উঠেছিল যে নতুন করে চুমৌনার কথা এর ভেতর সে কখনও ভাবেনি। তার একরোখা মন গোমতীর বিশ্বাসঘাতকতার কারণে দুনিয়ার সব মেয়েমানুষ সম্পর্কেই বিরূপ হয়ে ছিল। কী আশ্চর্যভাবেই না চার বছর বাদে কাল ফের গোমতীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে। আর আজ এখন, এই মুহূর্তে মাত্র ছ' সাত হাত দূরে সে শুয়ে আছে।

একদিন এই মেয়েমানুষটি ছিল নাটোয়ারের একান্ত নিজস্ব। তার সম্বন্ধে ক্রমশ যে বিতৃষ্ণা আর রাগ সে পুষে রেখেছিল আজ সকালে ফকিরা তার ঝাঁঝ অনেকটাই কাটিয়ে দিয়েছে। গোমতী যেমন তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তেমনি যে হারামজাদের ছৌরার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল সে-ও তাকে পথে বসিয়ে ভেগে গেছে। তারপর বাপের ঘরে ফিরে গিয়ে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য ক্রমাগত লড়াই-ই করে চলেছে। এর ভেতর সুখের মুখ সে কখনও দেখেনি। তার বরাতে শুধুই দুঃখ আর কষ্ট। সকালের মতোই গোমতী সম্পর্কে এক ধরনের সহানুভূতি হতে থাকে নাটোয়ারের। তা-ই নয়, মেয়েমানুষটা বিলকুল নষ্ট হয়ে গেছে। সবার কাছেই সে ঘৃণ্য, নোংরা, তার ছায়া মাড়ানোও পাপ। তবু এই মুহূর্তে প্রবল আকর্ষণে চুম্বকের মতো নষ্ট আওরতটা তাকে যেন টানতে থাকে। চার বছর আগের গোমতী আর নেই, তার শরীর অনেকটাই ক্ষয়ে গেছে। তবু এখনও যৌবনের যে তলানিটুকু শরীরে পড়ে রয়েছে, নাটোয়ারের মতো একটি পুরুষের বুকের ভেতরকার আগুনকে উসকে দেবার পক্ষে তা যথেষ্ট, বিশেষ করে রাতের এই অন্ধকারে যখন আকাশজোড়া মেঘ আর বিজলিচমক নিয়ে সমস্ত চরাচর সৃষ্টিছাড়া দুর্যোগের জন্য দমবন্ধ করে অপেক্ষা করছে।

নাটোয়ার টের পায়, তার বুকের ভেতর সাঁ সাঁ করে খ্যাপা ঝড় বয়ে

যাচ্ছে। নিজের অজান্তে হাতের ভর দিয়ে কোমর থেকে শরীরের ওপরের অংশটা একটানে অনেকখানি তুলে ফেলে ডাকে, 'এ গোম্‌তী— গোম্‌তী—' তার গলার স্বর চাপা এবং খসখসে, অদ্ভুত উত্তেজনায় কাঁপছে।

গোম্‌তী ঘুমোয়নি। এই ডাকটার জন্যই যেন রুদ্ধশ্বাসে পড়ে ছিল। তক্ষুনি ফিসফিসিয়ে সাড়া দেয়, 'কা ?'

'ঘুমিয়ে পড়েছিলি ?'

'নেহীঁ।'

'এধারে চলে আয়।'

'নেহীঁ।'

'কায় রে ?'

একটু চুপ করে থাকে গোম্‌তী। তারপর বলে, 'তুমি তো আমাকে খুন করতে চেয়েছিলে—'

নাটোয়ার বলে, 'আমার মাথায় গুস্‌সা চড়ে গিয়েছিল, তা-ই। ও বাত ভুল যা। চলী আ ইধর—'

'নেহীঁ।'

'আরে বাবা ডর নেহীঁ, আমি তোকে মারব না। চলে আয়—'

গোম্‌তী আবার বলে, 'নেহীঁ—'

নাটোয়ার অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, 'বার বার নেহীঁ নেহীঁ করছিস কেন ?'

গোম্‌তী বলে, 'ডাঁয়া বাঁয়া সামনা পিছে 'এত্তে এত্তে আদমী—'

চারপাশের মানুষজন সম্পর্কে এতক্ষণ যেন খেয়াল ছিল না নাটোয়ারের। গোম্‌তীর না আসার কারণটা আন্দাজ করে নিয়ে সে বলে, 'সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।'

গোম্‌তী বলে, 'আন্ধেরাতে কে জেগে আছে আর কে ঘুমিয়ে পড়েছে, বুঝব কী করে ? কেউ দেখে ফেললে বড়ী শরমকি বাত। তা ছাড়া বহোত ঝামেলা হয়ে যাবে।'

গোম্‌তী যা বলেছে তার ষোল আনাই সঠিক। তাদের দু' জনকে অন্ধকারে একসঙ্গে কেউ দেখে ফেললে তার পরিণতি আদৌ সুখকর হবে না। দুমরলালেরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, মেরে একেবারে শেষ করে ফেলবে। এই ভ্রষ্টাচার কেউ সহ্য করবে না।

নাটোয়ার বুঝতে পারছিল, তার সমস্ত শরীর তাতানো লোহার পাতের মতো হয়ে উঠেছে। নাকমুখ দিয়ে গরম ঝাঁঝ বেরিয়ে আসছে। নিজেকে ধাতস্থ

করতে সময় লাগে তার। একসময় বলে, 'ঠিক হ্যায়। চাচাকে ডিঙিয়ে এধারে আসতে হবে না। সিরিফ আরেকটু এগিয়ে আয়।'

শরীরটাকে হেঁচড়ে হেঁচড়ে খানিকটা এগোয় গোম্‌তী। দু'জনের মাঝখানে ঘুমন্ত ফকিরা দুর্ভেদ্য দেয়ালের মতো পড়ে থাকে।

নাটোয়ার চোখের পাতা টান করে তাকিয়ে ছিল। সে দেখতে পায় জমাট-বাঁধা অন্ধকারের মতো মানুষের একটা কাঠামো ফকিরার ওধারে এসে স্থির হয়ে গেছে। ইচ্ছা করলে ফকিরার ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে এখন গোম্‌তীকে ছোঁয়াও যায়।

নাটোয়ার বলে, 'কাল ভোর হওয়ার আগেই আমি এখান থেকে চলে যাব।'

গোম্‌তী যেন চমকেই ওঠে, 'কঁহা ?'

'ঘাটানিয়া টৌনে।'

'সেখানে কী ?'

'পাইসা কামাই করতে হবে না ?'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর নাটোয়ার জিজ্ঞেস করে, 'তুই কী করবি ?'

গোম্‌তী বলে, 'গুসসা না হলে বলি—'

অসীম উদারতায় নাটোয়ার বলে, 'গুস্‌সা হব কেন ? তুই বলে ফেল।'

'আমাকে তোমার সঙ্গে নেবে ?'

'আমি ঠিকাদারের কাছে কাজ করব।'

'আমার কাজের একটা ব্যওস্থা করে দিতে পারবে না ?'

'তা পারব। লেকেন—'

'কা ?'

'ওরা সুবে থেকে সাম তক খাটায়—বিলকুল গতর-চুরণ খাটনি। পারবি ?'

'পারব। পাইসার জন্যে আমি সব কিছু করতে পারি।'

'ঠিক হ্যায়। তা হলে আমার সঙ্গেই যাস।'

'হাঁ।'

'কেউ ওঠার আগেই উঠে পড়বি। আমার ঘুম যদি না ভাঙে, জাগিয়ে দিস।'

'দেবো। তুমি আগে উঠলে আমাকে ডেকো।'

এরপর কেউ আর কিছু বলে না। একসময় দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়ে।

॥ এগার ॥

অনেকক্ষণ ধরে কে যেন কাঁধের কাছে ঝাঁকুনি দিতে দিতে সমানে ডেকে যাচ্ছে। 'ঘুমের ঘোরে প্রথমটা বুঝে উঠতে পারছিল না নাটোয়ার। ঝাঁকুনিটা জোরালো হতে সে ধড়মড় করে উঠে বসে।

কাল রাতে মনে হয়েছিল, আকাশ ভেঙে হুড়মুড় করে বৃষ্টি নেমে আসবে কিন্তু দু-চার ফোঁটার বেশি পড়েনি। এত বড় মাপের আয়োজনটা প্রায় ব্যর্থ হয়ে গেছে।

অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে। ভোর হ'তে আর বেশি দেরি নেই। ঘুমের চটকা কাটলে নাটোয়ার দেখতে পায়, ফকিরা তার পাশে বসে আছে। কিন্তু গোমতী ওধারে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। নাটোয়ারের মনে পড়ে, গোমতীকে কাল রাতে বলেছিল, যার আগে ঘুম ভাঙবে সে যেন অন্যকে জাগিয়ে দেয়। কিন্তু সে বা গোমতী জেগে ওঠার আগেই ফকিরার ঘুম ভেঙে গেছে।

গোটা প্যাণ্ডেল জুড়ে দু আড়াই শ লোকের একজনেরও ঘুম ভাঙেনি। কেউ হাত-পা ছড়িয়ে, কেউ চিতপাত হয়ে, কেউ হাঁ করে, কেউ বা কুকুরের মতো কুণ্ডলি পাকিয়ে চারিদিকে পড়ে আছে। তাদের নাকমুখ থেকে সরু মোটা ভোতা—নানা ধরনের আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

ফকিরা বলে, 'একটু পরেই আন্ধেরা কেটে যাবে। এখন বেরিয়ে পড়বি তো ? দুমরলালেরা জেগে গেলে জরুর আটকে দেবে।'

'হাঁ হাঁ—' ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে নাটোয়ার। গোমতীকে দেখিয়ে বলে, 'লেকেন ও আওরত—'

ফকিরা এবার ঠেলেঠুলে গোমতীকে জাগিয়ে দেয়। তারপর তিনজন ক্ষিপ্র হাতে কালকের বাড়তি খাবার দাবার গুছিয়ে নিয়ে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে পা টিপে টিপে বেরিয়ে পড়ে। হাইওয়েতে এসে তারা একরকম দৌড়েই সামনের দুটো বাঁক ঘুরে একটা ঝাঁকড়া-মাথা পিপর গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ায়। এখান থেকে তারানাথজিদের প্যাণ্ডেলটা আর দেখা যাচ্ছে না। দুমরলালরা তাদের দেখতে পাক, এটা কোনোমতেই কাম্য নয়।

নাটোয়ার বলে, 'এত ভোরে খুব বেশি টৈরাক (ট্রাক) আসে না। লরীবালাদের জন্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, কে জানে।'

ফকিরা বলে, 'কাল তবিয়ত বহোত খারাপ লাগছিল। আজ ঠিক হয়ে গেছে। জ্বরটাও নেই। আমি তোদের সঙ্গে ঘাটানিয়া টৌনেই যাব রে

নাটুয়া—'

নাটোয়ার এবং গোমতী দু'জনেই চমকে ওঠে। নাটোয়ার বলে, 'ঘাটানিয়া টৌনে !'

'হাঁ।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে ফকিরা, 'কাল রাত্তিরে বহু আর তুই ঠিক করলি না, আজ সুবে সুবে উঠে ঘাটানিয়া যাবি।'

নাটোয়ার প্রচণ্ড অস্বস্তিবোধ করতে থাকে। কাল রাতে তারা ভেবেছিল ফকিরা ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সে জেগেই ছিল এবং তাদের ঘাটানিয়া যাবার কথা তার কানে গেছে। সে কী কারণে মাঝরাতে গোমতীকে কাছে ডেকেছিল, নিশ্চয়ই তার অজানা নেই। চোখের কোণ দিয়ে সে একবার গোমতীকে দেখে নেয়। আওরতটার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেছে।

নাটোয়ার ফকিরার মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না। চোখ নামিয়ে সে বলে, 'হাঁ।'

ফকিরা বলে, 'টহলরামজির কাছে আমিও দু-চারবার কাজ করেছি। আচ্ছা আদমী। দেখি যদি কিছু কামাইয়ের বন্দোবস্ত হয়ে যায়।'

'তোমার তবিয়তের যা হাল, বেশি খাটতে কি পারবে ?'

'নেহীঁ। কুছ ইডভান্স চেয়ে নেবো। পরে খেটে শোধ করে দেবো।'

'ঠিক হ্যায়, চল চাচা—'

ওরা বরাবর হাঁটতে শুরু করে।

এখান থেকে হাইওয়ে ধরে আধ মাইলের মতো যাবার পর ডান পাশে ফাঁকা মাঠ। মাঝে মাঝে দু-একটা গাঁ। তারপর ঘাটানিয়া টাউন।

জ্বর ছেড়ে যাওয়া, কাল দু বেলা ভরপেট ভোজন এবং একটা রাত টানা ঘুমের পর আজ ফকিরা অনেকটাই সুস্থ বোধ করছে। এখনও শরীর বেশ কাহিল তবু তাকে ধরে ধরে নিয়ে যাবার দরকার হচ্ছে না।

ফকিরা বলে, 'উপরবালার মেহেরবানিতে মনে হচ্ছে, জ্বরটা আর আসবে না রে নাটুয়া।'

নাটোয়ার বলে, 'না এলেই ভাল।'

কাল যে মেঘগুলো জমাট বেঁধেছিল আজ তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। আকাশ যদিও ঘোলাটে হয়ে আছে তবু মেঘের ফাঁক দিয়ে একসময় রোদের ঝিলিক বেরিয়ে আসতে থাকে।

আধ মাইল হাঁটার পর নাটোয়াররা ডান দিকের মাঠে নামে। এখান থেকে আড়াআড়ি আরো মাইল তিনেক গেলে ঘাটানিয়া টাউন।

এদিকের মাঠটাঠ আদৌ সমতল নয়, যতদূর চোখ যায় ঢেউ খেলানো। ঘাস বলতে বিশেষ কিছু নেই। এই অজন্মার বছরে যেটুকু ফসল ফলেছিল কবেই জমি-মালিকেরা তা কেটে নিয়ে খালিহানে (গোলায়) তুলে ফেলেছে। শস্যহীন, শূন্য খেত জুড়ে কিছু মেঠো ইঁদুর, গোসাপ আর গিরগিটি রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। চাষের খেত বাদ দিলে যে সব জমি রয়েছে সেখানে শুধুই ট্যারাবাঁকা চেহারার সিসম আর কাঁটা ঝোপ। দূরে আকাশের গা ঘেঁষে ধোঁয়ার দৈত্যের মতো পাহাড়ের সেই রেঞ্জটা এখানেও হাজির।

হাইওয়ে থেকে নামার পর নাটোয়ারেরা যখন রশি দুই-এর মতো পেরিয়ে এসেছে সেই সময় কোত্থেকে যেন আকুল গলার তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে আসে, 'কোঈ হ্যায়, মেরা বাপুকো বঁচাও—'

নাটোয়াররা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারা ভীষণ হকচকিয়ে গেছে। বিমূঢ়ের মতো তিনজনই এধারে ওধারে তাকাতে থাকে। কিন্তু সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে যতদূর চোখ যায় বিশাল মাঠ একেবারেই জনশূন্য, ধুধু, কেউ কোথাও নেই।

নাটোয়ার নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়েই যেন বলে, 'কে ডাকছে?'

ফকিরা বলে, 'কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না।'

গোমতী বলে, 'মনে হচ্ছে, কমবয়সী কোনো ছৌরার গলা—'

তার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই দেখা যায়, ডান পাশে খানিক দূরে যে উঁচু ঝোপ ঝাড় রয়েছে তার আড়াল থেকে সত্যি সত্যিই একটা বার তের বছরের ছেলে উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৌড়ুতে দৌড়ুতে তাদের কাছে চলে আসে। ছেলেটার চোখ টকটকে লাল, মাথায় খাড়া খাড়া রুক্ষ চুল, পরনের নোংরা জামা প্যান্টে চাপ চাপ রক্ত, সারা মুখে আতঙ্ক। মনে হয়, প্রচণ্ড ভয় তাকে যেন তাড়া করে নিয়ে এসেছে।

অনেকটা দৌড়ে আসার কারণে ভীষণ হাঁপাচ্ছিল ছেলেটা। উদ্বিগ্ন মুখে নাটোয়ারেরা তিনজন একই সঙ্গে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কে তুই? কী হয়েছে?'

'আমি—আমি—' বলতে বলতে তার ছোট শরীর টলে যায়, হুড়মুড় করে ঘাড় গুঁজে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে।

ফকিরা চেঁচিয়ে ওঠে, 'বেহোঁশ হো গিয়া। নাটোয়ার জলদি পানি লেকে আ—'

ফকিরা ছেলেটার পাশে বসার আগেই, গোমতী ক্ষিপ্র মোচড়ে তার

শরীরটাকে বাঁকিয়ে পা ছড়িয়ে বসে ছেলেটার মাথা তার কোলের ওপর তুলে নেয়। ফকিরা তার পা বার বার মুড়ে, পরক্ষণে টান টান করে দিতে থাকে।

কাছেই একটা মজা নহর রয়েছে। এক দৌড়ে সেখান থেকে জল নিয়ে এসে ছেলেটার চোখেমুখে ছিটে দিতে থাকে। নাটোয়ার। কিছুক্ষণ জল ছিটানো আর হাত-পা টানাটানির পর ছেলেটা আস্তে আস্তে চোখ মেলে। তার হুঁশ ফিরে এসেছে।

খানিকক্ষণ ঘোর-লাগা চোখে তিনটি অচেনা উৎকণ্ঠিত মুখ লক্ষ করে ছেলেটা, তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসে।

ফকিরা খুব নরম গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কে তুই? কী নাম? তোর গাঁয়ে এত খুন কেন?'

পুরনো আতঙ্কটা আবার ছেলেটার চোখেমুখে ফিরে আসে। আচমকা দু হাতে মুখ ঢেকে সে কেঁদে ওঠে। কাঁদতে কাঁদতেই জড়ানো, ভাঙা ভাঙা গলায় সে যা বলে যায় তা এইরকম। তাদের গাঁও পরিন্দা এখান থেকে মাইল তিরিশেক দূরে, পাহাড়ের ওপারে। জাতে তারা দুসাদ। নাম তার লচ্ছু। বাপ আর সে ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ নেই তাদের। পরশু জমিজমা নিয়ে পরিন্দাতে ভীষণ গোলমাল হয়েছিল। বড় জমিমালিকের নিজস্ব বন্দুকবাজেরা সেখানে হানা দিয়ে তের চোদ্দজনকে খুন করে ফেলে, আগুন লাগিয়ে অচ্ছুতদের পুরা গাঁও জ্বালিয়ে দেয়। জখম যে কত হয়েছে তার হিসেব নেই। ছেলেটার বাপের পায়ে এবং পিঠে গুলি লেগেছিল। রক্তাক্ত বাপকে ধরে ধরে আর টেনে টেনে ঘাটানিয়ার হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য পরশু রাতে পরিন্দা থেকে সে বেরিয়ে পড়েছে। বাপের রক্তে লচ্ছুর জামাপ্যান্ট মাখামাখি হয়ে গেছে।

কিন্তু বাপকে ঘাটানিয়ায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। দূরে ঐ ঝোপঝাড়গুলোর ওধারে আসতেই সে একেবারে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যায়। লোকজন ডাকার জন্য অগত্যা উন্মাদের মতো বাপকে রেখে এধারে ছুটে আসতে আসতে নাটোয়ারদের দেখতে পায় লচ্ছু।

কথা শেষ করে লাফ দিয়ে উঠে পড়ে ছেলেটা। বলে, 'তোমরা আমাদের সঙ্গে এসো। বচাও মেরে বাপুকো—' বলেই ঝোপঝাড়গুলোর দিকে দৌড়তে থাকে।

ফকিরা বলে, 'চল্ নাটুয়া, চল্ রে বহু—'

তিনজনে ছেলেটার পেছন পেছন দৌড়ে কাঁটাগাছের ঝাড়ের পেছনে

আসতেই দেখতে পায়, মাঝবয়সী একটা লোক এবড়ো খেবড়ো মাটির ওপর পড়ে আছে। জামাকাপড় এবং শরীরের খোলা জায়গাগুলোতে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। চোখদুটো আধ বোজা, হাত মুঠো পাকানো, রুক্ষ তেলহীন চুল ধুলোয় মাখামাখি। কাছাকাছি একটা সিসম গাছের মাথায় এসে দুটো শকুন ঘাড় বাঁকিয়ে লচ্ছুর বাপকে দেখছে। কিছু একটা টের পেয়েছে তারা।

ফকিরা হাঁটু গেড়ে অনেকখানি ঝুঁকে লোকটাকে ডাকতে থাকে, 'এ আদমী—এ আদমী, আঁখ তো খুলো—'

লোকটার সাড়াশব্দ নেই। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফকিরার দুই চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। বেশ কিছুক্ষণ সে তাকে লক্ষ করে। তারপর আরো নুয়ে মুখটা তার বুকের কাছে নিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে টের পায়, লোকটার শ্বাসক্রিয়া একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। সে চোখও খুলবে না, সাড়াও দেবে না।

আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে একবার ফকিরা লচ্ছুর দিকে তাকায়। লচ্ছু দমবন্ধ করে তার বাপকে লক্ষ করছে। রুদ্ধ গলায় সে জিজ্ঞেস করে, 'বাপু কথা বলছে না কেন ?'

চোখের ইশারায় ফকিরা গোম্‌তীকে কাছে ডাকে। খুব চাপা গলায় বলে, 'লচ্ছুকো সামালহো বহু—'

গোম্‌তী জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে চাচা।' তার গলার স্বরে তীব্র উৎকণ্ঠা ফুটে বেরোয়।

উস্‌কা মৌত হো গিয়া—'

যদিও খুব নিচু গলায়, প্রায় ফিসফিসিয়ে কথাগুলো বলেছে ফকিরা কিন্তু লচ্ছু ঠিক শুনে ফেলে। 'বাপু—উ-উ-উ—' বুক ফাটানো চিৎকার করে সে বাপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বুকে সমানে মুখ ঘষতে থাকে।

গোম্‌তীর বুকের ভেতরটা দুমড়ে যেন চুরমার হয়ে যায়। চারটে বছর আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে সে। কত ঘাটের জল খেয়েছে তার ঠিক নেই। কত কী-ই না দেখেছে, তার প্রায় সবটাই খারাপ, জঘন্য, বিপজ্জনক। কিন্তু এমন মারাত্মক দৃশ্য আগে আর কখনও চোখে পড়েনি।

গোম্‌তীর স্বভাবে কোমলতা বলতে কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই। নানা অভিজ্ঞতা তাকে কর্কশ, হয়ত বা খানিকটা নিষ্ঠুরই করে তুলেছে। কিন্তু নিজের অজান্তে কখন যে তার দু চোখ জলে ভরে গেছে, গোম্‌তী টের পায়নি। হাত বাড়িয়ে লচ্ছুকে টানতে যাবে, হঠাৎ কী ভেবে ফকিরা হাত তুলে বাধা দেয়,

'ওকে আরেকটু কাঁদতে দাও বহু—'

কেঁদে কেঁদে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে লচ্ছু। তার গলার ভেতর থেকে এখন গোঙানির মতো কাতর আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

বন্দুকবাজদের গুলিতে অকালে মরে যাওয়া এক অচ্ছুৎ এবং তার শোকাচ্ছন্ন একমাত্র ছেলেকে ঘিরে বিহ্বলের মতো বসে থাকে গোম্‌তী, নাটোয়ার এবং ফকিরা।

মাথার ওপর অসময়ের মেঘ ক্রমশ কেটে যাচ্ছে। বৈশাখের গনগনে রোদ যেন কাল থেকে কোনো একটা খাপের মধ্যে আটকানো ছিল, সেটা বেরিয়ে পড়তে শুরু করেছে।

সিসম গাছের মাথায় কখন যে আরো চার পাঁচটা শকুন এসে দল বাড়িয়েছে, কেউ লক্ষ করেনি।

একসময় ফকিরা গোম্‌তীকে চোখের ইশারায় লচ্ছুকে দেখিয়ে দেয়। গোম্‌তী লচ্ছুর কাঁধে হাত রেখে ধরা ধরা নরম গলায় বলে, 'আও বেটা, মেরা পাশ আও—'

লচ্ছু আসে না, বাপকে আরো জোরে সে আঁকড়ে ধরে। উন্মাদের মতো মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে, 'নেহীঁ—নেহীঁ—নেহীঁ—'

অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত লচ্ছুকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে বসে থাকে গোম্‌তী। সমানে বলতে থাকে, 'মাত্ রো বেটা, মাত্ রো—শান্ত হো যা—'

কোনোরকম সান্ত্বনার কথাই কানে ঢুকছে না লচ্ছুর। অধীর, শোককাতর ছেলেটা আচ্ছন্নের মতো মৃত বাপের দিকে তাকিয়ে অনবরত ফোঁপাতেই থাকে।

খানিক দূরে বসে ফকিরা আর নাটোয়ার লচ্ছু এবং তার বাপের সম্পর্কে কথা বলছিল। এদের এভাবে জনহীন ফাঁকা মাঠের মাঝখানে ফেলে চলে যাওয়া যায় না। ঘাটানিয়া টাউনে ঠিকাদার টহলরামজির কাছে যাবার কর্মসূচি এই মুহূর্তে বাতিল করে দিতে হয় নাটোয়ারদের।

নাটোয়ার চিন্তিতভাবে বলে, 'অব্ কা করোগে চাচা ?'

ফকিরা জানায়, দু'টি কাজ করা যায়। এক, মৃতদেহ নিয়ে ঘাটানিয়া টাউনে গিয়ে সোজা পুলিশ চৌকিতে তারা তুলে দিতে পারে। এতে লচ্ছু এবং তার বাপের কোনো দায়িত্বই তাদের থাকবে না। দুই, তাদের কেউ গিয়ে পুলিশকে ডেকেও নিয়ে আসতে পারে। তবে এর মধ্যে খানিকটা সংশয়ও রয়েছে।

খবর দিলেই যে একটা অচ্ছুতের মড়ার জন্য সব কাজ ফেলে পুলিশ দৌড়ে আসবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। তা ছাড়া এ সব হাঙ্গামার মধ্যে মাথা ঢোকালে কতক্ষণ আটকে থাকতে হবে, কে জানে।

নাটোয়ার বলে, 'আরো একটা কথা ভাবো চাচা—'

ফকিরা জিজ্ঞেস করে, 'কা ?'

'পুলিশকে ভরোসা নেই। ওরা যদি আমাদেরই চালান করে দেয়—'

'ও শালেলোগ সব পারে। হয়ত বলবে, আমরাই খুন করেছি।'

'তা হলে ?'

'দাঁড়া, আগে লচ্ছুকে জিজ্ঞেস করে দেখি।'

ফকিরা লচ্ছুর কাছে এগিয়ে এসে খুব কোমল গলায় বলে, 'দেখো বেটা, বহোত দুখকা বাত, তোমার বাপকে এভাবে মরতে হ'ল। লেকেন তাকে তো এমন করে ফেলে রাখা যায় না। কী করতে চাও, বল—'

রক্তাভ ঘোলাটে চোখে তাকায় শুধু লচ্ছু। কী উত্তর দেবে, ভেবে পায় না।

ফকিরা বুঝিয়ে দেয়, কারো মৃত্যু ঘটলে হয় কবর, নইলে পুড়িয়ে ফেলতে হয়। লচ্ছুরা যখন হিন্দু তখন তাদের অন্তিম সংস্কার চিতা সাজিয়েই করতে হয়। লচ্ছু যদি বলে, সে ব্যবস্থা নাটোয়ার এবং গোম্‌তী করে দেবে। দূরে থেকে তাকে সাহায্য করবে ফকিরা।

লচ্ছু বুঝতে পারছিল, এই লোকগুলো বড় ভাল। এদের দেখা না পাওয়া গেলে ফাঁকা মাঠে সে তার বাপুকে নিয়ে যে কী করত তা ভাবার মতো এখন মনের অবস্থা নয়। আস্তে করে মাথাটা সামান্য হেলিয়ে দেয় সে অর্থাৎ ফকিরারা যা করবে তাতে তার কোনোরকম আপত্তি নেই। কাজেই নাটোয়ার আর ফকিরা উঠে পড়ে। চারিদিকে প্রচুর সিসম আর পিপর গাছ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তারা অজস্র শুকনো ডালপালা ভেঙে এনে মোটামুটি পরিষ্কার জায়গায় রাখে। এরপর নাটোয়ার চিতা সাজিয়ে ফেলে। ফকিরা মড়া ছোঁয় না, খানিক দূরে বসে থাকে। নাটোয়ার নহর থেকে জল এনে এনে মৃতদেহ ধুইয়ে চিতায় শুইয়ে দেয়। তারপর লচ্ছুকে ডাকে, 'আও, ইধর আও—' বাপের মুখাগ্নি করতে হবে লচ্ছুকে।

গোম্‌তী লচ্ছুকে জড়িয়ে ধরে বসে ছিল। সেইভাবেই তাকে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'চল বেটা—'

অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে গোম্‌তীর সঙ্গে গিয়ে বাপের মুখে আগুন দিয়ে আবার

তার সঙ্গেই আগের জায়গায় ফিরে যায় লচ্ছু। গোম্‌তী তাকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকে।

শুকনো কাঠের চিতায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে নাটোয়ার। দাউ দাউ করে লকলকে হলকা আকাশের দিকে উঠতে থাকে। বাপের অন্তিম সংস্কার দেখতে দেখতে একেবারে ভেঙে পড়ে লচ্ছু। দু চোখ বেয়ে স্রোতের মতো জল গড়িয়ে পড়ছে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে একটানা জড়ানো স্বরে সে বলে যায়, 'বাপু—বাপু—বাপু—'

'রো মাত্ রো মাত্—' লচ্ছুর মাথায় বুকে কাঁধে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলতে থাকে গোম্‌তী। তার মধ্যে যে ভারি কোমল, একান্ত মমতাময়ী একটি মা ছিল, নিজেই সে জানত না।

কান্না থামে না লচ্ছুর। সে বলে, 'বাপু হো, হামনিকা বাপু, কা হোনা হামনিকা ?' হঠাৎ গোম্‌তীর হাত ছাড়িয়ে চিতার দিকে দৌড়ে যায়। গোম্‌তীও সতর্ক ছিল, ফের লচ্ছুকে ধরে দূরে সরিয়ে আনে। তাকে সবলে দু হাতে ঘিরে রেখে বলে, 'বেটা, কারো মা-বাপ কি চিরকাল বেঁচে থাকে ? ভগোয়ানকা দুনিয়ায় একদিন না একদিন হর আদমীর মৌত হয়।'

এ সব দার্শনিক কথাবার্তা বোঝার মতো বয়স হয়নি লচ্ছুর, সেই সময়ও এটা নয়। অবিরাম কাঁদতেই থাকে সে, 'বাপু—বাপু—বাপু—'

দুটো দিন মেঘের তলায় চাপা থাকার পর বৈশাখের সূর্য আবার তার পুরনো স্বভাব ফিরে পেয়েছে। রোদে এখন ছুরির ধার। আর নিচে চিতার আগুন। সব মিলিয়ে এই ফাঁকা মাঠের অনেকটা জায়গা জুড়ে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে।

তারপর সূর্য কখন মাথার ওপর উঠে এসেছিল আর কখন পশ্চিম আকাশের খাড়া পাড় বেয়ে বেশ খানিকটা নেমে গেছে, কেউ লক্ষ করেনি।

বেলা পড়ে এসেছে। ঘণ্টা তিনেক আগেও চাকুর ফলার মতো রোদ মাঠঘাট আর গাছপালার মাথায় ঝলকাচ্ছিল। এখন সেই রোদের তেজ অনেক মরে এসেছে। হাওয়াও দ্রুত জুড়িয়ে যাচ্ছে।

এদিকে চিতার আগুন নিভে যাচ্ছে। লচ্ছুর বাপের শরীর ছাই হয়ে মাটিতে মিশে গেছে। তিরিশ মাইল দূরের এক অখ্যাত গাঁয়ের নগণ্য এক দুসাদ জমিমালিকের পোষা বন্দুকবাজদের গুলি খেয়ে প্রাণ বাঁচাতে ঘাটানিয়া টাউনের হাসপাতালে যাচ্ছিল। সেখানে পৌঁছানো আর হয়ে ওঠে না। তার রক্তাক্ত

শরীরটা নিয়ে শকুন আর গিধেরা ভোজসভা বসিয়ে দিতে পারত। এটুকুই সান্ত্বনা তেমন একটা শোকাবহ পরিণতি অন্তত ঘটেনি।

চিতা নিভে যাবার পর সামনের মজা নহর থেকে নাটোয়ার এবং গোম্‌তী লচ্ছুকে স্নান করিয়ে আনে। তার জামাটামা রক্তে মাখামাখি হয়ে ছিল। লচ্ছুকে নিজের একটা শুকনো কাপড় পরিয়ে তার জামাপ্যান্ট ধুয়ে সিসম গাছের ডালে শুকোতে দেয় গোম্‌তী। তারপর নিজেও স্নান করে আসে। এর ভেতর নাটোয়ারও নহরের জলে নাহানা চুকিয়ে এসেছে।

সেই সকাল থেকে প্রচণ্ড ধকল গেছে। এতক্ষণ খাওয়ার কথা কারো খেয়াল ছিল না। এখন ক্লান্তিতে শরীর একেবারে ভেঙে আসছে। তা ছাড়া খিদেটাও পেটের ভেতর চাড়া দিয়ে উঠেছে।

চারজন মাঠের ওপর গা এলিয়ে বসে ছিল। কোনোরকম আশা নেই বুঝতে পেরে সামনের সিসম গাছটার মাথা থেকে সেই শকুনগুলো কখন উড়ে চলে গেছে, কে জানে।

নাটোয়ার বলে, 'বহোত ভুখ লগা চাচা। চোখে একেবারে অন্ধেরা দেখছি।'

ফকিরা বলে, 'হাঁ। এবার খেয়ে নেওয়া যাক।'

রথওয়ালারা কাল যে খাবারদাবার দিয়েছিল তার প্রায় সবটাই গোম্‌তীর ঝোলায় রেখে দিয়েছিল নাটোয়াররা। গোম্‌তী ঝোলা খুলে চাপাটি-টাপাটি বার করে সবাইকে ভাগ করে দেয়।

লচ্ছু কিছুতেই খাবে না। জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'নেহীঁ—নেহীঁ—'

গোম্‌তী তাকে নিজের দিকে টেনে এনে বলে, 'খা বেটা—'

'নেহীঁ—'

'না খেলে কি চলে?'

লচ্ছু দুই হাঁটুর ভেতর মাথা ঢুকিয়ে নাড়তে থাকে।'

ফকিরা বলে, 'খা লে বেটা।' খতরনাক দুনিয়ার সঙ্গে বহোত লড়তে হবে। গায়ে তাকত না থাকলে চুর চুর হয়ে যাবি। দে বহু, ওকে খাইয়ে দে—'

গোম্‌তী সযত্নে চাপাটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে লচ্ছুকে খাইয়ে দিতে থাকে। লচ্ছু আর আপত্তি করে না।

খেতে খেতে ফকিরা ডাকে, 'এ লচ্ছু—'

লচ্ছু মুখ তুলে তার দিকে তাকায়।

ফকিরা বলে, 'গাঁওয়ে তো তুই আর তোর বাপু থাকতি। ওখানে তোদের আপনা আদমী আর কেউ নেই?'

'নেহীঁ। এক চাচা থাকে ঝরিয়া। আমি তার ঠিকানা জানি না।'

'ও তো বহোত দূর। তার ওপর আবার ঠিকানা জানিস না। বহোত মুসিবত কা বাত।'

গোম্‌তীরা বেশ অবাক হয়েই দু'জনের সওয়াল-জবাব শুনছিল। ফকিরা এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লচ্ছুর আত্মীয় স্বজনের খবর কেন নিচ্ছে, তারা বুঝতে পারছে না। নাটোয়ার জিজ্ঞেস করে, 'ওর রিস্তেদারদের দিয়ে কী হবে?'

ফকিরা বলে, 'গাধ্‌ধে কঁহাকা। আমরা তো আর এই মাঠে পড়ে থাকব না। লচ্ছুর একটা ব্যওস্থা না হলে কী করে ওকে ফেলে যাই?' লচ্ছুর দিকে ফিরে এবার জিজ্ঞেস করে, 'কাছাকাছি কোনো গাঁও কি টৌনে তোর আর কোনো রিস্তেদার নেই?'

লচ্ছু একটু চিন্তা করে জানায় দশ-বিশ মাইলের ভেতর তার নিজের বলতে কেউ নেই। ঝরিয়ার চাচা ছাড়া এক মৌসি থাকে আরাতে, আরেক মৌসি ছাপরায়। খুব ছেলেবেলায় লচ্ছুর মা যখন বেঁচে ছিল, সে তার সঙ্গে বার কয়েক দুই মাসির বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল। মা মরে যাবার পর তাদের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারেই চুকেবুকে গেছে।' আরা বা ছাপরার কোন মহল্লায় মৌসিরা থাকে, লচ্ছু বলতে পারবে না।

ফকিরা, নাটোয়ার এবং গোম্‌তীকে খুবই চিন্তিত দেখায়। ফকিরা বলে, 'লচ্ছুকে নিয়ে কী করা যায় বল, তো নাটুয়া? তুই কী বলিস বহু?'

এই প্রশ্নটার উত্তর নাটোয়ার বা গোম্‌তীর জানা নেই। তারা বিভ্রান্তের মতো তাকিয়ে থাকে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর কিছু ভাবতে ভাবতে ফকিরা বলে, 'এক কাজ করলে কেমন হয়?'

নাটোয়ার এবং গোম্‌তী উৎসুক মুখে বলে, 'কা চাচা?'

'এখন লচ্ছু আমাদের সঙ্গে চলুক। তারপর ভেবেচিন্তে একটা কিছু করা যাবে। মা-বাপ কেউ নেই বেচারার। কে দেখবে ওকে?' ফকিরার মধ্যে একটা খুবই স্পর্শকাতর স্নেহপ্রবণ মন আছে। হাজার অভাব-অনটনেও সেটাকে সে নষ্ট হতে দেয়নি।

নিজেদের যা হাল, তার ওপর আরো একজনের দায়িত্ব নেবার কথা ভাবতে

পারে না নাটোয়ারেরা। কিন্তু ফকিরাকে তারা যথেষ্ট সমীহ করে থাকে। বলে, 'ঠিক হ্যায়, তুমি যখন বলছ—'

কিছুক্ষণ পর খাওয়ার পালা চুকে যায়।

পশ্চিম আকাশে সূর্য আরো খানিকটা নিচে নেমে গেছে। এখন তার রং টকটকে লাল। রোদের চেহারাও আগের মতো নেই। মনে হয়, সারা আকাশের গায়ে কেউ যেন পিচকিরি দিয়ে রক্ত মাখিয়ে দিয়েছে। অনেক উঁচু দিয়ে আকাশের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে চলেছে পাখির ঝাঁক। এত নিচে, পৃথিবীর সমতল থেকে তাদের ছোট ছোট ফুটকির মতো মনে হয়। ওগুলো কী পাখি, কী তাদের নাম, কে জানে।

আশেপাশে কোথাও কোনো শব্দ নেই। স্তব্ধ, জনশূন্য, দিগন্তজোড়া মাঠের মাঝখানে চারটি মানুষ একটা নিভে-যাওয়া চিতার কাছাকাছি এখন চুপচাপ বসে আছে।

একসময় নাটোয়ার বলে, 'চাচা, এখানে বসে থেকে আর কী হবে? চল, এবার উঠে পড়ি। এখন হাঁটা শুরু করলে সন্ধের পর পর ঘাটানিয়া পৌঁছে যাব।'

ফকিরার উঠবার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। বরং সে শরীর ছড়িয়ে দিয়ে হাতের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ে।'

নাটোয়ার বেশ অবাক হয়ে ফকিরার শোওয়ার ভঙ্গিটা লক্ষ করে। তারপর বলে, 'কী চাচা, তোমার মতলবটা কী? যেভাবে লম্বা হয়ে শুলে, ঘাটানিয়ায় যাবার ইচ্ছে নেই, মনে হচ্ছে।'

ফকিরা বলে, 'আজ সন্ধের পর গিয়ে ফায়দা নেই। একেবারে কাল সকালে উঠেই যাব।'

'রাতটা এই মাঠের মাঝখানে কাটাবে নাকি?'

এমন বিস্ময়কর কথা আগে কখনও যেন শোনেনি ফকিরা। বলে, 'এর আগে কখনও মাঠেঘাটে শুসনি—কা রে নাটুয়া?' কবে কোথায় নানা শহরে এবং গঞ্জে ঠিকাদারদের কাছে কাজ করতে গিয়ে খোলা আকাশের তলায়, নদীর ধারে, বাঁধের গায়ে কিংবা রুক্ষ পড়তি জমিতে শুয়ে থেকেছে তার লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে যায় সে। তা ছাড়া সমস্ত দিন তাদের ওপর দিয়ে যা গেল, তাতে টানা একখানা ঘুম দরকার। ক্লান্ত শরীরে ধুঁকে ধুঁকে গিয়ে কাজের কাজ কিছু হবে না। একেবারে কাল সকালে নতুন শক্তি সঞ্চয় করে তারা ঘাটানিয়ায় যাবে।

নাটোয়ার বলে, 'ঠিক হ্যায় চাচা।' বলে ঘাসের ওপর সেও শুয়ে পড়ে।

॥ বারো ॥

নাটোয়াদের ঘুম যখন ভাঙে তখন, আর অন্ধকার নেই। চারিদিকে ভোরের আলো ফুটে বেরিয়েছে।

এই একটা রাতের মধ্যে দু দুটো ব্যাপার ঘটে গেছে। প্রথমত, কালকের দিনটা ছিল শুকনো খটখটে। আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার। কোথাও একফোঁটা মেঘ চোখে পড়েনি। কিন্তু রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে, বহুরূপী আকাশটা ভোল পালটে ফেলেছে। কখন যে ফের উত্তর পশ্চিম দিকে মেঘ জমতে শুরু করেছিল, টের পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয়ত, কাল দিনের বেলাটা বেশ ভালই ছিল ফকিরা। কিন্তু রাতে ঘুমের মধ্যে ফের তার জ্বর এসেছে।

নাটোয়ার, গোমতী আর লচ্ছু উঠে বসেছিল। কিন্তু ঘুম ভাঙলেও ফকিরা শুয়েই আছে। তার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল, মুখচোখ টসটস করছে, সারা গায়ে প্রচণ্ড ব্যথা।

নাটোয়ার বলে, 'চাচা, আর দেরি করো না, উঠে পড়। আকাশে আজ আবার মেঘ জমেছে। ছিঁটা উটা পড়ার আগেই ঘাটানিয়া পৌঁছুতে হবে।'

'হাঁ—' আস্তে আস্তে উঠে বসে ফকিরা।

নাটোয়ার প্রথমটা খেয়াল করেনি, এবার তার নজর ফকিরার মুখের পর এসে স্থির হয়। সে বলে, 'কী হয়েছে, তোমার তবিয়ত আচ্ছা নেই?'

'আবার জ্বরটা এসেছে রে নাটুয়া! কী ঝামেলায় যে পড়লাম! এই শালের বুখার আমাকে ছাড়বে বলে মনে হয় না।'

'কী করে যে তুমি ঘাটানিয়া যাবে!'

ফকিরা সামান্য হাসে, বলে, 'যেতেই হবে। এই মাঠের ভেতর তো আর পড়ে থাকা যাবে না।'

কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, চারটি মানুষ ফাঁকা প্রান্তরের ওপর দিয়ে বরাবর পুব দিকে এগিয়ে চলেছে। পেছনে সেই চিতাটা নিভে গেছে। উল্টোপাল্টা হাওয়ায় লচ্ছুর বাপের ভস্মীভূত শরীর ছাই হয়ে এখন চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

হাইওয়েটা এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। যে মাঠের ওপর দিয়ে তারা হাঁটছিল সেটা গিয়ে ঠেকেছে তারই গায়ে।

বড় সড়কের কাছাকাছি আসতে সেই চেনা সুরটা কোত্থেকে যেন ভেসে

আসতে থাকে, 'বোল রাধা বোল সঙ্গম হোগা কি নেহীঁ—'

চমকে নাটোয়াররা দেখতে পায়, দূরে রাস্তার বাঁক ঘুরে সামনে ব্যান্ড পার্টি আর পেছনে জুলুস নিয়ে ভারতমাতা রথ আসছে।

নতুন করে জ্বর আসার কারণে শরীর ভীষণ কাহিল লাগছিল ফকিরার। ভুরুর ওপর হাত রেখে রাস্তার বাঁকে একবার তাকায় সে। তারপর ব্যস্তভাবে বলে, 'নাটুয়া, জলদি জলদি সড়ক পার হয়ে ওধারে চল্। দুমরলাল দেখতে পেলে জান বিলকুল চৌপাট করে ছাড়বে। শালের চোখ মানুষের চোখ না—গিদ্ধড়ের চোখ।' রাস্তার ওপারেও মাঠ। সেই মাঠ ভেঙে মাইল দেড়েক গেলেই ঘাটানিয়া টাউন। ফকিরারা মাঠের রাস্তা ধরে সেখানে যাবে।

দুমরলালের চোখে পড়াটা যে মোটেই সুখকর হবে না, সেটা নাটোয়ার এবং গোম্‌তীও জানে। লচ্ছুকে সঙ্গে করে তারা দ্রুত হাইওয়ে পার হয়ে ওপারে চলে যায়। খানিকটা যাবার পর ফকিরার চোখের সামনে গোটা পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়, টলতে টলতে সে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে।

এক লাফে নাটোয়ার ফকিরার কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে তার মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে ডাকতে থাকে, 'চাচা—চাচা—চাচা—'

লচ্ছু আর গোম্‌তীও ছুটে এসে ফকিরাকে ডাকাডাকি করতে থাকে। অনেকক্ষণ পর চোখ মেলে তাকায় ফকিরা। দুর্বল গলায় বলে, 'আমি আর পারব না রে নাটুয়া। তোদের ঝঞ্ঝাট বাড়িয়ে ফায়দা নেই।'

ফকিরার জীবনীশক্তি যে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তা আগেই টের পেয়েছিল নাটোয়াররা। শুধু মনের জোরে সে এতটা রাস্তা পাড়ি দিয়েছে। তবু নাটোয়ার বলে 'সচমুচ পারবে না?'

'নেহীঁ। যতক্ষণ পেরেছি হেঁটেছি, আর তাকত নেই।'

'লেকেন—'

'তুই তোর চাচী আর আমিনার কথা ভাবছিস তো?'

'হাঁ। দো-চারগো রুপাইয়া না নিয়ে গেলে—'

আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে ফকিরা বলে, 'উপরবালা দেখেছে, আমি চেষ্টা করেছি। লেকেন এরপর আর কিছু করার নেই। এখন তার মর্জি হলে বিবি আর বাচ্চাটা বাঁচবে। না হলে মৌত—' বলে বিষণ্ণ হাসে সে।

মুখ নিচু করে নাটোয়ার জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি ঘরে ফিরে যাবে?'

'হাঁ।'

'তা হলে চল হাইওয়েতে গিয়ে তোমাকে ট্রাকবালাদের গাড়িতে তুলে

দিই।'

'থোড়া সবুর। আগে তারানাথজিদের রথ বেরিয়ে যাক।'

নাটোয়াররা যেখানে বসে আছে সেখান থেকে হাইওয়ে বেশি দূরে নয়। তারানাথজিদের রথ বাঁক ঘুরে অনেক এগিয়ে এসেছে। নাটোয়ার বুঝতে পারে, হাইওয়ের ধারে গিয়ে এখন দাঁড়ালে দুমরলালদের চোখে পড়বার সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই আপাতত এখান থেকে নড়াচড়া না করাই ভাল।

একসময় ভারতমাতা রথ হিন্দি ফিল্মের সুর বাজাতে বাজাতে সামনে দিয়ে চলে যায়। তারপর ফকিরাকে ধরে ধরে হাইওয়েতে নিয়ে আসে নাটোয়ারেরা।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর একটা দুটো করে ট্রাক আসতে থাকে। রাস্তার মাঝখানে গিয়ে হাত তুলে তাদের থামায় নাটোয়াররা। কিন্তু ড্রাইভারেরা কেউ ফকিরাকে গাড়িতে তুলতে রাজি হয় না। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে তারা হুমকে ওঠে, 'যা শালে, ভাগ—'

অগত্যা ধারে সরে গিয়ে লরিগুলোকে যাবার জায়গা করে দিতে হয় নাটোয়ারদের।

শেষ পর্যন্ত এক শিখ ট্রাকওলার কিঞ্চিৎ করুণাই হয়। এই সকাল বেলাতেই প্রচুর মদ গিলেছে সে, মুখ থেকে ভক ভক করে গন্ধ বেরুচ্ছে। চোখদুটো ঢুলু ঢুলু এবং আরক্ত। জানালা দিয়ে মুখ বার করে জড়ানো গলায় সে বলে, 'ক্যা রে, টেরাক (ট্রাক) রুখ দিয়া কিঁউ?'

নাটোয়ার হাতজোড় করে আর্জিটি পেশ করে।

সব শুনে ফকিরার দিকে তাকিয়ে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করে, 'ক্যা চাচা, সচমুচ তুমহারা বুখার হুয়া তো? ধোঁকা দেনেসে লাথ মার কর টেরাকসে ধকেল দুঙ্গা—' নেশায় সে এতই চুর, ফকিরা এখনও যে লরিতে ওঠেনি, সেটাই তার খেয়াল নেই।

'হাঁ হাঁ জরুর বুখার—'একরকম টেনেহিঁচড়ে ফকিরাকে ড্রাইভারের কাছে নিয়ে আসে নাটোয়ার, 'দেখিয়ে দেখিয়ে, এর গা কেমন গরম হয়ে উঠেছে—বিলকুল আগ য়্যায়সা।'

প্রচণ্ড মাতাল হলেও ড্রাইভার বুঝতে পারে, নাটোয়ারেরা মিথ্যে বলছে না। সে বলে, 'ঠিক হ্যায়, চাচাকে গাড়িতে তুলে দে—'

সযত্নে হাত ধরে ফকিরাকে ট্রাকে ওঠাতে ওঠাতে নাটোয়ার বলে, 'হোঁশিয়ার চাচা। গাড়ি থেকে নেমে আস্তে আস্তে ঘরে চলে যেও। দো-চার রোজ পর

আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব।'

'ঠিক হ্যায়।'

ফকিরাকে নিয়ে ট্রাক চলে যায়। বেঁচে থাকার জন্য যে বিপুল অভিযানে নাটোয়ারা বেরিয়ে পড়েছিল সেটা শেষ হবার আগেই তাদের এক প্রাচীন যোদ্ধাকে বিদায় নিতে হল।

বাঁকের মুখ ঘুরে যতক্ষণ না ট্রাকটা অদৃশ্য হয়, নাটোয়াররা বিষণ্ণ চোখে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর মাঠের দিকে ফিরে আবার হাঁটতে শুরু করে।

দুপুরের ঢের আগেই ওরা তিনজন ঘাটানিয়া টাউনে পৌঁছে যায়।

॥ তেরো ॥

ঘাটানিয়া উত্তর বিহারের আর পাঁচটা মফস্বল শহরের মতোই। নোংরা, দুর্গন্ধে ভরা, ঘিঞ্জি, ধুলো এবং মশামাছিতে থিকথিকে। এই সব শহর যেন একই ছাঁচ থেকে ঢালাই হয়ে বেরিয়ে এসেছে।

ঘাটানিয়ার মাঝামাঝি জায়গায় ঠিকাদার টহলরাম সহায়ের পুরনো ধাঁচের তেতলা বাড়ি। সামনের দিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তার একদিকে বিশাল খাটালে কম করে বিশ তিরিশটা গরু এবং মোষ রয়েছে। সেখান থেকেই সর্বক্ষণ নতুন এবং বাসি গোবরের উৎকট গন্ধ উঠে আসে। আরেক দিকে অ্যাসবেস্টসের ছাউনির তলায় থাকে তিন চারটে জিপ আর লরি। এগুলো বারোমাস টহলরামের কারবারে খাটে। গাড়ির শেড আর খাটাল বাদ দিয়ে যে জায়গাটুকু রয়েছে সেখানে আট-দশটা চারপায়া পাতা। টহলরাম যখন ঘাটানিয়াতে থাকে, বর্ষাকাল আর গ্রীষ্মের দুপুরটা ছাড়া প্রায় সারাদিনই এই চারপায়াগুলোর একটায় গা এলিয়ে রাখে। এটাই তার হেড অফিস। এখানে বসে বা শুয়ে সে তার ঠিকাদারি কারবার চালিয়ে থাকে।

টহলরামের মুক্তাঙ্গন অফিসের পেছন দিকে মূল বাড়িটা। সেটার জবরদস্ত চেহারা। আগাগোড়া চুনসুরকির গাঁথনিতে ষাট ইঞ্চি পুরু দেওয়াল। বাড়ির তুলনায় দরজা জানালা ছোট ছোট। গোটা বাড়িটার দেওয়ালে পবনপুত্র হনুমানের নানা কীর্তির ছবি আঁকা রয়েছে। মোটা দাগের ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া সব চিত্রকর্ম। এখানকারই একজন সাইন বোর্ড লিখিয়েকে দিয়ে ওগুলো আঁকানো হয়েছে। এর চেয়ে উৎকৃষ্ট শিল্প তার কাছে আশা করা অন্যায়।

বাড়িটার আগাপাশতলা লক্ষ করলে বোঝা যাবে, টহলরাম রামভক্ত

হনুমানজির একনিষ্ঠ সেবক।

ঘাটানিয়া শহরে ঢুকে কোনোদিকে তাকায় না নাটোয়ারেরা, সোজা টহলরামের বাড়ির কাছে চলে আসে। গোমতী আর লক্ষ্মুকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতরে ঢুকে পড়ে নাটোয়ার।

টহলরাম উঁচু জাতের কায়স্থ হলেও জাতপাত নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। কেননা ঠিকাদারি কাজে যে সব মজুর দরকার তাদের বেশির ভাগই জল-অচল অচ্ছুৎ। ছুয়াছুতের কড়াকড়ি নিয়ে থাকলে তার চলে না। যে সব জায়গায় টহলরামের কাজ চলছে সেখানে তো বটেই, বাড়িতেও তারা যখন তখন ঢুকে পড়ে।

খাটালে ক'টা নৌকর গরু এবং মোষেদের জন্য জাবনা তৈরি করছিল, কেউ কেউ প্রাণীগুলোকে স্নান করিয়ে দিচ্ছিল। উল্টোদিকের শেডের তলায় একটা গাড়িও নেই, খুব সম্ভব কাজে বেরিয়ে গেছে।

চারপায়াগুলো ফাঁকা। টহলরাম সহায়কে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। এধারে ওধারে তাকাতে থাকে নাটোয়ার।

মূল বাড়িটার একতলার ঢালা বারান্দার কোণে নিচু কাঠের ডেস্কের সামনে বসে মোটা রোকড় খাতায় ঘাড় গুঁজে কী যেন লিখছিল মদনলালজি। বয়স হলেও বেতের মতো পাতলা হিলহিলে চেহারা তার। পরনে ধুতির ওপর হাফ-হাতা ফতুয়া, নিকেলের গোল চশমা নাকের ডগায় ঝুলে রয়েছে।

মদনলাল টহলরাম সহায়ের ঠিকাদারি কারবারের যাবতীয় হিসেবপত্তর রেখে থাকে। যখনই আসা যাক, দেখা যাবে সে কলম বাগিয়ে ঐ মোটা খাতার ওপর ঝুঁকে রয়েছে। মদনলাল নিজেকে বলে টহলরামজির 'মানিজার' অর্থাৎ ম্যানেজার। লোকটার দশজোড়া চোখ। হিসেব কষতে কষতেই সে নাটোয়ারকে দেখতে পেয়েছিল। মুখ না তুলেই বলে, 'কা রে নাটুয়া—তুই।' টহলরামজির কাছে যত মজুর কাজ করে তাদের প্রায় সবাইকেই চেনে সে। একবার যাকে দেখে, সহজে ভোলে না মদনলাল।

পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে যায় নাটোয়ার। হাতজোড় করে বলে, 'হাঁ মানিজারজি—'

আস্তে আস্তে এবার চোখ তোলে মদনলাল, 'অচানক ? কী মনে করে ?'

'অনেকদিন আসতে পারিনি। ভাবলাম একবার আপনাদের সঙ্গে দেখা করে যাই।'

'ভালই করেছিস। কোনো দরকার আছে?'

'একটু চুপ করে থাকে নাটোয়ার। তারপর বলে, 'কাম ধান্দার জন্যে এসেছিলাম। বহোত রোজ আপনাদের কাছে কাজ করি নি। ভাবলাম যদি কিরপা করে কিছু দেন—'

মদনলাল বলে, 'তিন চার দিন আগে যদি আসতিস, একটা কাজ জরুর মিলত। লেকেন সব মজুর জোগাড় করে সাইটে সাইটে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন আর লোকের জরুরত নেই।' একটু থেমে বলে, 'মাঝে মধ্যে দেখা তো করে যাবি। কখন লোকের দরকার হয়ে যায়—'

'মাঝখানে ক'মাস খুব ভুগলাম, তাই আসতে পারিনি। এবার থেকে পন্দ্র বিশ রোজ পর পর এসে খবর নিয়ে যাব। লেকেন—'

'কা রে?'

খানিক ইতস্তত করে নাটোয়ার বলে, 'কিরপা করে আজ কিছু একটা ব্যওস্থা করে দিতেই হবে মানিজারজি। আপনি ইচ্ছা করলেই হবে।'

মদনলাল বলে, 'নেহীঁ নেহীঁ, আমার ইচ্ছায় কিছু হবে না। তুই বরং এক কাজ কর—'

'কা?'

'সিধা যোগবাণী চলে যা।'

'সেখানে কী?'

'সড়ক বানাবার ঠিকা নিয়েছি আমরা। টহলরামজি ওখানে কাজের তদারক করতে গেছেন। আজই গিয়ে ওঁকে ধর। তোকে ওঁর খুব পছন্দ। জরুর কিছু একটা হয়ে যাবে। হাঁ, আউর এক বাত, টহলরামজি ওখানে বেশিদিন থাকবেন না, কাল রাতে কি পরশু সুবে পালামৌ যাবেন। তার আগেই গিয়ে ধরা চাই।'

যোগবাণী এখান থেকে একদিনের পথ। খানিকটা হেঁটে, খানিকটা ট্রেনে এবং খানিকটা বাসে যেতে হয়। যাবে যে, পকেটে ফুটো কড়িও নেই। তা ছাড়া সে একা নয়, সঙ্গে গোমতী আর লচ্ছুও রয়েছে। এতগুলো লোকের ভাড়া জুটবে কোত্থেকে? তা ছাড়া যোগবাণীতে গিয়ে পৌঁছুলেই যে টহলরামজির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে এমন নিশ্চয়তা নেই। এদিকে ট্রেন বা বাসের মর্জির ওপর ভরসা রাখা যায় না। কখন আসে কখন যায় তার ঠিকঠিকানা নেই।'

মদনলাল নাটোয়ারকে লক্ষ করছিল। সে বলে, 'কী ভাবছিস নাটুয়া? যা

বললাম তাই কর—'

নাটোয়ার কাঁচুমাচু মুখে বলে, 'মানিজারজি, এখন আমি যোগবাণী যেতে পারছি না। আপনি যদি আরেকটু কিরপা করেন—'

'কী?'

নাটোয়ার জানায়, তার হাতে একটা পয়সাও নেই। যদি আগাম পঞ্চাশ ষাটটা টাকা মদনলাল দেয়, দু চার মাসের মধ্যে গায়ে খেটে শোধ করে দেবে। সে একটা পয়সা মারবে না, তার জবানের ওপর মদনলালজি বিশ্বাস রাখতে পারে।

মদনলাল লোকটা ভালই। সহৃদয়ভাবেই বলে, 'তোর ওপর আমার বিশ্বাস আছে নাটুয়া। তুই আগে তো কতবার নিয়ে গেছিস। লেকেন ছে আট মাহিনা হল, টহলরামজি আগাম রুপাইয়া দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন।'

নাটোয়ার চমকে ওঠে, 'বহোত আশা করে এসেছিলাম মানিজারজি। হাত বিলকুল খালি। আপনি দয়া না করলে সিরিফ মরে যাব।'

'তোর হাল বুঝতে পারছি, লেকেন আমার হাত-পা বাঁধা। টহলরামজির হুকুম না পেলে কিছুই করতে পারব না।'

গভীর হতাশায় মনটা ভরে যায় নাটোয়ারের। সে বলে, 'তা হলে আর কী করব? যাই মানিজারজি—'

'ঠিক হ্যায়। আবার আসিস।' বলে ফের রোকড় খাতায় নাক গুঁজে দেয় মদনলাল।

অগত্যা রাস্তায় বেরিয়ে আসে নাটোয়ার।

বাইরে দমবন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে গোমতী, তার পাশে লচ্ছু।

গোমতী জিজ্ঞেস করে, 'কিছু হল?'

মাথাটা ডাইনে থেকে বাঁয়ে বার দুই নাড়িয়ে বিমর্ষ মুখে নাটোয়ার বলে, 'কুছ নেহীঁ। চল—'

ঘাটানিয়া শহরের খোয়া-ওঠা রাস্তার ওপর দিয়ে তিনটি মানুষ লক্ষ্যহীনের মতো হাঁটতে থাকে। চলতে চলতে মদনলালের সঙ্গে তার যা যা কথা হয়েছে সব গোমতীকে জানিয়ে দেয় নাটোয়ার।

গোমতী জিজ্ঞেস করে, 'এখন তা হলে কী হবে?' তার চোখেমুখে ঘোর উৎকণ্ঠা ফুটে বেরোয়।

নাটোয়ারকে খুবই অস্থির দেখায়। সে বলে, 'বুঝতে পারছি না। বহোত ভরোসা ছিল টহলরামজির ওপর। কার মুহূ দেখে যে এবার বেরিয়েছিলাম।

কপালটাই খারাপ।'

লচ্ছু কিছু বলে না। বাপকে হারানোর দুঃখে কাল এত কেঁদেছিল যে তার চোখমুখ এখনও ফুলে আছে। কী খাবে, কোথায় থাকবে, কে আশ্রয় দেবে—কাল এ সব নিয়ে ভাবার মতো মনের অবস্থা ছিল না তার। কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে আজ সে বেশ চিন্তিত। নাটোয়ার এবং গোম্‌তী যে কাজ আর খাদ্যের খোঁজে বেরিয়েছে তা জেনে গেছে লচ্ছু। যারা নিজেরাই পেটের দানা জোটাতে নাস্তানাবুদ হয়ে যাচ্ছে তাদের পক্ষে তার দায় কতদিন নেওয়া সম্ভব হবে, কে জানে। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মাঝে মাঝে একবার নাটোয়ার, আরেক বার গোম্‌তীকে দেখতে থাকে সে। এরা তাকে তাড়িয়ে দিলে কোথায় যাবে, কী করবে, ভাবতেও সাহস হয় না লচ্ছুর।

গোম্‌তী জিজ্ঞেস করে, 'এখন কোথায় যাবে?'

নাটোয়ার জানায়, আপাতত যাওয়ার নির্দিষ্ট কোনো জায়গা নেই। টহলরাম সহায়ের কোঠি থেকে বেরুবার পর প্রায় ভেঙেই পড়েছিল সে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তার আত্মবিশ্বাস ফিরে আসতে শুরু করেছে। সে বলে, 'হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। পাইসা কামাইয়ের একটা ব্যওস্থা করতেই হবে।'

'তার আগে—' বলতে বলতে থেমে যায় গোম্‌তী।

'তার আগে কী?'

'কুছ খানা উনার ব্যওস্থা না করলে—'

এই কথাটা নাটোয়ারের মাথাতেও আবছাভাবে কিছুক্ষণ ধরে ঘুরছে। কাল সেই বিকেলে লচ্ছুর বাপের চিতার কাছে বসে তারা শেষ খেয়েছিল। এখন দুপুর পেরুতে চলেছে, পেটের ভেতর আগুন জ্বলছে। ভাত হোক, চাপাটি হোক, ছাতু হোক, লিট্টি হোক—কিছু জোগাড় করতে না পারলে আর হাঁটা যাচ্ছে না। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে নাটোয়ার। বলে, 'হাঁ, দেখি কী করা যায়—'

লচ্ছুকে দেখিয়ে গোম্‌তী বলে, 'ভুখে ছৌরাটার মুখ শুকিয়ে গেছে।'

'হাঁ।'

খাবারের ব্যবস্থা তো করবে কিন্তু কিভাবে কোত্থেকে—সেটাই মাথায় আসছে না নাটোয়াররা। চিন্তাগ্রস্তের মতো গোম্‌তীদের সঙ্গে নিয়ে সে হাঁটতে থাকে।

অনেকটা চলার পর হঠাৎ নাটোয়াররা শুনতে পায় কোথায় যেন মাইকে

ভারী গলার মন্ত্রপাঠ হচ্ছে। আগে পেটের চিন্তাতেই এমন মগ্ন হয়ে ছিল যে কোনোদিকে ভাল করে তাকায় নি। এখন সে দেখতে পায়, কাতারে কাতারে মানুষ তাদের পেছনে ফেলে লম্বা লম্বা পায়ে সামনের দিকে চলেছে। ঘাটানিয়া শহরের এই সব লোকজনের চোখেমুখে প্রচণ্ড ঔৎসুক্য এবং উত্তেজনা। চাঞ্চল্যকর কোনো ব্যাপার যেন তাদের তাড়িয়ে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

নাটোয়ার কিছুটা কৌতূহল বোধ করে। দু চার জনকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করে করে জানতে পারা যায়, এখানকার নয়া মহল্লার মাঠে বিশাল যজ্ঞের আয়োজন হয়েছে। তাই দেখতে এত মানুষ দল বেঁধে চলেছে। কী কারণে এই যজ্ঞ? এ প্রশ্নর উত্তরটা অবশ্য কেউ দিতে পারে না।

একটা লোক বলে, 'আমাদের সঙ্গে চল না। গেলেই নিজের চোখে সব দেখতে পাবে।'

এবার সবচেয়ে জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা করে নাটোয়ার, 'ভেইয়া, তুমি কি জানো, ওখানে ভোজনের ব্যওস্থা আছে কিনা?'

লোকটা এমন উদ্ভট কথা আগে আর বোধহয় কখনও শোনেনি। নাটোয়ারকে একটি উৎকৃষ্ট উজবুক ঠাউরে নিয়ে বলে, 'আরে বাবা, এত্তে বড় পূজা যজ্ঞ হচ্ছে আর সেখানে ভোজন উজন হবে না—তাই কখনও হ'তে পারে? এত্তে এত্তে আদমী তা হলে যাচ্ছে কী জন্যে?'

নাটোয়াররা লোকটার সঙ্গ ছাড়ে না। অত মূল্যবান খবর যে দিয়েছে তাকে সহজে ছাড়া যায় না। তার গায়ে আঠার মতো জুড়ে থেকে নাটোয়াররা তিনজন জোরে জোরে পা চালাতে থাকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে নয়া মহল্লায় পৌঁছে একেবারে হাঁ হয়ে যায়।

এখানে বড় একটা মাঠে বিশাল মণ্ডপ বানিয়ে তার ভেতর যজ্ঞের আয়োজন চলছে। গেরুয়া-পরা আট-দশজন সাধু ইট-বাঁধানো বিরাট চৌকো যজ্ঞকুণ্ড ঘিরে বসে আছে। তাদের সবারই কপালে, গালে, গলায়, কানের লতিতে এবং বাহুমূলে রক্তচন্দনের তিলক।

সাধুদের পাশে চন্দনকাঠের পাহাড়, কয়েক টিন খাঁটি ঘি, ফুল, বেলপাতা এবং যজ্ঞের অন্যান্য উপকরণ। দু'জন সাধু আগুনে অনবরত লম্বা পেতলের কুশিতে করে ঘি ঢালছে, দু'জন সাজিয়ে দিচ্ছে কাঠ। বাকি ক'জন ভক্তিভরে একনাগাড়ে মাইকে মন্ত্রপাঠ ক'রে চলেছে। তাদের গমগমে ভারী কণ্ঠস্বর বহুদূর পর্যন্ত বায়ুস্তরে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ... ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহা তিষ্ঠ ইহ সন্নি ধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু...'

আরো পনের বিশজন সাধুকে ব্যস্তভাবে ছোটাছুটি করতে দেখা যাচ্ছে। যজ্ঞ ঘিরে অনেক কাজকর্ম থাকে। তারা সেসব তদারক করে বেড়াচ্ছে।

যজ্ঞকুণ্ডের পেছন দিকে মখমলে মোড়া উঁচু ফরাসের ওপর চোখ বুঁজে প্রায় সমাধিস্থ অবস্থায় পদ্মাসনে বসে আছেন বিপুল চেহারার একজন সন্ন্যাসী। সারা মুখ লম্বা পাকা দাড়িতে আচ্ছন্ন, মাথা থেকে বটের ঝুরির মতো মোটা জটা কোমর ছাপিয়ে নেমে এসেছে। এখানকার এই যজ্ঞের তিনিই যে মূল উদ্যোক্তা এবং অন্য সাধুরা তাঁর শিষ্য প্রশিষ্য সেটা দেখামাত্রই টের পাওয়া যায়।

মণ্ডপের সামনের দিকে চট পেতে ভক্তদের বসার ব্যবস্থা। ঘাটানিয়া টাউনের অগুণতি মানুষ সেখানে হাতজোড় করে বসে আছে। ভিড় এতই বেশি যে সবার বসার জায়গা হয়নি, বেশির ভাগই পেছন দিকে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে আছে। পোড়া ঘি এবং চন্দনকাঠের গন্ধে বায়ুস্তর ম ম করছে। মাঝে মাঝে মন্ত্রপাঠ থামিয়ে একজন সাধু গম্ভীর গলায় ঘোষণা করছে, 'সারা ভারত জুড়ে আজ ভ্রষ্টাচার, অন্যায় আর মহাপাপ চলছে। ঘোর অধর্মে কলিকাল পূর্ণ। দেশকে রক্ষা করতে, মানুষকে ভ্রষ্টাচার আর পাপ থেকে মুক্ত করতে শ্রীশ্রী ভগবান বিশ্বানন্দজি মহারাজ এই যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। আপনারা দলে দলে যোগ দিয়ে এই শুদ্ধিযজ্ঞকে সার্থক করে তুলুন। ভগবান বিশ্বানন্দজি মহারাজের আশীর্বাদ নিয়ে মনুষ্যজন্ম সার্থক করুন। যজ্ঞের কাজে আপনাদের সবাইকে দরকার। কে কী করবেন সে জন্য প্রাণানন্দ মহারাজের সঙ্গে দেখা করুন।'

ভাসাভাসাভাবে যজ্ঞানুষ্ঠানের কারণটা শোনে নাটোয়ার। খুব সামান্যই বোঝে, বেশির ভাগই তার বোধগম্য হয় না। যজ্ঞ, বিশ্বানন্দ মহারাজের আশীর্বাদ এবং ভারতবর্ষের শুদ্ধি আর পাপমুক্তির চেয়ে চাপাটি বা ভাত তাদের কাছে অনেক বেশি জরুরি। এই মুহূর্তে প্রাণানন্দ মহারাজকে তাদের খুঁজে বার করতেই হবে। যজ্ঞের কাজকর্ম করলে মজুরি হিসেবে নিশ্চয়ই পয়সা বা খাবার কিছু একটা মিলবে।

কিন্তু এত সাধুসন্ন্যাসীর মধ্যে প্রাণানন্দ মহারাজ কোন জন, কে জানে। নাটোয়ার ভিড়ের লোকজনদের অনেককে জিজ্ঞেস করল, তারা প্রাণানন্দকে চেনে কিনা।

প্রত্যেকেই ঘাড় হেলিয়ে বলে, 'নেহী—'

একটি চালাক চতুর গোছের লোক জানায়, এই সাধু সন্ন্যাসীরা ঘাটানিয়া টাউনের বাসিন্দা নয়, দিন দুইয়েক হল, যজ্ঞ উপলক্ষে এখানে এসেছে। যজ্ঞ শেষ হলেই এখান থেকে চলে যাবে। সে আরো জানায়, ঘাটানিয়ার পয়সাওলা বড় বড় লোকেরা যাগযজ্ঞ এবং পুজোর যাবতীয় খরচ দিচ্ছে।

কাদের পয়সায় এই বিরাট ব্যাপার চলছে তা নিয়ে আদৌ মাথাব্যথা নেই নাটোয়ারের। শুধু প্রাণানন্দ মহারাজকে তার দরকার। সে জানতে চায়, প্রাণানন্দের খোঁজ কে দিতে পারে।

লোকটা বলে, 'আরে ভেইয়া, আমার কাছে পুছতাছ না করে এক সাধু মহারাজকে ধর না ; সে ঠিক বলে দেবে।'

এই সামান্য ব্যাপারটা আগেই মাথায় আসা উচিত ছিল নাটোয়ারের। সে বলে, 'ঠিক বাত ভেইয়া।' বলে গোমতী আর লচ্ছুকে একধারে দাঁড়াতে বলে প্যান্ডেলের আরেক মাথায় এক যুবক সাধুর কাছে চলে আসে। হাতজোড় করে বলে, 'প্রাণানন্দ মহারাজজির সঙ্গে দেখা করব, লেকেন তাঁকে চিনি না—'

মণ্ডপের ওধারে চট দিয়ে অনেকটা জায়গা ঘিরে কিছু একটা হচ্ছে। সেখানে বেশ কিছু লোকজন, ব্যস্তভাবে নানা ধরনের মালপত্র বয়ে নিয়ে আসছে। একটা চেয়ারে বসে ভারী চেহারার মাঝবয়সী এক সাধু হাত নেড়ে নেড়ে তাদের কী যেন বলে যাচ্ছে ; দূর থেকে তার কথার একটি বর্ণও বোঝা যায় না।

যুবক সাধু আধবুড়ো সাধুকে দেখিয়ে 'উনি প্রাণানন্দজি' বলে চলে যায়। আর পায়ে পায়ে প্রাণানন্দের কাছে এগিয়ে আসে নাটোয়ার। হাতজোড় করেই ছিল সে। সসম্ভ্রমে ডাকে, 'মহারাজজি—'

প্রাণানন্দের চুল দাড়ি কাঁচায় পাকায় মেশানো, তবে জটা নেই। সারা মুখে গম্ভীর স্নেহময় হাসি মাখানো। নাটোয়ারের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কহো—'

কী উদ্দেশ্যে এসেছে সেটি জানিয়ে দেয় নাটোয়ার।

প্রাণানন্দের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, 'এই তো চাই। নিজের থেকে পবিত্র যজ্ঞের কাজ করতে এসেছ। বড় আনন্দের কথা। সবাই যদি তোমার মতো ধর্মাত্মা হ'ত, দুনিয়াটাই বদলে যেত। বেটা তোমার পরকাল বহোত আচ্ছা।'

সাধু মহারাজের এ জাতীয় ভাল ভাল কথায় নাটোয়ার খানিকটা অভিভূতই হয়ে পড়ে। তবে তার মাথাটা যথেষ্টই সাফ। পরকালের চাইতে ইহকাল

সম্পর্কেই সে ঢের বেশি চিন্তিত। বলে, 'মহারাজজি, আমার সঙ্গে আরো দু'জন আছে— একগো আওরত আউর একগো লেড়কা। ওরাও কাজ করতে চায়।'

প্রাণানন্দ খুবই খুশি হন। বলেন, 'ঠিক হ্যায়। ওরা কোথায়?'

মণ্ডপের দিকে আঙুল বাড়িয়ে নাটোয়ার বলে, 'ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।'

'ওদের নিয়ে এসো—'

কথা বলতে বলতে সে টের পাচ্ছিল, কোত্থেকে যেন পুরী ভাজার গন্ধ আসছে। মণ্ডপের দিকে যেতে যেতে সে এক ঝলক দেখতে পায়, চটের ঘেরা জায়গায় বড় বড় কড়াইতে রসুইকেরেরা কেউ পুরী ভাজছে, কেউ তরকারি চাপিয়ে লম্বা লম্বা হাতা দিয়ে নাড়ছে। এক পাশে চৌকো চৌকো কাঠের বারকোষে খাঁটি ঘিয়ে তৈরি গুলাবজামুন, বুন্দিয়া, বালুসাই আর কলাকন্দ থরে থরে সাজানো। দেখতে দেখতে পেটের ভেতরকার খিদেটা চনচনিয়ে ওঠে। সম্ভাব্য একটি ভোজের স্বপ্নে তার ঝিমিয়ে পড়া শরীরে যেন বিজলি খেলে যেতে থাকে।

এক দৌড়ে গোমতী এবং লচ্ছুকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে নাটোয়ার। বলে, 'মহারাজজি, কিরপা করে এবার কাজ দিন।'

চটের অস্থায়ী রসুই ঘরের গায়ে লোহার বিরাট বিরাট দশ বারোটা জালা এবং চার পাঁচটা প্লাস্টিকের বালতি রয়েছে। খানিক দূরে টাল দিয়ে রাখা হয়েছে মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি। দুটো লোক বালতি করে দূরের টিউবওয়েল থেকে জল বয়ে এনে লোহার জালায় ঢেলে রাখছে। তিনটে লোক কুড়োল দিয়ে গাছের গুঁড়ি ফেঁড়ে ফেঁড়ে উনুনে জ্বালাবার জন্য লকড়ি বানাচ্ছে।

প্রাণানন্দ নাটোয়ারদের কাজ ভাগ করে দেয়। গোমতী এবং লচ্ছু জল এনে চারটে জালা বোঝাই করবে; নাটোয়ার দুটো কাঠের গুঁড়ি চিরবে।

একমুহূর্ত দেরি না করে কাজ শুরু করে দেয় নাটোয়াররা।

ঘণ্টা দুই বাদে সূর্য যখন পশ্চিমে ঢলে পড়েছে, সেই সময় নাটোয়াররা প্রাণানন্দের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। জল টেনে আর কাঠ চিরে তিনজনের জিভ বেরিয়ে পড়েছে। ঘামে জামাকাপড় ভিজে সপসপে হয়ে গেছে।

নাটোয়ার বলে, 'কাম পুরা হো গিয়া মহারাজজি—'

প্রাণানন্দ ঘাড় ফিরিয়ে পরখ করে নেয়। সত্যিসত্যিই দুটো বড় গাছের গুঁড়ি

চেরাই হয়ে গেছে এবং চারটে জালাও জলে ভরে ফেলা হয়েছে। খুবই সন্তুষ্ট হয়ে সে বলে, 'বহোত আচ্ছা। ভগোয়ান বিশ্বানন্দজিকে তোমাদের কথা বলব। জরুর তিনি তোমাদের আশীর্বাদ করবেন। অনেক খাটাখাটনি করেছ। যাও, মণ্ডপে গিয়ে যজ্ঞ দেখ—'

নাটোয়াররা তক্ষুনি চলে যায় না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রাণানন্দ তিনজনকে বারকয়েক লক্ষ করেন, তারপর বলেন, 'কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ মহারাজজি, যদি গুস্সা না করেন—'

'না না, গুস্সা করব কেন? যা বলতে চাও, বল—'

ঢোক গিলে নাটোয়ার বলে, 'আপকে কিরপাসে মজুরি মিল যায় তো, হামনিলোগ বঁচ যায়েগা—'

প্রাণানন্দের দুই চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, শিরদাঁড়া খাড়া করে সোজা হয়ে বসে সে। করাত চালানোর মতো কর্কশ গলায় বলে, 'কী বললে? মজুরি?'

স্নেহপ্রবণ যে লোকটার কণ্ঠস্বর থেকে এতক্ষণ মধু ঝরছিল, আচমকা সেটা এত দ্রুত বদলে যেতে দেখে চমকে ওঠে নাটোয়ার, রীতিমত ভয়ও পেয়ে যায়। দু'পা পিছিয়ে নিয়ে বলে, 'আমরা বহোত গরীব আদমী—'

তার কথা যেন শুনতে পাচ্ছিল না প্রাণানন্দ। গলা চড়িয়ে সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকে, 'ভগোয়ানের কাজ করে পয়সা চাইছে! পাপী, ভ্রষ্টাচারী কাঁহিকা—'

নাটোয়ার এবার ভীষণ ঘাবড়ে যায়। বলে, 'মহারাজজি, কাল দুফার থেকে আমরা কিছু খাইনি। পইসা না পাই, কমসে কম ভাত চাপাটি যদি কিছু দেন—'

'আজ থেকে পুরা তিন রোজ এখানে যজ্ঞ হবে। চার দিনের দিন যে আসবে তাকেই 'ভোজন' করানো হবে। তখন চলে এসো, যত পার খেয়ে যেও। আভি ভাগো—'

আর কিছু বলতে সাহস হয় না নাটোয়ারের। খালি পেটে এতক্ষণ 'গতরচূরণ' খাটার পর সাধু মহারাজের কাছ থেকে যে পুরস্কারটি পাওয়া গেল তাতে মাথায় আগুন ধরে যায় তার। গোমতীদের নিয়ে আর মণ্ডপের দিকে যায় না, রসুইঘরের পেছনে যে ফাঁকা জায়গাটা রয়েছে সেখানে গিয়ে বসে পড়ে। অসহ্য রাগে ক্ষোভে হিতাহিতজ্ঞানশূন্যের মতো গলার শির ছিঁড়ে চেঁচাতে থাকে, 'শালে সাধু মহারাজ! ধোঁকেবাজ, ভূচ্চর—' তার মুখ থেকে তোড়ে অকথ্য গালাগালি বেরিয়ে আসতে থাকে।

গোমতী সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে হাত নাড়তে নাড়তে বলে, 'গালি মাত্ দোঁ। ও লোগ শুনেগা তো হাল খারাপ কর দেগা—'

গোমতীর হুঁশিয়ারিতে খানিকটা কাজ হয়। নাটোয়ার বুঝতে পারে, সে যা করছে সেটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। সাধুদের কানে গেলে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যাবে। ওদের শিষ্য এবং ভক্তরা খ্যাপা জানোয়ারের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের একেবারে ছিঁড়ে ফেলবে। তবু ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে এভাবে বঞ্চিত হওয়ায় রাগ পড়ে না নাটোয়ারের। কী চমৎকার চমৎকার কথা বলেই না প্রাণানন্দ তাদের খাটিয়ে নিল! নাটোয়ার গালাগাল বন্ধ করে না, গলার স্বরটা শুধু খানিক নামিয়ে দেয়।

অনেকক্ষণ চেঁচামেচির পর ক্লান্ত হয়েই একসময় চুপ করে যায় নাটোয়ার। তার জীবনীশক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। নিজের ওপর এতকাল প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিল নাটোয়ারের। কোনো কারণেই সে হতাশ হয়নি, ভেঙে পড়েনি, অসীম আত্মবিশ্বাসের জোরে এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে চল্লিশটা বছর সে টিকে আছে কিন্তু গত দুটো দিন নিষ্ফল ছোটাছুটির পর তার মনে হচ্ছে, আর বুঝিবা পেরে উঠবে না।

বেলা আরো খানিকটা হেলে গেছে। তবে রোদ প্রায় নেই বললেই হয়। সকালের দিকে যে মেঘগুলো আকাশ জুড়ে ঘোরাঘুরি করছিল, এখন সেগুলো জড়ো হয়ে পাথরের চাংড়ার মতো পশ্চিম দিকে ঝুলে আছে। যে সামান্য নির্জীব রোদটুকু এখনও দেখা যাচ্ছে, মেঘের কানাতের গায়ে তা আবছাভাবে আটকে আছে।

কিছুক্ষণ আগেও ঝড়ো বাতাস বইছিল। হঠাৎ হাওয়াটা পড়ে গেছে। গোটা আবহাওয়ায় ভীষণ গুমোট। ভ্যাপসা গরমে গা যেন জ্বলে যায়।

গোমতী বলে, 'এখন তা হলে কী করবে?'

'আমি আর ভাবতে পারছি না।' বলে লম্বা হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে নাটোয়ার। 'দ্যাখ তোরা কিছু করতে পারিস কিনা—'

এতক্ষণ দুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনি রেখে চুপচাপ বসে ছিল লচ্ছু। গোমতীদের কথায় তার কান ছিল বলে মনে হয় না। হঠাৎ সে ডাকে, 'চাচা—'

নাটোয়ার কৌতূহলশূন্য মুখে জিজ্ঞেস করে, 'কা রে?'

'ঐ দেখ—'

'কা?'

'ওধারে তাকাও—' বলে লচ্ছু রসুই ঘরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয়।

মাথাটা সামান্য তুলে নাটোয়ার আগের সুরেই বলে, 'দেখার কী আছে? ওখানে রসুই হচ্ছে।'

লচ্ছু জানায়, রসুই-এর খবর সে দিতে চায়নি, সেটা সবাই জানে। তার মাথায় একটি পরিকল্পনা আছে। চটের দেওয়ালের গা ঘেঁষে পুরী তরকারি গুলাবজামুন ইত্যাদি লোভনীয় খাবারগুলি কাঠের পরাতে সাজানো রয়েছে।

চটটা সামান্য তুললেই হাত বাড়িয়ে সেগুলোর নাগাল পাওয়া যাবে। কোমরে ক্ষিপ্র একটা মোচড় দিয়ে প্রায় লাফ দিয়েই উঠে বসে নাটোয়ার। তার শরীরে নতুন করে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে যাচ্ছে। লচ্ছুর পিঠে আদরের ভঙ্গিতে একটা চাপড় মেরে বলে, 'বহোত আচ্ছা—'

লচ্ছু বলে, 'চল, আস্তে আস্তে গিয়ে পুরী উরী নিয়ে আসি।'

কাল এই সময় ফাঁকা মাঠের মাঝখানে বাপের চিতার পাশে বসে একটানা কেঁদে যাচ্ছিল লচ্ছু। একদিনের মধ্যেই সে টের পেয়ে গেছে পিতৃশোকের চেয়ে খাদ্য বস্তুটা অনেক বেশি জরুরি, তা সেটা গায়ে খেটে, চুরিচামারি করে, যেভাবেই হোক জোগাড় করতে হবে।

নাটোয়ার তীক্ষ্ণ চোখে ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে, সব দিক দেখে নেয়। নাঃ, এধারে কেউ নেই। চারপাশ সুনসান। গোমতীর কাছ থেকে তার থলিটা চেয়ে নিয়ে তাকে এখানে বসে থাকতে বলে, লচ্ছুকে সঙ্গে করে কয়েক পা এগিয়ে যায়। তারপর হঠাৎ উবুড় হয়ে শুয়ে গিরগিটির মতো বুক টানতে টানতে রসুইঘরের পেছনে চটের দেওয়ালের কাছে এসে কিছুক্ষণ মড়ার মতো দমবন্ধ করে পড়ে থাকে।

এক সময় নাটোয়ার চাপা গলায় বাতাসের মতো ফিসফিসিয়ে বলে, 'লচ্ছু, তুই চটটা তুলে ধর। বেশি তুলবি না—হোঁশিয়ার—'

কথামতো খুব সন্তর্পণে চটটা আধ হাতের মতো তুলে ধরে লচ্ছু। যে ফোকরটা হয় নিমেষে দুই হাত ঢুকিয়ে দেয় নাটোয়ার। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো সে দুটো বার বার ঢুকে প্রচুর পুরী তরকারি বালুসাই গুলাবজামুন কলাকন্দ বার করে এনে গোমতীর সেই থলের ভেতর পুরে ফেলতে থাকে।

সমস্ত ব্যাপারটা নিখুঁত পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন হতে যচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ রসুইঘরের ভেতর কারো একজনের চোখে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড হইচই শুরু হয়ে যায়। 'চোর—চোর—'

নাটোয়ারের মাথাটা সব সময়ই অত্যন্ত পরিষ্কার। দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে এক হ্যাঁচকায় লচ্ছুকে টেনে তুলে দৌড়ুতে দৌড়ুতে গোমতীর কাছে চলে আসে।

গোমতীও চোখের পলকে ব্যাপারটা আঁচ করে আগেই উঠে পড়েছিল। নাটোয়ার বলে, 'দৌড় লাগা—ঐ মাঠের দিকে—'

তিনটে মানুষ কাঁকরে-ভরা পড়তি জমির ওপর দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে থাকে। পেছন থেকে বহু মানুষের চিৎকার ভেসে আসছে।

দৌড়ুতে দৌড়ুতে একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় নাটোয়ার। বিশাল জনতা লাঠি বর্শা দা, হাতের কাছে যে যা পেয়েছে তা-ই নিয়ে ধাওয়া করে আসছে। নাটোয়ার দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'শালালোগ আ গিয়া। আউর জোরসে পা চালা—'

দিগন্ত-জোড়া মাঠের ওপর দিয়ে কাঁটা গাছ, ছোটখাটো টিলা, নহর ইত্যাদি পেরিয়ে নাটোয়াররা অক্ষের মতো ছুটতে থাকে। মাটিতে তাদের পায়ের পাতা পড়ছে না, তিনটে মানুষ হাওয়ায় যেন উড়ে চলেছে।

শোরগোলটা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। বোঝা যায়, ক্রুদ্ধ উত্তেজিত জনতা দৌড়ে তাদের সঙ্গে পেরে উঠছে না। প্রাণের ভয়ে যারা ছুটছে তাদের ধরা বড় সহজ নয়।

যাক, জানটা অন্তত বাঁচানো গেল। দুশ্চিন্তা যখন কিছুটা কেটে এসেছে সেই সময় হঠাৎ নতুন ঝঞ্ঝাট দেখা দেয়। সাঁ সাঁ করে মাথার ওপর দিয়ে, কানের পাশ দিয়ে পাথরের টুকরো তীরের মতো বেরিয়ে যেতে থাকে। অর্থাৎ কিনা লোকগুলো ধরতে না পেরে প্রচণ্ড আক্রোশে এখন ঢিল ছুঁড়ছে। নাটোয়ার ছোটার গতি বাড়িয়ে দিয়ে সঙ্গীদের উদ্দেশে বলে, 'আউর জোরে—'

শরীরের শেষ শক্তিটুকু পায়ে জড়ো করে ওরা তিনজন এগিয়ে যায়।

ধীরে ধীরে পেছনের হট্টগোল ক্ষীণ হয়ে যেতে থাকে। কিন্তু তার আগেই নাটোয়ারের পিঠে আর গোমতীর পায়ের গোছে দুটো বড় মাপের পাথরের টুকরো এসে পড়েছে।

দিনটা আরো ঢলে পড়েছে। গাঢ় মেঘের ফাঁক দিয়ে ম্যাড়মেড়ে সূর্যের একটা কোণা শুধু চোখে পড়ে। রোদ আর নেই, চারিদিক দ্রুত ছায়াচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। আকাশের ভাবগতিক দেখে মনে হয়, আজ বৃষ্টি নামবেই।

এখন আর পেছনে হট্টগোল নেই। যারা লাঠি ডাণ্ডা নিয়ে তাড়া করে এসেছিল তাদেরও দেখা যাচ্ছে না। নাটোয়াররা হাতের বাইরে চলে যাবার পর জনতার মাথা থেকে আক্রোশটা নেমে গেছে।

নাটোয়াররা আপাতত যেখানে এসে পড়েছে, সেখানে সারি সারি ভাঙাচোরা

অগুণতি চালাঘর। দেখেই বোঝা যায়, একদা এখানে জমজমাট হাট বসত, এখন পরিত্যক্ত।

নাটোয়ারের পিঠে এবং গোমতীর পায়ে যেখানে পাথর লেগেছিল, এখন সেই জায়গাগুলি মারাত্মক টাটাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে প্রাণ বাঁচাতে যখন তারা দৌড়ুচ্ছিল তখন অন্য কোনোদিকে তাদের নজর ছিল না। ভয় এবং দুশ্চিন্তামুক্ত হওয়ার পর এখন যন্ত্রণাটা টের পাওয়া যাচ্ছে। নাটোয়ারের মনে হচ্ছে তার পিঠ এবং গোমতীর মনে হচ্ছে তার পা যেন ছিঁড়ে পড়বে।

এতটা দৌড়ে আসার কারণে তিনজনেরই বুক হাপরের মতো ওঠানামা করছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে গোমতী বলে, 'আমি আর এক কদমও চলতে পারব না।' বলেই প্রায় হুড়মুড় করে একটা চালার তলায় বসে পড়ে।

নাটোয়ার এবং লচ্ছুও জানায়, তাদের শরীরেও এক পা চলার মতো শক্তি অবশিষ্ট নেই। দু'জনে গোমতীর পাশে বসে বুক তোলপাড় করে জোরে জোরে শ্বাস টানতে থাকে।

খানিক ধাতস্থ হওয়ার পর নাটোয়ার বলে, 'শালে ভূচ্চরেরা এমন পাথর মেরেছে, মনে হচ্ছে, পিঠের হাড্ডি বিশ টুকরা হয়ে গেছে।'

গোমতী বলে, 'আমার পায়ের হাল দেখ—' বলে ডান পা'টা সামনের দিকে বাড়িয়ে শাড়ির নিচের অংশ অনেকখানি টেনে তোলে। সে বাড়িয়ে কিছু বলেনি, সত্যিই পায়ের গোছ পাথরের ঘায়ে থেঁতলে রীতিমতো ফুলে উঠেছে, চামড়া ফেটে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

তারা ঠিক করে ফেলে আজকের রাতটা এই নির্জন হাটের চালায় কাটিয়ে দেবে। এখান থেকে কোথায় কোন দিকে যাবে কাল সকালে উঠে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ঠিক করবে। আজ পুরো রাত শুধু একটানা ঘুম।

প্রাণের ভয়ে দৌড়ুলেও খাবারের থলেটা ছাড়েনি নাটোয়ার, সারাক্ষণ বুকের ভেতর সেটা আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। থলেটা নামী দামী সুখাদ্যে বোঝাই। এত খাবার যে আজ খাওয়ার পরও যা বাড়তি থাকবে তাতে কালকের দিনটাও তিন বেলা ভালভাবে চলে যাবে।

গোমতীও তার থালা লোটা আর শাড়িটাড়ি ফেলে আসেনি।

হাটের এই চালাগুলো থেকে খানিক দূরে একটা বিল চোখে পড়ে। অনেকক্ষণ জিরোবার পর দিনের আবছা আলো থাকতে থাকতেই তিনজনে সেখানে চলে যায়। হাতমুখ ধুয়ে গোমতী লোটায় ভরে জল নিয়ে আসে।

নাটোয়ারের পকেটে একটা দেশলাই আছে ঠিকই কিন্তু ওদের কারো কাছেই

হেরিকেন বা ডিবিয়া নেই। কাজেই মেঘাচ্ছন্ন দিনের শেষ আলোটুকু থাকতে থাকতেই ওরা রাতের খাওয়া চুকিয়ে ফেলে।

যাদের হাতে একটা পয়সাও নেই, ভবিষ্যৎ যাদের কাছে একেবারেই অন্ধকার, শুধু কালকের দিনটার মতো খাদ্য যাদের মজুদ রয়েছে, তারপর কী খাবে জানা নেই, দু'জনের পিঠ আর পা পাথরের ঘা লেগে ভাল রকমই জখম হয়েছে—এত কষ্ট এবং অনিশ্চয়তার ভেতরও সাধুদের ওপর বাটপাড়ি করতে পেরে তারা বেজায় খুশি। এই নিয়ে তারা অনেকক্ষণ হাসাহাসি করে কাটিয়ে দেয়।

নাটোয়ার বলে, 'শালে ধোঁকেবাজদের আমরাও ধোঁকা দিয়েছি, না কী বলিস রে লচ্ছু? কা রে গোমতী?'

লচ্ছু এবং গোমতী হাসতে হাসতে বলে, 'জরুর জরুর—'

একসময় সন্ধে নেমে যায়। আজ কী তিথি কে জানে। মেঘের কারণে গোলা আলকাতরার মতো চাপ চাপ অন্ধকারে সমস্ত চরাচর ঢাকা পড়ে গেছে।

খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে একটা চালার তলায় চিত হয়ে পড়েছে নাটোয়ার। অন্য এক চালায় গোমতী এবং লচ্ছু।

কালকের মতোই থেকে থেকে মেঘ ডাকছে। আকাশটাকে পুব-দক্ষিণে বা উত্তর-পশ্চিমে আড়াআড়ি ফেঁড়ে বিদ্যুৎ চমকে যাচ্ছে। কাল দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়েছিল, আজ চারিদিক ভাসিয়ে দেবার মতো আয়োজন হয়েই আছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল নাটোয়ার। চাঁদ উঠেছে কিনা বোঝা যায় না। যতদূর চোখ যায়, একটা তারা পর্যন্ত কোথাও নেই। পিঠের অসহ্য টাটানি আর সারা শরীরের অসীম ক্লান্তিতে চোখ ক্রমশ বুজে আসতে থাকে নাটোয়ারের।

কখন যে গুমোট ভাবটা কেটে গিয়ে জোরালো হাওয়া বইতে শুরু করেছে, কে জানে। ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টিও নেমে গেছে।

নাটোয়ার গভীর ঘুমের আরকে ডুবে গিয়েছিল। হঠাৎ কার একটা হাত তার গলার ওপর এসে পড়ে। কানের কাছে মুখ এনে কেউ ফিসফিসিয়ে ডাকে, 'এ—এ আদমী—এ—' ডাকের সঙ্গে সঙ্গে সে নাটোয়ারকে নাড়াও দিতে থাকে।

ঘুম ভেঙে যায় নাটোয়ারের। যে হাতটা তার গলার ওপর এসে পড়েছিল, এখন সেটা ফাঁসের মতো ক্রমশ তাকে জড়িয়ে ফেলছে। 'কৌন—কৌন—'

বলতে বলতে ধড়মড়িয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করে নাটোয়ার কিন্তু পারে না। টের পায় দু'টি সুদৃঢ় অথচ নরম স্তন তার বুকে লেপটে গিয়ে যেন গলে গলে মিশে যাচ্ছে।

এবার একটা চাপা ধাতব শব্দের মতো গলা শুনতে পায় নাটোয়ার, 'মাত্ উঠো—হামনি গোমতী—'

চার বছর ধরে নাটোয়ারের রক্তের ভেতর যে আগুন প্রায় নিভে এসেছে, কাল রাতে সেটা নতুন করে জ্বলে উঠেছিল কিন্তু প্যাণ্ডেলে ভারতমাতা রথ-এর সঙ্গী জুলুসের প্রচুর লোকজন ছিল, তাই গোমতী কাছে আসতে চায়নি, কিন্তু মেয়েমানুষটা আজ নিজের থেকেই বুকের ভেতর এসে ধরা দিয়েছে।

নাটোয়ার সাপটে গোমতীকে বুকের ভেতর আরো ঘন করে জড়িয়ে নেয়। তারপর উন্মাদ আবেগে তার মুখে বুকে গলায় মুখ ঘষতে থাকে।

অসহ্য গভীর সুখে শ্বাস আটকে আসে গোমতীর। তার শরীর ভীষণ কাঁপছিল। আস্তে আস্তে নাটোয়ারের ঠোঁটে, কানের লতিতে, থুতনি এবং নাকে কামড়ে বসাতে বসাতে সে বলে, 'আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে। তুমি কি আমাকে মেরে ফেলবে!'

'শালী কুত্তী, তুই তো আমাকে মেরে ফেলছিস!' নাটোয়ারের গলার ভেতর থেকে শীৎকারের মতো আওয়াজ বেরিয়ে আসতে থাকে।

'এখন তো খুব সুহাগ করছ। তুমি না আমাকে ঘিন (ঘৃণা) করতে।'

'ভুল যা—'

'তুমি না আমাকে খুন করতে চেয়েছিলে!'

'ভুল যা—'

'ফকিরা চাচা না থাকলে সেদিন তো তুমি আমাকে মেরেই ফেলতে—'

'ভুল যা। এখন যত ফালতু বাত—'

আচমকা গোমতী টের পায়, নাটোয়ারের দুই হাত তার জামাকাপড় টেনে ছিঁড়ে ফেলছে। চমকে উঠে তার হাত চেপে ধরে গোমতী, 'কা করত হ্যায়? আমার সিরিফ দো কাপড়া। একটা ছিঁড়ে ফেললে—'

নাটোয়ারের গায়ে এবং কণ্ঠস্বরে অমানুষিক কিছু যেন ভর করেছে। সে বলে, 'এক কাপড়ার বদলে দশগো কিনে দেবো।' সে ভুলে যায় মাত্র একদিনের খাদ্য ছাড়া তার হাতে একটা পয়সাও নেই কিন্তু এটা এমন এক মুহূর্ত যখন কোনো ব্যাপারেই হিসেব থাকে না।

'নেহীঁ নেহীঁ, থোড়েসে সবুর—'

কিছুক্ষণ বাদে নাটোয়ার বুঝতে পারে উত্তপ্ত, ঝাঁঝালো এবং মারাত্মক একটি শরীরে—যার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা সুতো পর্যন্ত নেই—সে ক্রমশ প্রবল নেশাগ্রস্তের মতো ঢুকে যাচ্ছে।

এই সময় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। গোটা পৃথিবীকে রসাতলে পাঠাবার জন্য যে আয়োজনটা ক'দিন ধরেই চলছিল, আজ এই মুহূর্তে সেটা শুরু হয়ে যায়। বাইরে প্রকৃতি যখন খেপে উঠেছে সেই সময় এক পরিত্যক্ত হাটের চালায় একটি পুরুষ এবং একটি মেয়েমানুষের শরীরে জগতের আদিম দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে।

অনেকক্ষণ পর দেহ দু'টি আলগা হয়ে যায়। পরস্পরের কাছাকাছি শুয়ে নাটোয়ার এবং গোমতী হাঁপাতে থাকে।

বাইরে জল ঝরেই যাচ্ছে। সেই সঙ্গে মেঘের একটানা গর্জন আর বিজলি চমক তো রয়েছেই।

চারিদিক থেকে বৃষ্টির ছাট আসছে। ফুটো চালা থেকে অনবরত জল ঝরছে। নাটোয়ার এবং গোমতীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভিজে যাচ্ছে কিন্তু সে ব্যাপারে কারো হুঁশ নেই।

অনেকক্ষণ পর গোমতী ফিসফিসিয়ে বলে, 'আমি কী করব?'

বুঝতে না পেরে নাটোয়ার জিজ্ঞেস করে, 'কী করবি, মতলব?'

'একা একা আমার আর ভাল লাগে না—'বলতে বলতে নাটোয়ারের বুকের কাছে মুখটা নিয়ে আসে গোমতী।

নাটোয়ার চার বছর আগের সেই ব্যাপারটা পুরোপুরি ভুলে যায়নি। সে বলে, 'যার সঙ্গে ভেগেছিলি, ওই শালে ভূচ্চরের ছৌয়া গেল কোথায়?'

নাটোয়ারের খোঁচাটা এই মুহূর্তে গোমতীকে খুবই কষ্ট দেয়। করুণ মিনতিপূর্ণ স্বরে সে বলে, 'তোমাকে তো বলেছিই আমার কসুর হয়েছে, পাপ হয়েছে। ওসব বলে আমাকে আর দুখ দিও না।'

নাটোয়ার এ সম্পর্কে আর কোনো প্রশ্ন করে না।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর গোমতী ফের বলে, 'বাপুর ঘরে আমার আর থাকতে ইচ্ছা করে না।'

নাটোয়ার জিজ্ঞেস করে, 'কী করতে চাস তুই?'

'তুম বাতা দো—' গলার স্বর আরো চাপা শোনায় গোমতীর।

তার ইঙ্গিতটা বুঝতে পারছিল নাটোয়ার। একটা হারামজাদার ছৌরার সঙ্গে

পালিয়ে যাবার স্মৃতি আদৌ সুখকর নয় গোমতীর। বরং লজ্জায় গ্লানিতে সে যেন মরে আছে। চার বছর আগে যে বিশ্বাসঘাতকতা করে পালিয়ে গিয়েছিল, এখন সে সত্যিসত্যিই অনুতপ্ত। এমন একটি মেয়েমানুষকে নতুন করে স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া যায় কিনা সেটাই যেন ভেবে উঠতে পারছে না নাটোয়ার। সে বলে, 'তুই কি আমার কাছে আবার যেতে চাস?'

গোমতী উত্তর দেয় না। নাটোয়ারের বুকের ভেতর উন্মাদের মতো মুখ ঘষতে ঘষতে সে সমানে কাঁদতে থাকে।

কর্কশ হাত যতটা সম্ভব মোলায়েম করে গোমতীর মাথা কপাল গাল গলা এবং স্তনের ওপর বুলোতে বুলোতে নাটোয়ার বলে, 'রো মাত্, রো মাত্। কাঁদিস না গোমতী—'

গোমতী থামে না, তার কান্নাটা আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

নাটোয়ার বলে, 'লেকেন আমার কাছে যদি যাস তোর বাপ-ভাইয়ের কী হবে? কে তাদের দেখবে?'

'আমি জানি না, জানি না—'প্রবল বেগে মাথা নাড়তে থাকে গোমতী।

নাটোয়ার আবেগের তোড়ে পুরোপুরি ভেসে যায় না। সে বলে, 'সোচ বিচার (ভেবেচিন্তে) করে দেখি। গাঁওবালাদের সঙ্গে, ফকিরাচাচার সঙ্গে কথা বলতে হবে। তারপর—'

গোমতী অবুঝের মতো নাটোয়ারের বুকে মুখে গলায় মুখ ঘষতে ঘষতে বলে, 'যত খুশি সোচ বিচার ক'রো, যার সঙ্গে খুশি কথা ব'লো—আমি তোমার কাছে যাবই—'

পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আকাশভাঙা প্রলয়ের মধ্যে অকালের বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে একসময় তারা ঘুমিয়ে পড়ে।

॥ চোদ্দ ॥

গোমতীর ঘুম যখন ভাঙে তখনও অনেকটা রাত রয়েছে। তবে বৃষ্টি ধরে গেছে। মেঘের ফাঁক দিয়ে ঘোলাটে একটু জ্যোৎস্না বেরিয়ে এসেছে। আবছা আলোয় সে দেখতে পায়, ঘাড় গুঁজে ঘুমোচ্ছে নাটোয়ার। তার সমস্ত শরীর একেবারে উদোম। পাশ থেকে নাটোয়ারের জামাপ্যান্ট তুলে নিয়ে তাকে ঢেকে দেয় গোমতী। তারপরেই নিজের দিকে নজর যায় তার। শিয়রের কাছে তার শাড়ি আর জামা দলামোচড়া হয়ে পড়ে ছিল। দ্রুত সেগুলো পরে

নেয় সে। এবং তখনই লচ্ছুর কথা মনে পড়ে যায়।

কাল সন্ধ্যায় খাওয়ার পর লচ্ছু আর সে একটা চালায় শুয়েছিল, আর এই চালাটায় নাটোয়ার। রাতে ঘোর দুর্যোগের মধ্যে যখন তাদের দুটো শরীর একসঙ্গে মিশে যায় সেই সময় নিজেরা ছাড়া দুনিয়ার সমস্ত কিছুই তাদের কাছে পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এখন লচ্ছুর কথা মনে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে পাশের চালায় চলে, আসে গোমতী। জলে ভিজে কুঁকড়ে, বুকের ভেতর হাঁটু গুঁজে কুকুরের মতো শরীরটাকে দলা পাকিয়ে শুয়ে আছে ছেলেটা। কয়েক পলক তার দিকে তাকিয়ে থাকে গোমতী। ছেলেটার মা নেই, জমিমালিকেরা তাদের গাঁও জ্বালিয়ে দিয়েছে, বন্দুকবাজদের গুলিতে তার বাপ মরেছে, দুনিয়ায় কেউ নেই তার। লচ্ছুর জন্য অপার মমতায় গোমতীর বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যেতে থাকে। তাড়াতাড়ি ঝুঁকে শাড়িটা আঁচল দিয়ে ছেলেটার মাথা এবং গা মুছে দেয়।

লচ্ছু যেখানে শুয়ে ছিল সেখানে চাল চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল পড়ছে। গোমতী সযত্নে তাকে চালার যে জায়গাটা এখনও শুকনো রয়েছে সেখানে নিয়ে আসে এবং মা-পাখি যেভাবে তার বাচ্চাকে আগলে রাখে হুবহু সেইভাবেই লচ্ছুকে জড়িয়ে ধরে তার পাশে শুয়ে থাকে গোমতী। তারপর ফের ঘুমিয়ে পড়ে।

গোমতীর দ্বিতীয় দফার ঘুম যখন ভাঙে, বেশ বেলা হয়েছে এবং এর মধ্যেই জেগে গেছে লচ্ছু আর নাটোয়ার। তারা তার শিয়রের কাছে বসে কথা বলছিল।

হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসতে বসতে নাটোয়ারের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায় গোমতীর। কাল রাতের কথা মনে পড়তে মুখ নামিয়ে লাজুক হাসে সে। পিঠময় ছড়ানো চুলগুলো একটা আলগা খোঁপায় গোছাতে গোছাতে বলে, 'বহোত দেরি হয়ে গেল উঠতে—'

নাটোয়ার বলে, 'লচ্ছু আর আমি কত বার তোকে ডেকেছি তার ঠিক নেই। বিলকুল আওরত কুম্ভকরণ—'

'কী করব, অ্যায়সা নিদ এসে গেল মাঝ রাতে—'

একটু চুপচাপ।

তারপর নাটোয়ার বলে, 'এখন কী করা যায় বল্ তো? আসমানের যা হাল তাতে বেরিয়ে পড়তে ভরসা হচ্ছে না।'

কাল মধ্যরাতে মেঘ কেটে গিয়ে তবু খানিকটা জ্যোৎস্না বেরিয়ে পড়েছিল,

বৃষ্টিটাও ধরে গিয়েছিল। কিন্তু আজ আকাশের মতিগতি নতুন করে আবার ঘোরালো হয়ে উঠেছে। কোথাও রোদের ছিটেফোঁটা চোখে পড়ছে না। সূর্যটা উধাও। পাথরের চাংড়ার মতো চাপ চাপ কালো মেঘে সব কিছু ঢেকে আছে। যে কোনো মুহূর্তে আকাশ ভেঙে হুড়মুড় করে ফের তুমুল বৃষ্টি নেমে যেতে পারে।

গোমতী সায় দিয়ে বলে, 'হাঁ, কিছুক্ষণ দেখি। মেঘ কেটে যদি সূরয বেরোয় তখন না হয় বেরুনো যাবে।'

'সেই ভালো। আজকের দিনটার জন্যে তো খানা উনার চিন্তা নেই।'

নাটোয়ার বলে, 'কাল খেয়েদেয়ে যা বেঁচেছিল, দ্যাখ সেগুলো ঠিক আছে কিনা—'

এই চালারই একধারে গোমতীর থলেটা রয়েছে। ব্যস্তভাবে সেটা টেনে এনে খাবারগুলো বার করে দেখে নেয় সে। নাঃ, গরম কাল হলেও কাল একটানা বৃষ্টির জন্য বেশ ঠাণ্ডা পড়েছিল। কাজেই খাদ্যবস্তুগুলো নষ্ট হয়নি। গোমতী সেই কথাটা জানিয়ে দেয়।

খানিকক্ষণ চিন্তা করে নাটোয়ার একসময় বলে, 'এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় যাওয়া যায়?' দু'দিন ধরে বেফায়দা ঘুরে মরছি। একগো পাইসাও কামাই করতে পারলাম না।'

গোমতীকে বেশ চিন্তিত দেখায়। সে বলে, 'হাঁ, আমিও কিছু বুঝতে পারছি না। তুমি একটা ফিকির বার ক'রো।'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয় না নাটোয়ার। অনেকক্ষণ কী ভাবে সে, তারপর বলে, 'এখান থেকে মাইল চারেক পুবে গেলে ক'টা কাঠ চেরাইয়ের কারখানা আছে। জায়গাটার নাম বারদিয়া। ওখানে কয়েক বার আমি কাজ করে এসেছি। রামজি কিষুণজির কিরপা হলে বারদিয়ায় কিছু কামাই হয়ে যেতে পারে।'

এ ছাড়া চোখের সামনে পয়সা রোজগারের আর কোনো পথই দেখা যাচ্ছে না। মাথা হেলিয়ে গোমতী বলে, 'ঠিক হ্যায়। 'লেকেন—'

'লেকেন কী?' গোমতীর চোখের দিকে তাকায় নাটোয়ার।

গোমতী সংশয়ের গলায় এবার বলে, 'আমাদের যা বরাত, ওখানে গিয়ে যদি কামকাজ না মেলে?'

এদিকটা তেমন ভেবে দেখেনি নাটোয়ার। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে চিন্তাগ্রস্তের মতো বলে, 'হাঁ, সে ভয়টা আছে।'

'তখন কী করবে ?'

নাটোয়ার জানায়, তেমন দুর্ভাগ্য ঘটলে কী করণীয়, এই মুহূর্তে ভাবতে পারছে না, তবে বেঁচে থাকার জন্য কোনো না কোনো ধান্দা তো করতেই হবে।

গোমতী ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, মুখে কিছু বলে না।

হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যেতে নাটোয়ারের চোখে যেন ঝিলিক খেলে যায়। সে বলে, 'কাজ না মিললেও পন্দ্র বিশ রোজ না খেয়ে মরব না রে গোমতী।'

'ও ক্যায়সা ?' উৎসুক সুরে জানতে চায় গোমতী।

'আরে বাবা, ঐ রথবালারা আছে না—ঐ যে ভারত মাতাজিকা রথ ?'

'হাঁ হাঁ—'

'ওরা তো বড় পাক্কী ধরে আধারশিলা বসাতে বসাতে চলেছে।'

'ঠিক বাত।'

'কামাইয়ের ব্যওস্থা না হলে ওদের জুলুসে ঢুকে পড়ব। কমসে কম পেটের দানা তো জুটে যাবে।'

শেষ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে এটাই সাব্যস্ত হয় যদি কোনোভাবেই কাজকর্ম জোটানো সম্ভব না হয়, তারানাথজিদের রথযাত্রার মিছিলে ক্ষুধার্ত জনতার সঙ্গে তারাও হাঁটতে থাকবে এবং তার ফাঁকে ফাঁকে পালিয়ে গিয়ে কামাইয়ের চেষ্টা চালিয়ে যাবে। অবশ্য দু'দিন ধরে তারা এটাই করে যাচ্ছিল। তবে এলোমেলোভাবে। এখন থেকে সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে তাদের এগুতে হবে। সকাল এবং বিকেলে কাজের খোঁজে বেরুবে কিন্তু দুপুরে খাওয়ার সময় নিতান্ত নিরুপায় না হলে ভারতমাতা রথ-এর সঙ্গে তারা আঠার মতো জুড়ে থাকবে।

নাটোয়াররা ঠিক করে রেখেছিল, মেঘ ফাটিয়ে রোদ বেরুলে এই পরিত্যক্ত হাট থেকে বেরিয়ে পড়বে কিন্তু বেলা যত চড়ে আকাশের চেহারা ততই ঘোরালো হয়ে উঠতে থাকে। কালো পাথরের মতো নিরেট মেঘে চারিদিক ছেয়ে গেছে। পশ্চিম দিগন্তকে আড়াআড়ি চিরে দিয়ে কড় কড় করে বাজ পড়ে, ঝলসে যায় উঁচু উঁচু আকাশ ছোঁয়া গাছের মাথা। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে।

সকাল থেকে যার জন্য এত তোড়জোড়, দুপুরের পর থেকেই আবার তা নতুন করে শুরু হয়ে যায়। লক্ষ কোটি সীসার ফলার মতো বৃষ্টি নেমে আসতে

থাকে আকাশ থেকে।

নড়বড়ে ফুটোফাটা হাটের চালায় কাছাকাছি ঘন হয়ে বসে কোনোরকমে মাথা বাঁচাতে চেষ্টা করে নাটোয়াররা কিন্তু জোরালো বৃষ্টির তোড় চারিদিক থেকে তাদের অনবরত ভিজিয়ে দিতে থাকে। এরই মধ্যে তারা দুপুরের খাওয়া চুকিয়ে ফেলে।

দুপুরের পর বিকেল, বিকেলের পর রাত নামে। কিন্তু জল ঝরার কামাই নেই। যে চালাটায় তিনজন বসে ছিল সেটা একসময় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। অগত্যা দৌড়ে অন্য একটা চালার তলায় চলে যেতে হয় নাটোয়ারদের। কিন্তু এই জনশূন্য পরিত্যক্ত হাটে একটা চালাও কি শক্তপোক্ত আর অক্ষত আছে ? জোরালো বৃষ্টির ধাক্কা সামলে বেশিক্ষণ খাড়া থাকার ক্ষমতা কোনোটারই নেই। একটা চালা ধসে পড়লে নাটোয়ারেরা আরেকটা চালায় গিয়ে মাথা গোঁজে। সেটা চুরমার হলে যেটা এখনও খাড়া আছে তার তলায় চলে যায়। এই ভাবে সমস্ত হাট জুড়ে তিনটি মানুষ অনবরত ছোটাছুটি করতে থাকে।

সন্ধের অনেক পর বৃষ্টির ছাটে ভিজে ভিজে নাটোয়ারদের শরীর যখন সিঁটিয়ে গেছে, ঠাণ্ডা জলো বাতাস তাদের সারা গায়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছে, সেই সময় বৃষ্টি থামে।

কোনো একটা চালাও আস্ত বা অটুট নেই। সবগুলিরই এক হাল। মাটি ভিজে এমনই থকথকে হয়ে গেছে যে শোওয়ার যো নেই। এরই মধ্যে যে চালাটি মোটামুটি ভাল অর্থাৎ ছাউনি দিয়ে জল কম পড়েছে সেখানে হাঁটুতে মাথা গুঁজে তিনটে মানুষ ঠায় ব'সে হাঁটুর ভেতর মাথা গুঁজে রাতটা কাটিয়ে দেয়।

কাল সৃষ্টিছাড়া ঝড় বৃষ্টিতে পৃথিবী যে রসাতলে যেতে বসেছিল, আজ আকাশের দিকে তাকিয়ে কে তা বলবে। চিরকালের চেনা পরিষ্কার নীলাকাশ মাথার ওপর দিগন্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। পরিত্যক্ত হাটে ধসে-পড়া অগুণতি চালা আর নানা গাছগাছালির ভাঙাচোরা ডালপালা ছাড়া কোথাও দুর্যোগের চিহ্নমাত্র নেই।

খানিক আগে সকাল হয়েছে। গলানো গিনির মতো ঝলমলে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত চরাচরের ওপর। কাল একটানা বৃষ্টির কারণে আবহাওয়া আজ বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। আরামদায়ক ঝিরঝিরে বাতাস বয়ে যাচ্ছে অদৃশ্য স্রোতের

মতো।

মহাযজ্ঞের রসুইখানা থেকে যে সুখাদ্যগুলি নাটোয়াররা চুরি করে এনেছিল, কাল ভালভাবেই তাতে চলে গেছে। আজ সকালের কথা মাথায় রেখে কয়েকখানা পুরী আর গোটা তিনেক কলাকন্দ রেখে দিয়েছিল গোমতী। তিনজনে শেষ খাদ্যটুকু খেয়ে একসময় বেরিয়ে পড়ে।

এ অঞ্চলের মাটি বেশির ভাগটাই কাঁকুরে এবং কর্কশ। তার সঙ্গে দানা দানা বালি মেশানো। প্রবল বৃষ্টিতেও তেমন কাদা টাদা জমেনি। তাই হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছিল না।

এদিকে আগে কখনও আসেনি নাটোয়ার। না এলেও জায়গাটা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা আছে। এখান থেকে ডান দিকে ঘুরে উত্তর পশ্চিম কোণ বরাবর হাঁটতে থাকলে দুপুর নাগাদ তারা বারদিয়া পৌঁছুতে পারবে।

চলতে চলতে গোমতী জিজ্ঞেস করে, 'একগো বাত পুছুঁ ?'

নাটোয়ার বলে, 'একগো কায় ? দশগো পুছ না—'

'কাঠ চিরাইয়ের কারখানায় গেলে কামাইয়ের বন্দোবস্ত হবে তো ?'

'কালই তো বললাম, আমাদের যা বরাত, ভরোসা দিতে পারছি না। বারদিয়ায় গিয়ে তো দেখি।'

গোমতীর বুক তোলপাড় করে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। মনে পড়ে, এই কথাগুলো আগেও হয়েছে। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে সে বলে, 'হাঁ, ঠিক বাত। ভাগ্যটাই বহোত বুরা, কোথাও কিছু জুটছে না।'

এরপর অনেকক্ষণ কেউ আর কিছু বলে না, চুপচাপ কাঁকুরে পড়তি ডাঙার ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকে।

মাইলখানেক চলার পর আচমকা দক্ষিণ দিক থেকে কার গলা যেন ভেসে আসে, 'হোই-হোই—হোই—'

নাটোয়ারেরা থমকে দাঁড়িয়ে এধারে ওধারে তাকাতেই অনেক দূরে, ফাঁকা নির্জন মাঠের মাঝখানে লোকটাকে দেখতে পায়। ওদিকে সবুজের ছিটেফোঁটাও নেই। না বড় গাছ, না ঝোপঝাড়। চারপাশ ন্যাড়া, রুক্ষ, জনশূন্য। লোকটা যেন পাতাল থেকে মাটি ফুঁড়ে ওখানে বেরিয়ে এসেছে। অবাক চোখে তিনজন তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিছুক্ষণের ভেতর লোকটা কাছাকাছি এসে পড়ে। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। একসময় স্বাস্থ্য টাস্থ্য তার ভালই ছিল। এখন হাত-পায়ের মোটা মোটা হাড় ছাড়া বিশেষ কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। চুল উস্কুখুস্কু, তেলহীন।

গালে খাপচা খাপচা দাড়ি। গায়ের রং পোড়া ঝামার মতো। পরনে ছেঁড়া জামা এবং হাফ প্যান্ট। কাঁধে একটা টাঙ্গি। মুখচোখ এবং শরীরের গড়ন বুঝিয়ে দেয়, লোকটা আদিবাসী। খুব সম্ভব অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে সে। কপালে ঘাড়ে তার প্রচুর ঘাম। জামাও ভিজে গায়ের সঙ্গে সেঁটে গেছে। গলা থেকে কালো সুতোয় বাঁধা একটা দস্তার ক্রশ ঝুলছে। বোঝা যায় সে খ্রিস্টান।

নাটোয়ার জিজ্ঞেস করে, 'ডাকছিল কেন ? কিছু বলবে ?'

লোকটা বলে, 'এদিকে কোনো টৌন আছে ?'

বোঝা যায় সে এ অঞ্চলের মানুষ না। নাটোয়ার বলে, 'আছে। তবে ছোটে ছোটে টৌন। টৌনের খোঁজ করছ কেন ?'

লোকটা এবার যা উত্তর দেয় তা এইরকম। সে আসছে সুদূর পশ্চিম থেকে কিছু কাজকর্ম এবং রোজগারের আশায়। ছ'সাত দিন ধরে সে সমানে হাঁটছে। পথে দু-চারটে ছোটখাটো শহর আর গঞ্জ যে পড়ে নি তা নয়। তবে সে সব জায়গায় গিয়ে বিশেষ সুবিধা হয়নি। তাই ক্রমাগত হেঁটে চলেছে সামনের দিকে, যদি কোথাও কামাইয়ের একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়।

কী আশ্চর্য, এই লোকটাও তাদের মতোই কাজ এবং খাদ্যের খোঁজে ভূ পর্যটনে বেরিয়েছে! অবাক হয়ে তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে নাটোয়ার। তারপর জিজ্ঞেস করে, 'কী নাম তোমার ভেইয়া ?'

'বিলসন—বিলসন টোপনো।' লোকটা জানায়।

টোপনো যে ভাষায় কথা বলছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তবে সেটা উত্তর বিহারের এই অঞ্চলে চালু নয়। বলার ভঙ্গিতে অপরিচিত কিন্তু মিঠে একটু টান আছে। নাটোয়ার বলে, 'আমরা একটা গঞ্জে যাচ্ছি। ইচ্ছে হলে আমাদের সঙ্গে আসতে পারো।'

টোপনো উৎসাহিত হয়ে ওঠে, 'হাঁ, হাঁ, জরুর।'

'লেকেন—'

'কী ?'

'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে হেঁটে হেঁটে বহোত থকে গেছ। না জিরিয়ে আর কি হাঁটতে পারবে ?'

'জরুর পারব। তোমাদের পেয়ে ভালই হয়েছে। না হলে কিভাবে যে টৌন খুঁজে বার করতাম কৌন জানে !'

'তবে চল।'

ডান পাশ থেকে চাপা গলায় গোমতী নাটোয়ারকে বলে, 'আমাদেরই কিছু জুটছে না। ওকে আবার সঙ্গে নিচ্ছ কেন?' নতুন এক ভাগীদার জুটে যাওয়ায় সে আদৌ খুশি নয়।

নাটোয়ার হাসে। বলে, 'আরে বাবা, যে যার বরাতে খায়। কামকাজ পাওয়া যাবে কিনা তার ঠিক নেই। চিন্তা নায় করনা—হাঁ।' বলে ফের টোপনোর দিকে তাকায়।

দুশ্চিন্তা কিন্তু কাটে না গোমতীর। ঘোর বিদ্বেষের চোখে টোপনোকে একবার দেখে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

হাঁটতে হাঁটতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে টোপনোর কাছ থেকে অনেক খবর জেনে নেয় নাটোয়ার। ওদের গাঁ জঙ্গলের গা ঘেঁষে। জঙ্গলের কাঠ কেটে, ছোটখাটো নানারকম জানোয়ার মেরে, ঐ অঞ্চলের বড় জমিমালিকের খেতে জনার, আখ ইত্যাদি ফলিয়ে পুরুষ পরম্পরায় তারা জীবন কাটিয়ে আসছিল। কিন্তু জমিমালিকের মাথায় কী খেয়াল চেপেছে, জঙ্গল কেটে চাষের জমি বরবাদ করে ওখানে বড় কারখানা বসাবে। অরণ্যের আদিম বাসিন্দা অর্থাৎ টোপনোদের রুজি রোজগার বন্ধ হয়ে যাতে না যায় সে জন্য কারখানায় নৌকরি দেবে জমিমালিক। সেই অনুযায়ী জঙ্গল সাফ করে উঁচু পাঁচিল দিয়ে সীমানা ঘিরে ফেলা হল। কিন্তু কী জটিল কারণে, টোপনো অন্তত জানে না, কারখানার কাজই শুরু হয়নি। কবে হবে তার ঠিকঠিকানা নেই।

পুরনো জঙ্গল শেষ হয়ে গেছে, কারখানাও হল না, কাজেই ছ'মাস ধরে কামাইও বন্ধ টোপনোদের। ঘরে তার বাপ মা জরু ভাই এবং দুই ছেলেমেয়ে। কামাই করতে না পারলে এতগুলো পেট চলে কী করে? তারা জমিমালিকের কাছে বার বার গেছে, আর্জি জানিয়েছে, তার হাতে পায়ে ধরে রোজগারের ব্যবস্থা করে দিতে বলেছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অগত্যা কিছুদিন নানারকম উঞ্ছবৃত্তি করে চলেছে। তারপর সপ্তাখানেক হল বাপ ভাই আর সে কাজ এবং পয়সার ধান্ধায় তিন দিকে বেরিয়ে পড়েছে। ঘরে রয়েছে জরু, মা আর ছোট ছেলেমেয়ে দুটো।

সাত দিন ধরে টোপনো ঘুরছে। সামান্য দু-চার টাকার কাজ যে সে পাচ্ছে না তা নয় কিন্তু নিজের পেটের দানা জোটাতেই তা শেষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বেশ কিছু পয়সা হাতে না এলে সে ঘরে ফেরে কী করে?

নাটোয়ার আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে। বিষণ্ণ হেসে সে বলে, 'তোমার আর আমাদের হাল একই ভেইয়া—'

বুঝতে না পেরে টোপনো জিজ্ঞেস করে, 'মতলব?'

নিজেদের ঘুরে বেড়াবার উদ্দেশ্যটা জানিয়ে দেয় নাটোয়ার।

টোপনো একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করে, 'সচ!'

নাটোয়ার বলে, 'আরে ভেইয়া, তোমাকে ঝুট বলে আমাদের ফায়দাটা কী?'

'আচ্ছাই হুয়া।' টোপনো বলতে থাকে, 'এখন থেকে একসাথ কোসিস করা যাবে।'

অসুস্থ বীমারী ফকিরাকে তাদের গাঁওয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিতে হয়েছে। তার জায়গায় নতুন এক সহযোদ্ধাকে পেয়ে যায় নাটোয়ারেরা।

কতক্ষণ চারটে মানুষ পাশাপাশি ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটেছিল, তাদের খেয়াল নেই। সূর্য এর মধ্যে অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে। কিছুক্ষণ বাদেই দুপুর হয়ে যাবে।

হঠাৎ দূর থেকে বিলাইতি বাজনায় সেই চেনা সুরটা ভেসে আসতে থাকে, 'বোল রাধা বোল, সঙ্গম হোগা কি নেহীঁ—'

সুরটা শুনেই নাটোয়ার বুঝতে পারেঠ ভেঙে তারা যেখানে এসে পড়েছে সেখান থেকে পাকা সড়ক খুব বেশি দূরে নয়। ভারতমাতা রথ-এর শেষ গন্তব্য যেখানেই হোক, হাইওয়ে দিয়ে সেটাকে যেতেই হবে। আর ফসলের খেত বা পড়তি জমি পেরিয়ে নাটোয়াররা যেদিক দিয়েই যাক না, হাইওয়েটাকে কোনোভাবেই এড়ানো যাবে না। সড়কটা তাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছে। এঁকে বেঁকে, ঘুরে ঘুরে মাঠ শহর এবং টিলার ওপর দিয়ে প্রায় পাশাপাশিই চলেছে।

ভারতমাতা রথ-এর সামনে ব্যান্ডপার্টিওলারা ফিল্মি গানের সুর বাজিয়ে যাওয়ায় বোঝা যায়, তারা হাইওয়ে থেকে কোথায়, কত দূরে রয়েছে।

নাটোয়ার চট করে ভেবে নেয়, বারদিয়ার করাতকলে গিয়ে কাজ জোগাড় করে মজুরি পেতে পেতে সন্ধে হয়ে যাবে। এমনও হতে পারে, কাজ হয়ত জুটলই না কিংবা দু-একদিন অপেক্ষা করতে হল। রথবালাদের যখন হাতের কাছে পাওয়াই যাচ্ছে, দুপুরের খাওয়াটা বরং ওদের ওপর দিয়েই সেরে নেওয়া যাক। করাতকলে কাজ করে কখন পয়সা হাতে আসবে সেই অনিশ্চয়তার ওপর ভরসা করে থাকাটা নেহাতই বোকামি।

নাটোয়ার তার পরিকল্পনার কথা সঙ্গীদের জানিয়ে দেয়। সবারই এতে ষোল আনা সায় রয়েছে। আপাতত এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর হয় না। দুপুরের খাওয়া চুকিয়ে নিঃশব্দে ভরপেটে বারদিয়ায় যাওয়া যাবে।

খানিকটা এগুতেই হাইওয়েতে ভারতমাতা রথ-এর লম্বা মিছিল চোখে পড়ে।

নাটোয়ার সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বলে, 'হোঁশিয়ার, কেউ জুলুসের সামনের দিকে যাবি না, পেছনে ভিড়ের ভেতর ঢুকে পড়বি।'

একটু অবাক হয়ে টোপনো জিজ্ঞেস করে, 'কেন?'

দু'দিন ধরে কিভাবে ভারতমাতা রথবালাদের, বিশেষ করে দুমরলালের সঙ্গে তারা লুকোচুরি খেলছে সেটা জানিয়ে দিয়ে নাটোয়ার বলে, 'দুমরলালজির নজরের বাইরে যত থাকা যায়, আমাদের পক্ষে ততই ভাল। সমঝা?'

টোপনো বেশ চালাক চতুর লোক। বলে, 'অব্ সমঝ গিয়া।'

ভারতমাতা রথ কাছাকাছি এসে গেলে নাটোয়াররা চুপিসারে পেছন দিক দিয়ে মিছিলের ভেতর ঢুকে যায়। আগে থেকে যারা রথ-এর সঙ্গে হেঁটে আসছিল তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারা যায়, সামনে যে গঞ্জটা পড়বে তার নাম ছত্তরপুর। তারানাথজি সেখানে আধারশিলা বসাবেন। দুপুরের ভোজনটা ছত্তরপুরেই করানো হবে।

আধারশিলা বসানো বা শিলান্যাসের ব্যাপারে আদৌ মাথাব্যথা নেই নাটোয়ারের। দুপুরের খাবারটা তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর। এখান থেকে ছত্তরপুর মাইলখানেকও হবে কিনা সন্দেহ। মাত্র একটা মাইল হাঁটা এমন কিছু ব্যাপারই নয়। বলা যায়, একরকম বিনা পরিশ্রমেই বড়িয়া ভোজন জুটে যাবে।

এর আগে আধারশিলা বসানোর উদ্দেশ্যে নানা জায়গায় ভারতমাতা রথ থামানো হলে যা যা ঘটেছে, ছত্তরপুরেও হুবহু তা-ই ঘটে। সেই ফুল, মালা, শাঁখ ইত্যাদি নিয়ে কাতারে কাতারে মানুষের দাঁড়িয়ে থাকা, মহাদেওজির লম্বা বক্তৃতা, দুমরলালের স্লোগান—আনুষ্ঠানিক কোনো ব্যাপারেই বিন্দুমাত্র খুঁত থাকে না।

এখানেও বড় এবং ছোট দুটো প্যান্ডেল রয়েছে। ছোট প্যান্ডেলটার নিচে যথারীতি মহা সমারোহে আধারশিলা বসিয়ে ফেলেন তারানাথ মিশ্র। এই ভিত্তি প্রস্তরটা স্থাপন করা হল একটি দুগ্ধ প্রকল্পের জন্য। এ অঞ্চলের মানুষ, বিশেষ করে শিশুরা যাতে খাঁটি উৎকৃষ্ট দুধ খেতে পারে সে জন্য ডেয়ারি করা হবে। অবশ্যই সে কারণে এ অঞ্চলের মানুষজনকে বিপুল ভোটে তারানাথজিকে জিতিয়ে লোকসভায় পাঠাতে হবে। নইলে আধারশিলা বসানোই সার।

শিলান্যাস অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হওয়ার পর বড় প্যান্ডেলে জুলুসের লোকজনকে খেতে বসিয়ে দেওয়া হয়।

নাটোয়ারের মনে আছে, প্রথম দিন খাওয়ার বেশ কষ্টই হয়েছিল। হাজার কাকুতি মিনতি করেও হারামজাদা দুমরলালটার কাছ থেকে জুতোর চামড়ার মতো চারখানার বেশি চাপাটি আদায় করা যায়নি। কিন্তু তার পর থেকে স্বয়ং তারানাথজি 'ভোজন'-এর তদারকি করছেন। ফলে দুমরলালদের হাতও খুলে গেছে। শুধা চাপাটির জায়গায় এখন গরম ঘিউ-চাপাটি, দু-তিন রকমের তরকারি, আমের আচার, বুন্দিয়া, কলাকন্দ ইত্যাদি অজস্র পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে।

আজও দেখা গেল তারানাথ মিশ্র তিন পত্রকারকে সঙ্গে করে জনগণের 'ভোজন' দেখতে বেরিয়েছেন। ওঁরা রয়েছে প্যান্ডেলের এক মাথায়, আরেক মাথায় লাইন দিয়ে বসে আছে নাটোয়াররা। তাদের সামনে শালপাতার বড় বড় থালা। খাবার দেওয়া শুরু হয়ে গেছে, তবে নাটোয়াররা এখনও পায় নি।

নাটোয়াররা যে লাইনে বসেছে তার সামনে দিয়ে আগে আগে আসছে দুমরলাল। তার পেছন পেছন বিশাল বিশাল বেতের চাঙাড়িতে চাপাটি ভাজি ইত্যাদি বোঝাই করে দুই হট্টাকট্টা চেহারার পহেলবান। চাঙাড়ি থেকে সুখাদ্যগুলি তুলে তুলে জনতার পাতে দিচ্ছে দুমরলাল। একসময় সে নাটোয়ারদের কাছে চলে আসে। চাপাটি দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। ভুরু কুঁচকে নাটোয়ারকে লক্ষ করতে করতে বলে, 'কা রে শালে, সুবে থেকে তোকে দেখিনি। কোথায় গায়েব হয়ে গিয়েছিলি? তোদের না হোঁশিয়ার করে দিয়েছিলাম, জুলুসে পুরা না হাঁটলে 'ভোজন' বন্ধ—'

সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে প্রায় দমবন্ধ গলায় নাটোয়ার বলে, 'জুলুসে আমরা পুরা হেঁটেছি দুমরলালজি। পিছন দিকে ছিলাম বলে দেখতে পাননি।'

এবার একটু খটকা লাগে দুমরলালের। তার মনে হয়, দেহাতীটা হয়ত ঠিকই বলছে। নিজের প্রতাপের ওপর অখণ্ড বিশ্বাস দুমরলালের। তার ধারণা এই সব গেঁয়ো লোকেদের তার সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যে বলার সাহস নেই। আসলে বত্রিশ ঘাটের জল-খাওয়া চতুর নাটোয়ারকে তো সে চেনে না। কাঁচুমাচু মুখে সে নয়কে ছয়, দিনকে রাত করে দিতে পারে। তবু বাজিয়ে নেওয়ার জন্য নাটোয়ারের চোখে চোখ রেখে সে বলে, 'সচ্ বলছিস?'

'জরুর সচ্ দুমরলালজি। রামজি কিষুণজিকা কসম।'।

'ঠিক হ্যায়।'

পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে দুমরলাল নাটোয়ার এবং তার দুই সঙ্গীর থালায় প্রচুর চাপাটি ভাজি টাজি দিয়ে এগিয়ে যায়।

একটা বড় ধরনের ফাঁড়া কেটে যাওয়ায় বেশ আরাম বোধ করে নাটোয়ার। মুখ নামিয়ে মনে মনে হাসতে হাসতে সে খেতে শুরু করে। ভুচ্চর দুমরলালটাকে সে এক হাটে কিনে আরেক হাটে বেচে দিতে পারে।

আগে আগে যা করেছিল এখানেও তা-ই করে নাটোয়ার আর গোমতী। রাত এবং কাল সকালের কথা মাথায় রেখে দু তিনবার করে চাপাটি টাপাটি চেয়ে নিয়ে অনেকটা করে থলেতে পুরে ফেলে।

টোপনো এবং লচ্ছু রথযাত্রার মিছিলে নতুন ঢুকেছে। তারা নাটোয়ারদের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে যায়। নাটোয়ার নিচু গলায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে তারাও কয়েক বার চাপাটি ভাজি চেয়ে নিয়ে বাড়তি খাবারটা সরিয়ে ফেলে। তাদের যা অনিশ্চিত অবস্থা তাতে ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় থাকা ভাল।

একসময় ঘুরতে ঘুরতে তারানাথজিরা নাটোয়ারদের কাছে চলে আসেন। সবার খাওয়া ঠিকমতো হচ্ছে কিনা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিতে থাকেন তিনি। ফাঁকে ফাঁকে পত্রকারদের সঙ্গে কথাও বলে যাচ্ছেন।

'আচ্ছা, আমাদের স্লোগানগুলো কিরকম মনে হচ্ছে আপনাদের?'

'খুব মামুলি। এমন স্লোগান বহুকাল ধরে চলে আসছে।'

'শুনেছি আজকাল শহরে নয়া তরীকার স্লোগান চালু হয়েছে। আপনারা কি এ ব্যাপারে কিছু জানেন?'

এক পত্রকার মুখ টিপে মিচকে হেসে বলে, 'জানি। এক উস্মীদবারের লোকেরা কী স্লোগান দেয় জানেন?'

'কী?' উৎসুক সুরে জিজ্ঞেস করেন তারানাথ।

পত্রকার জানায় সেই উস্মীদবারের নাম অবোধনাথ। ওঁর চুনাও কর্মীরা এভাবে স্লোগান দিয়ে থাকে, 'যিতনা রোজ চাঁদ সুরয রহেগা,উতনা দিন অবোধনাথ তেরা নাম রহেগা', 'অবোধনাথকো ভোট দেনেসে ক্যা হোগা? দেশ বচেগা, গরিবি হটেগা,' ইত্যাদি।

শুনতে শুনতে মুখচোখ চকচক করতে থাকে তারানাথের। তিনি বলেন, 'এরকম জোরালো স্লোগান আমার দরকার। দয়া করে যদি লিখে দেন বড় ভাল হয়—'

পত্রকারটি বলে, 'আমি একজনের ঠিকানা দিয়ে দেবো। লোকটা কবিতা লেখে আর চুনাও-এর সময় উস্মীদবারদের নয়া নয়া স্লোগান বানিয়ে সাপ্লাই দেয়। আমি যে স্লোগানগুলো বললাম, পিছলে চুনাওতে এসব ইস্তেমাল হয়ে গেছে। আপনি পাটনায় লোক পাঠিয়ে ঐ কবিতা লিখনেবালার কাছ থেকে তাজা চমকদার স্লোগান লিখিয়ে আনুন। তবে—'

'তবে কী?'

'কী'মৎ একটু বেশি পড়বে।'

'দামের জন্যে চিন্তা করবেন না। রথযাত্রা শেষ হলেই আমি পাটনায় লোক পাঠিয়ে দেবো।' আজই ঠিকানাটা লিখে দেবেন।'

'ঠিক হ্যায়—'

কথা বলতে বলতে তারানাথরা দূরে চলে যান।

॥ পনেরো ॥

নাটোয়ারদের খাওয়া শেষ হ'তে হ'তে বেলা হেলে যায়। তারপর আর এক মুহূর্তও বসে না তারা। যাদের নিয়ে সবচেয় বড় দুর্ভাবনা সেই দুমরলালকে ধারেকাছে দেখা যাচ্ছে না। এধার ওধার তাকিয়ে নাটোয়াররা চুপচাপ প্যান্ডেল থেকে বেরিয়ে পড়ে।

কাছাকাছি বিরাট বিরাট চেহারার ক'টা পিপর গাছ গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। নাটোয়ারেরা চট করে প্রথমে গাছগুলোর আড়ালে চলে যায়। সেখান থেকে বুঝতে চেষ্টা করে, কেউ তাদের লক্ষ করছে কিনা। কিন্তু না, জুলুসের লোকজনেরা গলা পর্যন্ত বোঝাই করে এখন টান টান শুয়ে পড়েছে, তাদের নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। দুমরলাল, পত্রকার বা রথযাত্রার অন্য উদ্যোক্তাদেরও দেখা যাচ্ছে না। খুব সম্ভব প্রচণ্ড খাটাখাটনির পর খেয়েদেয়ে তারা ছোট প্যান্ডেলটায় গিয়ে এখন জিরোচ্ছে।

একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে নাটোয়ারেরা সোজা হাইওয়েতে গিয়ে ওঠে। বড় সড়ক পেরিয়ে ওধারের মাঠে নেমে তাদের বরাবর পশ্চিম দিকে হাঁটতে হবে। নাটোয়ারের ধারণা, সন্ধের আগে আগেই তারা বারদিয়া পৌঁছুতে পারবে। দু'বেলার মতো খাবার তাদের সঙ্গে রয়েছে। আজ কাজের ব্যবস্থা যদি না-ও হয়, কাল দুপুর পর্যন্ত তারা চালিয়ে নিতে পারবে। আর শোওয়ার জায়গা? অত বড় বারদিয়া গঞ্জে কোথাও না কোথাও রাতটা নিশ্চয়ই কাটিয়ে দেওয়া

যাবে।

মাঠে নেমে খানিকটা যেতে না যেতেই ফের আকাশের চেহারা পালটে যেতে থাকে। সকাল থেকে আজ ছিল চমৎকার ঝলমলে রোদ। কিন্তু কখন যে আকাশের কোণায় কোণায় ফের মেঘ জমতে শুরু করেছিল আগে কেউ লক্ষ করেনি।

এখনও যথেষ্টই বেলা রয়েছে। কিন্তু মেঘে রোদ অনেকটা ঢাকা পড়ে যাওয়ায় ঘন হয়ে ছায়া নামছে চরাচরের ওপর।

চলতে চলতে চোখের ওপর হাতের আড়াল দিয়ে একবার ওপরে তাকায় নাটোয়ার। চিন্তিতভাবে বলে, 'শালের আসমান বড়িয়া খেল্ দেখাচ্ছে তো।'

টোপনো বলে, 'হাঁ। মনে হচ্ছে কালকের মতো আজও বারিষ নেমে যাবে।'

'জোরসে পা চালাও—'

মাইল দেড়েক হাঁটার পর সমতল মাঠের সীমানায় উঁচু নিচু বেশ কিছু টিলার সামনে এসে পড়ে নাটোয়াররা। দূরে দিগন্তের গা ঘেঁষে আবার সেই পাহাড়ের রেঞ্জটা দেখা যাচ্ছে।

টোপনো যা আন্দাজ করেছিল সেটাই ঘটে যায়। এর মধ্যে আকাশের ছন্নছাড়া মেঘগুলো জমাট বেঁধে সূর্যটাকে পরোপুরি ঢেকে ফেলেছে। হাওয়ার জোর হঠাৎ ভীষণ বেড়ে যায় এবং ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করে।

নাটোয়ার এধারে ওধারে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে বলে, 'নজদিগ কোনো গাঁও টাও দেখছি না, হাটিয়া কি বাজার ভি নেহীঁ। কোথায় যে মাথা গুঁজব!'

'দৌড়ো—দৌড়ো—'

ছুটতে ছুটতে একটা বড় টিলার ঢাল বেয়ে ওরা যখন নিচে নামছে সেই সময় বহু মানুষের ভয়ার্ত চিৎকার কানে ভেসে আসে। এবার ডান দিকে, দূরে একটা গাঁ দেখা যাচ্ছে। নাটোয়ারদের চোখে পড়ে বহু মানুষ সেখানে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছোটাছুটি করছে।

নামতে নামতে থমকে দাঁড়িয়ে যায় নাটোয়ার। তার দেখাদেখি বাকি তিনজনও। নাটোয়ার বলে, 'কা হুয়া? লোকগুলো অত চেঁচাচ্ছে কেন?'

টোপনো বলে, 'কৌন জানে!'

'জরুর কিছু ঝামেলা হয়েছে। চল তো, দেখা যাক।'

গোমতী চিন্তিতভাবে বলে, 'কী দরকার পরের ঝঞ্ঝাটে মাথা ঢুকিয়ে? আমাদের নিজেদেরই ঝামেলার শেষ নেই।'

নাটোয়ার বোঝায়, তেমন গোলমাল দেখলে কোনোভাবেই তারা নিজেদের জড়াবে না। আসলে বৃষ্টির ব্যাপারটা তাদের সবার মাথায় রাখা দরকার। ওখানে যখন একটা গাঁ দেখা যাচ্ছে, মাথা গোঁজার আশ্রয় নিশ্চয়ই মিলবে। নইলে এই খোলা আকাশের নিচে বেঘোরে ভেজা ছাড়া উপায় নেই।

ঠিকই বলেছে নাটোয়ার। বৃষ্টিটা তেড়েফুঁড়ে নামার উপক্রম না করলে ঐ গাঁটাকে এড়িয়ে গেলেও চলত কিন্তু এখন আর উপায় নেই।

টোপনো বলে, 'চল তা হলে—'

ওরা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে সেই লোকগুলোর কাছে চলে আসে। ছেলেবুড়ো বাচ্চাকাচ্চা পুরুষ মেয়েমানুষ মিলিয়ে বিশাল জনতা কপাল চাপড়ে, সমানে সমস্বরে চিৎকার করছে, 'হো রামজি, হো কিষুণজি—বচাও, বচাও হামনিলোগনকো—' তাদের চোখেমুখে মারাত্মক ভয় এবং আতঙ্ক।

চারপাশে নোংরা বালিশ, চিটচিটে ময়লা কাঁথা, অজস্র বাসন কোসন, টিনের বাক্স, জামাকাপড়ের বোঁচকা, চাল-ডাল, গেঁহু, হাল-লাঙল ইত্যাদি জড়াকার পড়ে আছে। আর আছে বেশ কিছু ছাগল, গরু এবং বয়েল গাড়ি। বোঝা যায়, কোনো কারণে লোকগুলো যে যেমন পেরেছে নিজেদের পার্থিব সব সম্পত্তি টেনে এনে এখানে ডাঁই করে রেখেছে।

সবচেয়ে বেশি করে কপাল আর বুক চাপড়াচ্ছিল একটা আধবয়সী লোক। দেহাতী হলেও তার চেহারা এবং পোশাক আশাক বুঝিয়ে দিচ্ছে সে বেশ পয়সাওলা। লোকটা একটানা চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'যে গাঁও বাঁচাতে পারবে তাকে শ'ও দেশ' পাঁচ শ', হাজার—যেত্তে রুপাইয়া চাইবে—দেবো। কোসিস করো তোমরা, কোসিস করো। হো গণাইয়া, হো মাখ্‌খন, হো ধারোয়া তোমরা দাঁড়িয়ে থেকো না।'

এমন এক আবহাওয়ার মধ্যে কেউ এসে পড়লে তার প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। উৎকণ্ঠিত নাটোয়ার জনতার উদ্দেশে বলে, 'কা হুয়া ভেইয়া?' কী হয়েছে তোমাদের?'

কেউ নাটোয়ারের কথার উত্তর দেয় না, এমন কি তার দিকে ফিরেও তাকায় না।

বার কয়েক একই প্রশ্ন করার পর একটা রোগা চিমড়ে চেহারার লোক সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে, 'ঐ দেখো—'

আগে লক্ষ করেনি নাটোয়ার, এবার তার চোখে পড়ে অনেকটা দূরে, প্রায় এক শ' হাত উঁচুতে বিপুল এক জলাধার—খুব সম্ভব বিলই হবে। কম করে

সিকি মাইল জায়গা জুড়ে সেটার বিস্তার।

নাটোয়াররা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে বিলটাকে বেড় দিয়ে পাথরের বাঁধ, সেটার উঁচু পার ডান পাশ ঘুরে উলটো দিকে চলে গেছে।

বিলের এ পাশটা দেখা গেলেও ও দিকটা চোখে পড়ে না। তবে সে ধার থেকে জনতার চিৎকার ছাপিয়ে তোড়ে জল পড়ার আওয়াজ ভেসে আসছে। এই আওয়াজটা অনেকক্ষণ ধরেই তাদের কানে আসছিল তবে এখানকার মানুষজনের হাল এবং চারপাশের লণ্ডভণ্ড অবস্থা দেখে সেভাবে খেয়াল করেনি। এবার কান খাড়া করে বেশ খানিকক্ষণ শব্দটা শোনে নাটোয়ার, তারপর চিন্তিতভাবে জিজ্ঞেস করে, 'কা ভেইয়া, ওধারের বাঁধ কি ভেঙে পড়েছে?'

রোগা লোকটা মাথা নেড়ে সন্ত্রস্ত সুরে বলে, 'হাঁ। সে আরো জানায়, দূরে যে পাহাড়টা রয়েছে সেখান থেকে একটা ছোট নদী এসে বিলে মিশেছে। সারা বছর নদীটা নির্জীব পড়ে থাকে। তবে বর্ষায় তার চেহারা বিলকুল পালটে যায়। পাহাড়ের মাথা থেকে প্রবল জলস্রোত টেনে এনে নদীটা বিলে ঢল নামিয়ে দেয়। তবে কোনো বারই বাঁধ উপচে এক ফোঁটা জল নিচে পড়ে না। কিন্তু এ বছর নিতান্ত অসময়ে, মাত্র একদিনের বৃষ্টিতে নদী খেপে গিয়ে বিলে এত জল টেনে এনেছে যে ওধারের বাঁধের দেয়াল তার ধাক্কা সামলাতে পারে নি; আজ ভোরে সেটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছে।

আসল গাঁটা বিলের ওধারে। এ পাশেও সামান্য কিছু বাড়িঘর রয়েছে। বাঁধ ভাঙার পর প্রাণ বাঁচাতে গাঁওবালারা এদিকে ছুটে এসেছে। মালপত্র বিশেষ কিছুই আনা সম্ভব হয়নি। ঘরবাড়ি এবং সারা জীবনের সঞ্চয়ের প্রায় সমস্তটাই ওধারে ফেলে আসতে হয়েছে।

সবাই হা-হুতাশ আর গোঙানির মতো আওয়াজ করে একটানা কাঁদছিল। তার মধ্যে সেই লোকটা সমানে উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে যাচ্ছে। 'যেত্তে রুপাইয়া লাগে আমি দেবো। গাঁও বচাও—'

নাটোয়ার জিজ্ঞেস করে, 'ঐ আদমীটা কে? মনে হচ্ছে বহোত পাইসাবালা?'

রোগা লোকটা আস্তে মাথা নাড়ে। বলে, 'হাঁ।' সে বিশদভাবে জানিয়ে দেয় ঐ পয়সাওলা লোকটি অর্থাৎ মহাবীরজি এ অঞ্চলের সব চেয়ে বড় ব্যবসাদার। চারপাশের গ্রামগুলোতে যত ধান গম ডাল সর্ষে ফলে তার বেশির ভাগটাই শস্তায় কিনে বড় বড় গুদামে বোঝাই করে রাখে। তারপর বেমরসুমে

দাম চড়লে সে সব বেচে দেয়। মহাবীরজির যে কত পয়সা সে নিজেও জানে না। পঞ্চাশটা বয়েল গাড়ি আছে তার, গরু মোষ বকরি মিলিয়ে শ'খানেক প্রাণীর সে মালিক। বাড়িও সাত আটটা। তা ছাড়া প্রচণ্ড ক্ষমতাবানও লোকটা, গ্রাম-পঞ্চায়েতের মাথা। পুলিশের দারোগা থেকে শুরু করে বড় বড় সরকারি 'অফসরে'রা তাকে যথেষ্ট খাতিরদারি করে থাকে। এই এলাকায় তাকে বাদ দিয়ে কিছু হওয়ার উপায় নেই। তার কথাই শেষ কথা।

মহাবীরজি যে অমন আকুলভাবে চিৎকার করে যাচ্ছে তার কারণ একটাই। বিলের ওধারে তার কুড়িটা গুদাম ধান চাল গেঁহু ইত্যাদিতে বোঝাই হয়ে আছে। অজস্র টাকা লগ্নি করে গেল বছর ফসলের মরসুমে ওগুলো কিনে রেখেছিল সে কিন্তু এবার খরায় চড়া দামে বেচার আগেই বাঁধ ভেঙে সর্বনাশ ঘটে গেল। জলে ডুবে গিয়ে তার সব মজুদ ফসল বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে এতবড় ক্ষতি হ'তে দেখলে লোক পাগলের মতো চিৎকার তো করবেই।

গোমতীরা পাশে দাঁড়িয়ে দু'জনের কথা শুনছিল। টোপনো চাপা গলায় নাটোয়ারকে খানিক দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে, 'ভেইয়া, পাইসা কামানোর একটা বড় মওকা এসে গেছে।' তার গলার স্বরে রীতিমত উত্তেজনা ফুটে বেরোয়।

বেশ অবাক হয়েই নাটোয়ার জিজ্ঞেস করে, 'কিরকম?'

মহাবীরকে দেখিয়ে টোপনো বলে, 'ও আদমী গাঁও বাঁচাতে পারলে বহোত রুপাইয়া দিতে চাইছে। আমরা একবার কোসিস করে দেখি না।'

'ক্যায়সে?'

'বাঁধটা যেখানে ভেঙেছে সেই জায়গাটা মেরামত করতে পারলে গাঁও বাঁচানো যায়।'

'তোমার মাথা বিলকুল খারাপ হয়ে গেছে।'

'আরে ভেইয়া, আগে তো দেখি বাঁধ কোথায় কতটা ভেঙেছে। যদি বুঝি মেরামত করা যাবে না তখন না হয় আশা ছেড়ে দেবো।'

নাটোয়ারের এবার মনে হয়, গোড়াতেই হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। একবার চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কী? সে বলে, 'ঠিক হ্যায়।'

টোপনো বলে, 'তার আগে মহাবীরজির সঙ্গে বাত পাক্কা করে নেওয়া দরকার। কাজ হয়ে যাওয়ার পর যদি পাইসা দিতে না চায়—'

বোঝা যায়, টোপনো তাদের মতোই বারো ঘাটের জল-খাওয়া দূরদর্শী

মানুষ। কাজ করার পর ঠকে যাওয়ার প্রচুর খারাপ অভিজ্ঞতা তার রয়েছে। এমন হুঁশিয়ার লোকের সঙ্গে কাজ করে আনন্দ আছে। নাটোয়ার বলে, 'ঠিক বাত। চল, কথা বলে নিই।'

মহাবীরের সঙ্গে মুখে মুখে তাদের একটা চুক্তি হয়ে যায়। গ্রামের তাবত মানুষ তার সাক্ষী থাকে। মহাবীর সবার সামনে জানিয়ে দেয়, ভাঙা বাঁধ জোড়া লাগিয়ে গাঁও এবং তার গুদামগুলি বাঁচাতে পারলে তৎক্ষণাৎ নগদ একটি হাজার টাকা নাটোয়ারদের দেবে। ভগোয়ান রামজি এবং কিষুণজির কসম, তার কথার এতটুকু নড়চড় হবে না। তবে হাজার চেষ্টা করেও যদি জলের তোড় আটকাতে না পারে একটা পয়সাও পাবে না নাটোয়ারেরা।

মহাবীরের শর্তের সঙ্গে নাটোয়ার ভেবেচিন্তে আরেকটু জুড়ে দেয়। বাঁধ মেরামতির কাজে দরকার হলে গাঁওবালাদেরও হাত লাগাতে হবে।

জনতা জানিয়ে দেয়, নাটোয়াররা যা করতে বলবে তাতেই তারা রাজী। টোপনো নাটোয়ারকে বলে, 'চল ভেইয়া, আগে বাঁধটা ভাল করে দেখি।' গোমস্তী আর লচ্ছু সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। নাটোয়াররা নেয় না। আপাতত তাদের এখানে অপেক্ষা করতে বলে দু'জনে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

ঝির ঝির করে জল ঝরেই যাচ্ছে। আকাশের ভাবগতিক দেখে এখন মনে হয়, জোরালো বৃষ্টি না-ও হ'তে পারে। কেননা যে মেঘেরা জমাট বেঁধে ছিল, প্রবল হাওয়ায় আস্তে আস্তে সেগুলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। বিল বা হ্রদ, যাই বলা যাক, সেখানে পৌঁছুতে হলে টিলা বেয়ে ওপরে উঠতে হবে। কালকের প্রচণ্ড বৃষ্টিতে টিলার গা ভিজে পিছল হয়ে আছে। সন্তর্পণে, নরম কাদায় পায়ের আঙুল গিঁথে গিঁথে টোপনো আর নাটোয়ার ওপরে পৌঁছে যায়।

বিলটা কানায় কানায় না হলেও বারো আনার মতো ভর্তি। তার ওপর দূরের পাহাড়ী নদীটা বিপুল শক্তিতে জল টেনে এনে সেখানে অনবরত ঢেলে যাচ্ছে।

বিল ঘিরে যে পাথরের বাঁধটা রয়েছে সেটা কতকাল আগের তৈরি কে জানে। খুব সম্ভব ওটার বয়স পঞ্চাশ, ষাট বা তারও বেশি। জলের ধাক্কায় ডান পাশে, সেটা ভেঙে দু'শ হাতের মতো একটা ফোকর তৈরি হয়ে গেছে। প্রচণ্ড গর্জনে সেখান দিয়ে ঢল নেমে নিচের গ্রামটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

গ্রামটা এখন প্রায় এক মানুষ অর্থাৎ তিন সাড়ে তিন হাত জলের তলায়। নিচু ঘরগুলো আধাআধি ডুবে গেছে, নইলে ধসে পড়েছে। উঁচু বাড়িগুলোতেও প্রচুর জল ঢুকে গেছে।

পলকহীন তাকিয়ে তাকিয়ে কিছুক্ষণ নিচের দিকে নেমে-যাওয়া জলস্রোত লক্ষ করে নাটোয়ার, তার একটানা গজরানি শুনতে থাকে। তার পর আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বলে, 'নেহীঁ সাকেগা ভেইয়া—'

টোপনো তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কী পারবে না?'

বাঁধের ফোকরটা দেখিয়ে নাটোয়ার বলে, 'কতটা জায়গা ভেঙেছে, দেখেছ?'

'হাঁ, দেখেছি তো।'

'কত জোরে জল পড়ছে ভাবতে পার?'

'হাঁ, বহোত জোরে।'

'এই বাঁধ আমরা মেরামত করতে পারব!'

নাটোয়ার কোনো ব্যাপারেই হতাশ হয় না। তার যা জীবন তাতে এত বছর টিকে থাকাটাই একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা। অনন্ত আশা এবং অদম্য সাহস তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে টোপনো তার চেয়েও অনেক বেশি সাহসী আর আশাবাদী। সে বলে, 'তোমাকে তো আগেই বলেছি, কোসিস করতে হবে।'

বিমূঢ়ের মতো নাটোয়ার জিজ্ঞেস করে, 'কিভাবে?'

টোপনো যা উত্তর দেয় তাতে বোঝা যায়, বাঁধ মেরামতের পদ্ধতি সে জানে। বস্তায় করে প্রচুর বালি এবং পাথরের চাংড়া বাঁধের ভাঙা জায়গায় ফেলে ফেলে ওদিকটা বন্ধ করে দিতে হবে। ফোকর বুজিয়ে দিতে পারলে পুরোপুরি তলিয়ে যাবার হাত থেকে গাঁ-টাকে রক্ষা করা যাবে। এভাবে নাকি আগেও সে অনেক ভাঙা বাঁধ মেরামত করেছে।

টোপনো বলে, 'চল, গাঁওবালাদের বলি বস্তা বোঝাই করে করে বালি আর পাথর তুলে দিক।'

কিন্তু গাঁয়ের লোকেরা নিজেদের মালপত্র যেটুকু বাঁচিয়ে এধারে আনতে পেরেছে তার মধ্যে দু চারটের বেশি বস্তা পাওয়া যায় না। তা ছাড়া এ অঞ্চলে বালিও নেই। তবে চারিদিকে নানা মাপের অজস্র পাথরের চাঁই ছড়িয়ে আছে।

এতক্ষণ অসহায় জনতা শুধুই হা-হুতাশ করছিল, নিরুপায় হয়েই তারা চরম সর্বনাশ মেনে নিয়েছিল। কিন্তু গাঁ বাঁচানোর একটা পথ পেয়ে সবাই বিপুল উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হাতে হাতে তারা পাথর ওপরে তুলে দিতে থাকে।

তাদের সঙ্গে গোমতী আর লচ্ছুও হাত মেলায়।

বাঁধটা যেখানে ভেঙেছে তার কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে দুঃসাহসী টোপনো, তার ঠিক পেছনে নাটোয়ার। গাঁওবালারা টিলার নিচে থেকে ওপর পর্যন্ত পর পর দাঁড়িয়ে গেছে। পাথরের চাঁই একজনের হাত থেকে আরেক জনের হাত ঘুরে টোপনোর কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। সে সেগুলো বাঁধের ভাঙা জায়গায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে থাকে। কিন্তু জলের যা তোড় তাতে কত পাথর ফেলতে হবে, কে জানে।

গাঁয়ের লোকেরা অনবরত পাথরের চাঁই বয়ে আনছে আর সমানে বলে যাচ্ছে, 'হো রামজি, হো কিষুণজি, তেরে কিরপা—'

ঘন্টাখানেক পাথর ফেলার পরও বাঁধের ফোকর বোজার লক্ষণ নেই। এক শ' হাত নিচের গ্রামে সমানে জলস্রোত প্রবল গর্জনে নেমে যাচ্ছে।

পেছন থেকে নাটোয়ার ক্লান্ত স্বরে অনিশ্চিতভাবে বলে 'ভেইয়া, যতই পাথর ঢালো কিছুই হবে না। পানির কী তাকত দেখেছ?'

আত্মবিশ্বাসে খানিকটা বোধ হয়, চিড় ধরে গিয়েছিল টোপনোর। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে সে বলে, 'হাঁ, বহোতা তাকত। আরো কিছুক্ষণ পাথর ফেলে দেখি।'

কিন্তু আরো দশ বারটা পাথরের চাঁই ফেলার পর মারাত্মক ব্যাপারটা ঘটে যায়। টোপনো যেখানে দাঁড়িয়ে আছে বাঁধের সেই অংশটার তলায় জল ঢুকে ঢুকে আগেই গাঁথনি আলগা করে ফেলেছিল। আচমকা অনেকটা জায়গা ধসে যায় এবং প্রবল জলস্রোতে একশ' হাত নিচে ছিটকে পড়ে টোপনো। একবারই তার বুক ফাটানো চিৎকার ভেসে আসে, 'বচাও, বচাও—' তারপর আর তাকে দেখা যায় না, ওপর থেকে যে ঢল তোড়ে নেমে যাচ্ছিল তার ভেতর সে পলকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

চোখের সামনে এমন একটা ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে দেখতে সবার শ্বাস আটকে গিয়েছিল। গোটা এলাকা জুড়ে কিছুক্ষণের জন্য অলৌকিক স্তব্ধতা নেমে আসে। বাঁধভাঙা ঢলের হিংস্র গজরানিও যেন কেউ শুনতে পাচ্ছিল না।

তারপর একসময় হুলস্থুল শুরু হয়ে যায়। বিহ্বল ভয়ার্ত জনতা চিৎকার করতে থাকে।

'গির গিয়া রে, গির গিয়া—'

'মর গিয়া, জরুর মর গিয়া—'

নাটোয়ার নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। আতঙ্কগ্রস্তের মতো সে দাঁড়িয়ে ছিল। গাঁওবালাদের চেঁচামেচিতে তার সারা শরীরে যেন তীব্র ঝাঁকুনি লাগে। বাঁধ থেকে নেমে টিলার ঢাল বেয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো সে ডুবন্ত গ্রামের দিকে নেমে যায়। তার উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার, জল থেকে টোপনোকে উদ্ধার করে আনা।

গোমতী ভীত সুরে চেঁচিয়ে ওঠে, 'মাত্ যাও, মাত্ যাও—'

একজন তো ভেসে গেছেই। আরেকজন যেভাবে সেখানে নেমে যাচ্ছে সেটাকে গ্রামের লোকজনের কাছে ভয়ঙ্কর হঠকারিতা বলে মনে হয়। গোমতীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে তারাও নাটোয়ারকে এ ঝুঁকির ব্যাপারে বার বার হুঁশিয়ারি দিতে থাকে।

কিন্তু নাটোয়ার ফিরেও তাকায় না। অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে সে নেমেই যায়। অগত্যা লচ্ছুকে টিলার মাথায় দাঁড় করিয়ে রেখে গোমতী নাটোয়ারের পেছন পেছন উতরাই বেয়ে নামতে থাকে। নাটোয়ারকে একা সে যেতে দিতে পারে না।

নিচে ডুবে-যাওয়া গ্রামে স্রোত বয়ে যাচ্ছে। একসময় দেখা যায়, একটি পুরুষ আর একটি মেয়েমানুষ সেই স্রোতের ভেতর ডুব দিয়ে দিয়ে আতিপাঁতি করে টোপনোকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কোথাও নেই টোপনো। জলের টানে তার শরীর কোথায় কতদূরে ভেসে গেছে, কে জানে।

কিন্তু নাটোয়াররা যেন জেদই ধরেছে যেভাবে যেখান থেকে হোক টোপনোকে খুঁজে বার করবেই। অন্ধের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে একবার তারা স্রোতের ওপর ভেসে উঠছে, পরক্ষণে তলিয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ দু'জনে দূরে, আরো দূরে চলে যেতে থাকে। এর মধ্যে নাটোয়ার এক আধবার গোমতীকে ফিরে যেতে বলেছিল কিন্তু নাটোয়ারকে ছেড়ে সে কিছুতেই যাবে না।

গাঁয়ের সমস্ত লোক বাঁধের পাশের উঁচু জায়গায় উঠে এসেছে। দুর্বোধ্য গলায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তারা সমানে কী বলে যাচ্ছে দূর থেকে তা আদৌ বুঝতে পারে না নাটোয়াররা।

প্রায় ঘন্টা দুয়েক জল তোলপাড় করার পর 'রশি'খানেক দূরে টোপনোকে যখন পাওয়া যায়, সে আর বেঁচে নেই। ওপর থেকে খুব সম্ভব পাথরের ওপর ছিটকে পড়েছিল। তার ঘাড় একেবারেই ভেঙে গেছে, মাথা থেঁতলে ডান দিকটা চুরমার, ডান চোখটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে।

জলস্রোতের ভেতর দিয়ে কিভাবে যে টেনে টেনে নাটোয়ার আর গোমতী টোপনোর মৃতদেহ টিলার ওপর নিয়ে আসে, তা শুধু তারাই জানে। বেহুঁশের মতো বেশ কিছুক্ষণ তারা টোপনোর কাছে পড়ে থাকে।

এদিকে জনতা নাটোয়ারদের কাছে দৌড়ে আসে। অচেনা ক'টি মানুষ আচমকা কোত্থেকে এসে প্রায় অযাচিতভাবেই তাদের গাঁ বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু ওদের একজন কী ভয়ঙ্করভাবেই না মারা গেল! টোপনোর শোচনীয় মৃত্যু গাঁওবালাদের অভিভূত করে ফেলে। সমস্ত এলাকাটা জুড়ে গভীর বিষাদ যেন অনড় হয়ে থাকে।

একসময় ধকল কিছুটা সামলে নিয়ে উঠে বসে গোমতী আর নাটোয়ার। মাত্র একদিনের পরিচয় টোপনোর সঙ্গে। লোকটার মধ্যে এমন একটা আপন-করা ব্যাপার ছিল যাতে মনে হয়েছে সে তাদের বহুকালের চেনা। তা ছাড়া ঘরবাড়ি ছেড়ে একই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ কাজের খোঁজে খাদ্যের খোঁজে তারা যে বেরিয়ে পড়েছিল সেই বিরামহীন অনন্ত যাত্রায় টোপনো ছিল তাদের বিশ্বস্ত সঙ্গী। তার এমন শোকাবহ অভাবনীয় মৃত্যু গোমতী এবং নাটোয়ারের বুকের ভেতরটা ভেঙেচুরে দুমড়ে মুচড়ে দিতে থাকে।

জনতার ভেতর থেকে সেই পয়সাওলা লোকটা অর্থাৎ মহাবীরজি ভারী গলায় নাটোয়ারকে জিজ্ঞেস করে, 'লোকটা যে এভাবে মারা যাবে, ভাবতে পারি নি। ও তোমাদের কেমন রিস্তেদার?'

নাটোয়ার আচ্ছন্নের মতো মাথা নাড়ে। বলে, 'কেউ না।'

'তা হলে?' একটু অবাক হয়েই তাকায় মহাবীর।

টোপনোর সঙ্গে কোথায় কিভাবে তাদের আলাপ হয়েছিল, জানিয়ে দেয় নাটোয়ার।

একটু চুপ করে থাকে মহাবীর। তারপর চিন্তিতভাবে বলে, 'বহোত মুসিবত। ওদের ঘর কোথায়?'

'জানি না।'

'সে কী!'

'টোপনো বলেছিল অনেক দূরে পশ্চিম দিকে ওদের ঘর। গাঁওয়ের নাম, তালুক—এসব কিছুই জানায়নি। আমিও জানতে চাইনি। সোচা থা, কা জরুরত? দো-চার রোজ একসাথ আছি, তারপর যে যার ঘরে ফিরে যাব। আর হয়ত দেখাই হবে না। তবে—'

'কা?'

'ওর মা-বাপ জরু আর দুটো বাচ্চা আছে।'

'বহোত আপসোসকা বাত। লেকেন ওদের কাছে মৌতের খবর কী করে দেওয়া যায়?'

ডাইনে-বাঁয়ে ধীরে ধীরে মাথা হেলিয়ে নাটোয়ার বলে, 'কোনো উপায় নেই মহাবীরজি।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

এবার মহাবীর যা বলে তা এইরকম। মড়া তো এভাবে ফেলে রাখা যায় না। টোপনোর অন্তিম সংস্কার অর্থাৎ শেষ কৃত্য করা দরকার। সে আরো যা বলে সেটা রীতিমত অস্বস্তিকর। এরকম দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর পুলিশকে জানানো উচিত। যদিও থানার লোকেরা তাকে খাতির করে কিন্তু মৌত বলে কথা! পুলিশকে সব সময় বিশ্বাস করা কাজের কথা নয়। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। জবাবদিহি করতে করতে জিভ বেরিয়ে যাবে। কে জানে, এই কারণে গাঁ-কে গাঁ ওরা ফাঁসিয়ে দেবে কিনা।

চট করে লচ্ছুর বাপের কথা মনে পড়ে যায় নাটোয়ারের। তার বিশ্বাস, পুলিশের এক শ' মাইলের ভেতর ঘেঁষাটা এমনিতেই বাঞ্ছনীয় নয়। তার ওপর অপঘাত বা দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। লচ্ছুর বাপের মতোই পুলিশের অগোচরে টোপনোর শেষ কাজটি চুকিয়ে ফেলা প্রয়োজন। নাটোয়ার সেই কথাটাই মহাবীরকে জানিয়ে দেয়।

সকাল থেকে ঝির ঝির করে যে ঘ্যানঘেনে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল সেটা থেমে গেছে। মহাবীর বলে, 'তা হলে চিতার ব্যবস্থা করে ফেলতে বলি।'

নাটোয়ার চমকে উঠে জানায়, টোপনো খ্রিস্টান। তার গলার ক্রসটা তার চোখে পড়েছে আগেই। টোপনোর অন্তিম সংস্কার করতে হবে ওর ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী।

কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, গাঁয়ের লোকেরা ধরাধরি করে টোপনোর দেহ বাঁধের ওধারে নামিয়ে নিয়ে এসেছে।

মহাদেও-এর নির্দেশ অনুযায়ী কয়েকজন একটা কবর খুঁড়ে ফেলে। তারপর টোপনোকে তার ভেতর শুইয়ে মাটি চাপা দেওয়া হয়। সমস্ত গাঁয়ের লোক কবরের চারপাশে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে সসম্মানে এই পৃথিবী থেকে তাকে চিরকালের মতো বিদায় দেয়।

একধারে চুপচাপ হাঁটুতে থুতনি রেখে বসে ছিল গোমতী, নাটোয়ার এবং লচ্ছু। গোমতী আর লচ্ছু সমানে কেঁদে যাচ্ছে। এমন যে

নাটোয়ার—গোঁয়ার, একগুঁয়ে, জেদী—বেঁচে থাকার জন্য যাকে সারা দুনিয়া তোলপাড় করে বেড়াতে হয়, জীবনের নানা অভিজ্ঞতা যার মনকে প্রায় নিস্পৃহ এবং কঠোর করে তুলেছে তার চোখও জলে ভরে যেতে থাকে।

॥ ষোল ॥

ভাঙা বাঁধের এধারে যে সামান্য ক'টি ঘর অটুট রয়েছে তার একটাতে কোনোরকমে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়ে নাটোয়াররা। এখান থেকে তারা সোজা বারদিয়ায় যাবে।

বেঁচে থাকার লড়াইয়ে নাটোয়ারের বহুকালের সহযোদ্ধা ফকিরাকে আগেই ট্রাকে তুলে ফেরত পাঠিয়ে দিতে হয়েছে। মাত্র একদিনের পরিচিত দ্বিতীয় সহযোদ্ধা টোপনোকে এক অখ্যাত গ্রামে মাটির নিচে রেখে যেতে হয়। টোপনোর শোকাবহ মৃত্যু কাল তাকে অভিভূত করে ফেলেছিল। কিন্তু মানসিক দুঃখ, শোকের উচ্ছ্বাস ইত্যাদি নিয়ে বসে থাকলে তাদের চলে না। একটা রাতের মধ্যেই টোপনোর মৃত্যুজনিত বিহ্বলতা কাটিয়ে ফেলেছে তারা।

শর্ত অনুযায়ী একটি পয়সাও দেয়নি মহাবীর। মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে নাটোয়াররা কাল গাঁ বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল। হট্টাকট্টা চেহারার জলজ্যান্ত দুঃসাহসী একটা মানুষকে প্রাণও দিতে হয়েছে এই কারণে কিন্তু আসল কাজটা শেষ পর্যন্ত করা যায়নি। গাঁ-টাকে রক্ষা করতে না পারলেও নাটোয়ারদের চেষ্টায় কোনো ফাঁক ছিল না। টোপনো নেই, তাদেরও তো কিছু দিতে পারত মহাবীর। কিন্তু লোকটার বাজে আবেগ নেই। মানুষের জীবনের চেয়ে তার কাছে তার গুদামের ধান-চাল-গমের বস্তাগুলো ঢের বেশি মূল্যবান। সেগুলোই যখন বরবাদ হয়ে গেছে, সেই বিপুল ক্ষতির পর করুণার বশে নাটোয়ারদের কিছু মজুরি ধরে দেওয়াটা নেহাতই অপব্যয়, এবং মুর্খামিও। অকারণে দান-খয়রাত করার মধ্যে মহানুভবতা থাকতে পারে কিন্তু তাকে প্রশ্রয় দেবার কথা ভাবতেই পারে না মহাবীর।

টাকাপয়সা না দিলেও মহাবীর নাটোয়ারদের ভরপেট খাওয়া এবং রাতে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

দুপুরের অনেক আগেই বারদিয়ায় পৌঁছে যায় নাটোয়াররা। বিশাল গঞ্জটার একধারে লড্ডুপ্রসাদ লালের বড় মাপের করাতকল। সোজা সেখানে চলে

আসে তারা।

টানা উঁচু এ্যাসবেস্টসের শেডের তলায় পা দিতেই বুকের ভেতরটা ছাঁত করে ওঠে নাটোয়ারের।

যখনই আগে সে এখানে এসেছে, জায়গাটা সারাক্ষণ গম গম করত। শেডের একদিকে টাল দিয়ে রাখা থাকত বিরাট বিরাট গাছের গুঁড়ি। পঁচিশ তিরিশটা লোক ভোর থেকে অনেকটা রাত পর্যন্ত লম্বা লম্বা করাত দিয়ে সেগুলো চেরাই করত। লড্ডুপ্রসাদজির করাতকল মানেই হই চই, মজুরদের ছোটাছুটি, প্রচণ্ড ব্যস্ততা এবং কাঠ চেরার একটানা আওয়াজ।

কিন্তু আজ চারিদিক সুনসান। কোথাও কোনো শব্দ নেই। একটা মজুর বা এক টুকরো কাঠ পর্যন্ত চোখে পড়ছে না।

খানিকক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নাটোয়ার। লড্ডুপ্রসাদজি করাতকল বন্ধ করে দিল কিনা কে জানে।

গোমতী একসময় বলে ওঠে, 'কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না।'

চিন্তাগ্রস্তের মতো মাথা নাড়ে নাটোয়ার। বলে, 'হুঁ।'

'কী হয়েছে বল তো?'

'কৌন জানে!'

'কী করবে এখন?'

নাটোয়ার উত্তর দেয় না। আসলে করাতকলে কাজ পাওয়ার ব্যাপারে সে ষোল আনা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু এখানে এসে যা দেখছে তাতে একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেছে।

গোমতী বলে, 'বেফায়দা দাঁড়িয়ে থেকে আর কী হবে?'

'হুঁ। এখান থেকে—' কথাটা শেষ করতে পারে না নাটোয়ার, হঠাৎ শেডের আরেক মাথা থেকে দুবলা, পাতলা একটা ছোকরা এগিয়ে এসে বলে, 'কাকে খুঁজছ?'

ছোকরাটা নাটোয়ারকে চিনতে না পারলেও সে কিন্তু তাকে চিনে ফেলেছে। ছোকরা লড্ডুপ্রসাদজির খাস নোকর, নাম—ভালরাম।

নাটোয়ার বলে, 'আমরা লড্ডুপরসাদজির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।' আসার উদ্দেশ্যটিও সে জানিয়ে দেয়।

ভালরাম মানুষ খারাপ না। সে দূরে শেডের শেষ প্রান্তে একটা ছোট ঘর দেখিয়ে বলে, 'লড্ডুজি ওখানে আছেন। তোমরা গিয়ে দেখা করো।'

ঐ ঘরটা লড্ডুপ্রসাদের গদি। সেখানে বসেই সে এত বড় করাতকল

চালায়।

এই জনশূন্য নিঝুম কারখানায় লড্ডুপ্রসাদ যে রয়েছে, এই খবরটা নাটোয়ারকে হঠাৎ চাঙ্গা করে তোলে। কৃতজ্ঞ চোখে একবার ভালরামের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমরা চলেই যাচ্ছিলাম, তোমার জন্যে লড্ডুজির দর্শনটা পাওয়া যাবে।' বলে আর দাঁড়ায় না, লম্বা লম্বা পা ফেলে গদি-ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। গোমতীরা তার পেছন পেছন প্রায় দৌড়ুতে থাকে।

লড্ডুপ্রসাদ এখনও পুরনো চাল বজায় রেখে চলেছে। করাতকলের অফিস ঘরটার আধাআধি জুড়ে উঁচু গদি। গদির সামনের দিকে খানকয়েক চেয়ার পাতা। কাজের জন্য যারা আসে ইচ্ছা করলে তারা গদিতেও বসতে পারে, নইলে চেয়ারে। ঘরটার একধারে তিন চারটে লোহার সিন্দুক এবং একটা ঢাউস কাঠের আলমারি। আলমারিটির কাচের পাল্লা দিয়ে দেখা যায়, প্রচুর হিসেবের খাতা ভেতরের তাকগুলোতে ডাঁই করে রাখা হয়েছে।

ডান দিকের দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে পেতলের তৈরি সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্তি ফুল দিয়ে সাজানো। কুলুঙ্গিটার তলায় গোলা মেটে সিঁদুর দিয়ে ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া হরফে পাঁচ বার লেখা আছে 'শ্রীশ্রী গণেশায় নমঃ।' তার নিচে 'শুভ লাভ।'

লড্ডুপ্রসাদের বয়স চৌষট্টি পঁয়ষট্টি। নিরেট পেটানো চেহারা তার। লম্বাটে মুখ, গোল চোখে সতর্ক চাউনি। মাথায় কদম ছাঁট চুল, পেছন দিকে একগোছা টিকি। পরনে ধুতি আর হাফ-হাতা পাঞ্জাবি।

গদিতে বসে অলস ভঙ্গিতে হাতের তেলোয় খৈনি ডলতে ডলতে দুটো লোকের সঙ্গে কথা বলছিল লড্ডুপ্রসাদ। নাটোয়ার দরজার সামনে এসে কোমর থেকে শরীরের ওপর দিকটা অনেকখানি ঝুঁকিয়ে হাতজোড় করে সসম্ভ্রমে বলে, 'নমস্তে সরকার—'

প্রচণ্ড স্মৃতিশক্তি লড্ডুপ্রসাদের। খৈনি ডলাটা এক মুহূর্তের জন্য স্থগিত রেখে সে চোখ কুঁচকে নাটোয়ারকে লক্ষ করে। তারপর বলে, 'আরে কৌন—নাটুয়া না?'

'হাঁ হুজৌর।'

'কামকাজের ধান্দায় নাকি?'

'হাঁ সরকার।'

'মিলবে।'

'লেকেন—' বলতে বলতে থেমে যায় নাটোয়ার।

তার কথায় স্পষ্ট একটা ইঙ্গিত ছিল, চট করে তা ধরে ফেলে লড্ডুপ্রসাদ।

বলে, 'আরে বাবা, কারখানা তুলে দিই নি।' সমস্ত ব্যাপারটা বিশদভাবে বুঝিয়ে দেয় সে। তরাই অঞ্চলে অর্থাৎ যেখান থেকে চেরাইয়ের জন্য গাছের গুঁড়ি আনানো হয় সেখানে কী একটা কারণে কিছুদিন গোলমাল চলছিল তাই কাঠের যোগান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই করাতকল চালু রাখা সম্ভব ছিল না। তবে আজই খবর এসেছে তরাইয়ের ঝঞ্ঝাট থেমে গেছে। দু-চারদিনের মধ্যে আবার কাঠ আসতে শুরু করবে। তখন ফের কারখানার কাজ শুরু হবে। নাটোয়ার যেন চারদিন পর আসে, তখন নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

নাটোয়ার রীতিমত উৎসাহিত হয়ে ওঠে। তবে সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ নৈরাশ্যও বোধ করে। লড্ডুপ্রসাদজির কৃপায় কাজটা পাওয়া যাবে ঠিকই, তবে তার জন্য চার চারটে দিন অপেক্ষা করতে হবে কিন্তু কী আর করা! এতগুলো দিন যখন কেটেছে তখন এই চারটে দিনও কোনোরকমে পার করে দেওয়া যাবে।

নাটোয়ারের হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায়। সে হাতজোড় করেই ছিল। বলে, 'একগো বাত হুজৌর—'

লড্ডুপ্রসাদ বলে, 'কী?'

'আমার সঙ্গে দু'জন আছে— এক লেড়কা আর এক আওরত। কিরপা করে যদি ওদেরও কামকাজের কিছু ব্যওস্থা হয়ে যায়—'

'চার রোজ পর এসো তো। তখন দেখা যাবে—'

এরপর আর দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। 'নমস্তে'— বলে গোমতী আর লচ্ছুকে সঙ্গে করে করাতকলের বাইরে বেরিয়ে আসে নাটোয়ার। তারপর সামনের রাস্তা দিয়ে তিনজন হাঁটতে থাকে।

লড্ডুপ্রসাদের সঙ্গে নাটোয়ারের যে সব কথাবার্তা হয়েছে, পেছনে দাঁড়িয়ে সবই শুনেছিল গোমতী। সে বলে, 'এখন কী করবে?' চার চার দিন—'

লড্ডুপ্রসাদের গদি-ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে মনে মনে একটা ছক করে ফেলেছিল নাটোয়ার। সে বলে, 'আরে বাবা, অত চিন্তা করছিস কেন? তারানাথজিদের ভারতমাতা রথ আছে না? পেটের দানা ঠিকই জুটে যাবে। সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। বড় সড়ক এখান থেকে বেশি দূরে না। চল ওখানে। জরুর রথবালাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।'

এই পরিকল্পনাটা অবশ্য অনেক আগেই ঠিক করা ছিল। পয়সা কামাইয়ের ফিকির বার করার ফাঁকে ফাঁকে দরকার হলে রথযাত্রার মিছিলে গিয়ে 'দুগারকা

ভোজন'টা চুকিয়ে আসবে। যতদিন তারানাথজির রথ হাইওয়ে দিয়ে আধারশিলা বসাতে বসাতে যাবে ততদিন খাওয়ার দুশ্চিন্তাটা অন্তত তাদের নেই।

পরিকল্পনাটা মাথায় ছিল না গোমতীর। নাটোয়ার মনে করিয়ে দেওয়ায় সে ভীষণ ব্যগ্র হয়ে পড়ে। বলে, 'বহোত ভুখ লেগেছে। তুরন্ত পা চালাও।'

জোরে জোরে হাঁটতে হাঁটতে নাটোয়ার বলে, 'পেটের চিন্তা নেই বলে আমাদের হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে কিন্তু চলবে না। আগে যেমন কামকাজের ধান্দা চালিয়ে যাচ্ছিলাম তেমনি চালিয়ে যেতে হবে।'

দস্তুরমতো অবাক হয়ে যায় গোমতী। বলে, 'কাজের ব্যওস্থা তো হয়েই গেছে। লড্ডুপ্রসাদজি চার রোজ পর আসতে বলল না?'

ভাবাবেগে ভেসে যাবার মানুষ নয় নাটোয়ার। লড্ডুপ্রসাদ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ঠিকই কিন্তু চারদিন পর কাজটা সত্যিসত্যিই পাওয়া যাবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। কেননা,কোনো কারণে গাছের গুঁড়ি আসতে যদি আরো দেরি হয়ে যায়? একমাত্র করাত কলের ওপর ভরসা করে থাকাটা ঠিক হবে না। এই কথাগুলো পরিষ্কার করে গোমতীকে বুঝিয়ে দেয় নাটোয়ার।

গোমতী বলে, 'তা হলে কী করতে চাও?'

নাটোয়ার বলে, 'এই চারদিন আমরা অন্য কাজেরও ধান্দা করব। সমঝি?'

একসময় হাঁটতে হাঁটতে নাটোয়াররা হাইওয়েতে পৌঁছে যায়। বরাত ভালই বলতে হবে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিক থেকে সেই সুরটা বাজাতে বাজাতে ভারতমাতা রথ এসে পড়ে। 'বোল রাধা বোল, সঙ্গম হোগা কি নেহীঁ—'

রথটা কাছাকাছি এসে গেলে নাটোয়াররা দুমরলালের নজর এড়িয়ে চুপিসারে মিছিলের পেছন দিকে মিশে যায়।

॥ সতের ॥

এরপর দুটো দিন ছক অনুযায়ী রথযাত্রার মিছিলে কিছুক্ষণ হেঁটে, দুপুরের খাওয়াটি চুকিয়ে, নাটোয়াররা সুযোগ বুঝে সরে পড়েছে। তারপর কাজের খোঁজে আকাশপাতাল তোলপাড় করে ফেলেছে, কিন্তু কোথায় কিছু জোটাতে পারেনি।

এদিকে আধারশিলা বসানোর কামাই নেই। ভবিষ্য ভারত'-এর কথা ভেবে তারানাথজি এই দু'দিনে আরো সাত আটটা শিলান্যাস করেছেন। খবর নিয়ে

জানা গেছে তাঁর রথযাত্রার কার্যক্রম এখনই শেষ হচ্ছে না, ভারতমাতা রথ কমসে কম আরো দিন দশেক হাইওয়ের ওপর দিয়ে নানা গ্রামগঞ্জ শহর বাজার ছুঁতে ছুঁতে এগিয়ে যাবে।

তৃতীয় দিন সকালে ভারতমাতাওলাদের চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে নাটোয়াররা যেখানে এসে পৌঁছয় সেখানে অনেকটা জায়গা জুড়ে ঢেউ খেলানো পাহাড়, আর তার ঢালে জঙ্গল। পাহাড়ের গা থেকে একটা নদী নেমে এসেছে, তবে সেটায় জল বেশি নেই। ছোট বড় অগুণতি পাথরের চাঁই এবং নুড়ির ভেতর দিয়ে তিরতিরে স্রোত বয়ে চলেছে। ক'দিন আগে যে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল তাতে এই নদীটায় ঢল নেমেছিল কিনা কে জানে। নামলেও এখন তার চিহ্নমাত্র নেই।

নদীর যেদিকে পাহাড় এবং জঙ্গল, তার উল্টো দিকে কর্কশ কাঁকুরে ডাঙা, ফাঁকে ফাঁকে অবশ্য কিছু চাষের জমিও চোখে পড়ে। এ সবের ফাঁকে ফাঁকে বেশ কিছু গাঁ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু চারপাশ একেবারে জনশূন্য, কোথাও মানুষজন দেখা যাচ্ছে না।

গাঁগুলোর সামনে দিয়ে যে কাঁকুরে রাস্তা চলে গেছে সেখানে একটা জিপ আর দুটো গৈয়া গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি থেকে খুলে বয়েলগুলোকে অবশ্য একধারে বেঁধে রাখা হয়েছে। প্রাণীগলোর সামনে প্লাস্টিকের বালতিতে খোল ভুসির সঙ্গে মাখা খড়ের কুচির জাবনা; তারা পরম সুখে সেগুলো চিবিয়ে চলেছে।

গাড়ি দুটোর পাশে একটা বিশাল লোহার খাঁচা পড়ে আছে। ওটা কিসের খাঁচা, দেখামাত্র চিনে ফেলে নাটোয়ার। একদৃষ্টে সেটা দেখতে থাকে সে।

পাহাড়, জঙ্গল আর নদীর এধারে নিঝুম আবহাওয়ার মধ্যে কেমন একটা চাপা থমথমে ভাব। ঠিক বোঝানো যায় না। কিন্তু নিজের অজান্তেই যেন এখানে দম বন্ধ হয়ে আসে।

গোটা পরিবেশটা নাটোয়ারদের সবার ঘাড়ের ওপর যেন চেপে বসেছে। ডান পাশ থেকে ফিস ফিস করে গোমতী বলে, 'কাঁহা লায়া? এ দিকটা চেনো?'

'নেহীঁ।' লোহার খাঁচার দিকে চোখ রেখে নাটোয়ার আস্তে মাথা নাড়ে, 'কভী নেহীঁ আয়া থা ইহাঁ।'

'রাস্তা ভুল করে এসে পড়েছ?'

'হাঁ, ওহী—'

এধারে ওধারে তাকিয়ে গোমতী আগের মতোই ফিস ফিস করে, চার পাঁচটা গাঁও রয়েছে, লেকেন একগো আদমীও চোখে পড়ছে না। গাঁও ছেড়ে সবাই চলে গেছে, মনে হচ্ছে।'

নাটোয়ার বয়েল, জিপ ইত্যাদি দেখাতে দেখাতে বলে, 'সবাই চলে গেলে ওগুলো রয়েছে কী করে? জরুর কুছ গড়বড় হুয়া হোগা—' একটু থেমে বলে, 'ঐ পিঁজরাটা দেখেছিস?'

'হাঁ।'

'কিসের পিঁজরা জানিস?'

গোমতী খানিক ভেবে বলে, 'নেহীঁ—তুমি জানো?'

নাটোয়ার বলে, 'হাঁ। সার্কাসবালারা ঐরকম 'পিঁজরায় শের আউর ভাল্লু রাখে। লেকেন—' একটু থেমে চিন্তিতভাবে ফের বলে, 'শের-ভাল্লুর পিঁজরা এখানে কে নিয়ে এল?'

গোমতী বলে, 'জরুর কুছ জরুরত পড়া হ্যায়—'

নাটোয়ার উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই হঠাৎ দূর থেকে চিৎকার ভেসে আসে, 'এ ভেইয়া—ভেইয়া হো—'

নাটোয়াররা হকচকিয়ে যায়। যে গাঁগুলোকে নির্জন, পরিত্যক্ত মনে হয়েছিল, দেখা যাচ্ছে সেখানেও মানুষজন আছে। এধারে ওধারে তাকাতে তাদের চোখে পড়ে বয়েল গাড়িগুলোর বাঁ পাশে যে গাঁ-টা রয়েছে সেখানকার একটা টালির ঘরের দাওয়া থেকে একটা আধবুড়ো লোক তাদের ডাকছে। চোখাচোখি হ'তে সে প্রবল বেগে হাত নাড়তে থাকে, 'তুরন্ত ইহাঁ চলা আও—'

লোকটার চোখেমুখে এবং গলার স্বরে এমন একটা আতঙ্কের ভাব রয়েছে যে নাটোয়াররা কিছু জিজ্ঞেস না করে একরকম দৌড়ে তার কাছে চলে যায়।

লোকটা বলে, 'তোমরা কারা?'

নিজেদের পরিষ্কার কোনো পরিচয় না দিয়ে নাটোয়ার জানায়, কাজের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে তারা এদিকে চলে এসেছে।

লোকটা বলে, 'এখানে এসে ভাল করনি।'

'কেন বল তো?'

'রাস্তায় তোমাদের কেউ কিছু বলেনি?'

'নেহীঁ।' নাটোয়ার জানায় এখান থেকে পাক্কা মাইলখানেক পেছনে তারা শেষ মানুষ দেখেছিল। তারপর জনমানুষের চেহারা তাদের চোখে পড়েনি।

চারিদিক সুনসান, নির্জন। সে বলে, 'নদীর কিনারে এসে পয়লা তোমাকে দেখলাম।'

লোকটা বলে, 'তোমরা এখান থেকে আভ্ভী চলে যাও। নদীর দিকে যেও না, যেদিক থেকে এসেছ সিধা সেদিকে যাবে।'

নাটোয়ারকে উৎকণ্ঠিত দেখায়। সে জিজ্ঞেস করে, 'চলে যেতে বলছ কেন? কী হয়েছে এখানে?'

'শের—শের নিকলা।'

অর্থাৎ বাঘ বেরিয়েছে। এবার লোকটার আতঙ্কের কারণ খানিকটা আন্দাজ করা যায়। কিন্তু যে মানুষ 'বত্রিশ ঘাটের জল খেয়েছে, ছুরির খেলা দেখাবার সময় যার হাত এতটুকু কাঁপে না এবং যে কিনা একজন দুর্ধর্ষ 'জঙ্গল হাঁকোয়া', (বীটার), বাঘের ভয়ে সেই নাটোয়ারের হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে যাবে, তা হ'তেই পারে না। তা ছাড়া ভোর থেকে অনবরত হাঁটতে হাঁটতে ভীষণ ক্লান্তও হয়ে পড়েছে। সে বলে, 'চাচা, চলতে চলতে বিলকুল থকে গেছি। এখন আর হাঁটার তাকত নেই।'

লোকটার মন বেশ ভাল। সে বলে, 'তা হলে এক কাজ করো, আমার ঘরে এসে বসো।'

'বাঁচালে চাচা—' লোকটার সঙ্গে তার ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে নাটোয়ারেরা। সামনের দরজাটা খোলাই থাকে।

ঘরের ভেতর দুটো দড়ির চারপায়া পাতা রয়েছে। আর আছে টিনের পুরনো বাক্স, বোঁচকা বুঁচকি, গমের বস্তা এবং আরো হাজার রকমের মালপত্র।

লোকটা নাটোয়ারদের চৌ-পায়ায় বসিয়ে নিজেও বসে।

ঘরটার পেছন দিকেও একটা দরজা আছে। সেটা দিয়ে বাড়ির ভেতরের অংশটা চোখে পড়ে। ওধারেও দু-একটা ঘর রয়েছে। সেখান থেকে নানা বয়সের তিন চারটি মেয়েমানুষ এবং কিছু বাচ্চাকাচ্চা উঁকিঝুঁকি দিয়ে নাটোয়ারদের দেখতে থাকে।

বাঘের ব্যাপারটা প্রচণ্ড কৌতূহলী করে তুলেছিল নাটোয়ারকে। সে বলে, 'শেরের কথা কী বলছিলে যেন চাচা? ওটা কোত্থেকে বেরিয়ে এসেছে—ঐ নদীর ওধারের জঙ্গল থেকে কি?'

লোকটা এবার বিশদভাবে যা জানায় তা এইরকম। তাদের এ অঞ্চলে বাঘ নেই, কস্মিনকালে ছিলও না। ওপারের জঙ্গলে সবই প্রায় নিরীহ প্রাণী—হরিণ, খরগোশ, শিয়ার। হিংস্র জানবরের মধ্যে রয়েছে দাঁতাল শুয়োর

আর সাপ। দিনকয়েক আগে আচানক কোত্থেকে যেন একটা চিতা ছিটকে এখানে চলে এসেছে। প্রথম দিকে গরু ছাগল মেরে খেত। পরে নদীর ধারে এ গাঁয়ের ভৈরো দুসাধকে একলা পেয়ে তুলে নিয়ে যায়। মানুষের রক্তের স্বাদ পাওয়ার পর জানবরটা মারাত্মক হয়ে উঠেছে। এখন আর সে হরিণ বকরিটকরি খায় না, তার খাদ্য এখন শুধুই মানুষ। গত কয়েক দিনে ছেলে-বুড়ো, পুরুষ-আওরত মিলিয়ে আটজন তার পেটে গেছে। জানবরটা আগে জঙ্গলেই বেশির ভাগ সময় থাকত, সন্ধের পর অন্ধকার নামলে মাঝে মধ্যে গাঁয়ে হানা দিত। এখন তার সাহস এবং লালচ এতই বেড়ে গেছে যে দিন নেই রাত নেই, সকাল নেই দুপুর নেই, যখন তখন আশেপাশের চার পাঁচখানা গাঁয়ে হানা দিচ্ছে এবং সুযোগ পাওয়া মাত্র মানুষ তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

ফলে চারিদিকে আতঙ্ক এমনই ছড়িয়ে পড়েছে যে কেউই আর ঘর থেকে বেরুতে চায় না। গাঁয়ের 'পঞ্চ'-এর মুরুব্বি দশ মাইল দূরের শহরের কোতোয়ালিতে খবর দিয়ে এসেছিল। ওখানে এখন একটা সার্কাস পার্টি খেলা দেখাচ্ছে। কোতোয়ালি থেকে সার্কাসওলাদের এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বন্য আকাট বাঘকে পোষ মানিয়ে যারা ভেড়া বানিয়ে ফেলে তেমন দু'জন দুর্ধর্ষ খেলোয়াড় দু'দিন ধরে এই গাঁয়ে এসে মুরুব্বি মঙ্গিলালের বাড়িতে উঠেছে। লোক দুটো দুর্দান্ত এবং অসীম সাহসী, জানের পরোয়া করে না। সকাল হলেই খাবার দাবার নিয়ে তারা জঙ্গলে ঢুকে যায়। তাদের সঙ্গে একটা খাঁচা নিয়ে সার্কাসের আরো কিছু লোকজনও যায়। যদি কোনো কৌশলে বাঘটাকে খাঁচায় পোরা যায়। ওরা ফেরে সন্ধের আগে আগে। যাই হোক, চিতাটাকে এখনও তারা ধরতে পারেনি।

সবচেয়ে বিপদের কথা হল, সার্কাসওলারা আজকের বিকেল পর্যন্তই এখানে আছে। চিতা ধরা পড়লে ভালই, নইলে জঙ্গল থেকে ফিরেই তারা শহরে চলে যাবে। এখানে পড়ে থাকায় তাদের সার্কাসের ক্ষতি হচ্ছে। নেহাত কোতোয়ালির পুলিশ চটে যাবে তাই তাদের খুশি করতে দু'দিনের কড়ারে এতদূর এসেছে।

নাটোয়ার আঙুল বাড়িয়ে গরুর গাড়ি, জিপ ইত্যাদি দেখাতে দেখাতে বলে, 'ওগুলো সার্কাসবালাদের, তাই না?'

লোকটা বলে, 'হাঁ।'

'একটা পিঁজরা নিয়ে ওরা তো জঙ্গলে ঢুকেছে। দুসরা খাঁচা দিয়ে কী হবে?'

লোকটা জানায়, সার্কাসওলারা যে খাঁচাটা নিয়ে গেছে সেটা ছোট। চিতাটাকে ধরতে পারলে সেটায় পুরে এই বড় খাঁচাটায় ঢুকিয়ে দেবে। আসলে জানোয়ারটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। তার সম্বন্ধে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হবার জন্য ডবল খাঁচার ব্যবস্থা!

নাটোয়ার বলে, 'লেকেন চাচা, সার্কাসবালারা যদি চিতাটাকে ধরতে না পারে কী হবে?'

চিন্তাগ্রস্তের মতো লোকটা বলে, 'আমরা চার গাঁওয়ের হর আদমী তো দো রোজ সেটাই ভাবছি।'

লোকটার সঙ্গে কথা বলতে বলতে মনে মনে চিতাটার ব্যাপারে একটা পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলেছে নাটোয়ার। সে বলে, 'চাচা, আমি তোমাদের মদত করতে পারি।'

'তুমি!'

'হাঁ, আমি।'

কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে লোকটা। তারপর জিজ্ঞেস করে, 'কিভাবে মদত করবে?'

'নাটোয়ার বলে, 'আগে দেখি সার্কাসবালারা চিতাটাকে ধরতে পারে কিনা।'

'তা হলে তো ওদের না ফেরা পর্যন্ত থাকতে হয়।'

'যদি তোমরা থাকতে দাও আর আমার মদতের জরুরত পড়ে—'

কী ভেবে লোকটা বলে, 'তোমরা বসো, আমি আধা ঘণ্টার ভেতর ফিরে আসছি।'

লোকটা কিছুক্ষণের মধ্যে সাত আট জনকে জুটিয়ে নিয়ে আসে। তাদের সকলেরই বয়স ষাটের ওপরে। নাটোয়ারের সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। এদের কারো নাম শিউপূজন, কারো টহলরাম, কারো ভজগোবিন, ইত্যাদি। সব চেয়ে বয়স্ক লোকটি হল মঙ্গিলাল; সে এই গাঁয়ের 'পঞ্চ'-এর মাথা।

মঙ্গিলাল বলে, 'সহদেও-য়ের কাছে শুনলাম তুমি নাকি চিতার ব্যাপারে আমাদের মদত করতে চাও?'

নাটোয়ার জানতে পারে যে লোকটা ঘরে এনে তাদের পাঠিয়েছে তার নাম সহদেও। সে বলে, 'হাঁ।'

'ক্যায়সে?'

'সার্কাসবালারা চিতাটাকে ধরতে না পারলে ওটাকে খতম করতে হবে।'

কিছুক্ষণ হাঁ হয়ে থাকে মঙ্গিলাল। তারপর বলে, 'কে খতম করবে?'

নাটোয়ার বলে, 'তোমরা গাওবালারা যদি সঙ্গে থাকো, আমিই চিতাটাকে শেষ করতে পারি।' বলতে বলতে চোখের তারা জ্বল জ্বল করতে থাকে তার।

'তুমি কি লাঠি দা কুড়ালি, এসব দিয়ে ওটাকে মারতে চাইছো?'

নাটোয়ার জানায়, দু চার শ' মানুষ একসঙ্গে জঙ্গলে হানা দিলে চিতাটাকে শেষ করে ফেলা অসম্ভব কিছু নয়। যেটা একান্ত প্রয়োজন তা হল সাহস।

মঙ্গিলাল এবং গাঁয়ের অন্য সব বয়স্ক লোকেরা সমস্বরে বলে, 'এত সাহস কারো কলিজায় নেই। আমাদের চার গাঁওয়ের একগো আদমীকেও তুমি সঙ্গে পাবে না। তব্ হাঁ—'

'কী?'

'তোমার যদি বন্দুক থাকত, দো-চারগো আদমী সঙ্গে যেত। ও শালে য্যায়সে খতারনাক জানবর,তাতে দা-কুড়ালির ওপর ভরসা করে কেউ জঙ্গলে ঢুকবে না।'

খানিক চিন্তা করে নাটোয়ার বলে, 'তোমাদের তা হলে বন্দুকবালা শিকারী দরকার?'

মঙ্গিলালরা জানায়, তেমন একজনকে পেলে তারা নিশ্চিন্ত হতে পারে। বন্দুকের গুলি ছাঁড়া অমন একটা বিপজ্জনক জন্তুকে কেউ শেষ করতে পারে, এমন বিশ্বাস তাদের নেই।

নাটোয়ার বলে, 'ঠিক হ্যায়, শিকারীর ব্যাওস্থা আমি করব। চিতাটাকে খতম করতে পারলে তোমরা আমাকে কী দেবে?'

'শিকারী তুমি পাচ্ছ কোথায়?' কাঁহা মিলেগা?'

'তোমরা জানো না, আমি জঙ্গলহাঁকোয়া। অনেক শিকারীর সঙ্গে আমি জঙ্গলে শের ভাল্লু মারতে গেছি। তোমরা বললে দশ বিশ শিকারী এখানে হাজির করে দিতে পারি।'

অচেনা এই লোকটা কতখানি বিশ্বাসযোগ্য, মঙ্গিলালরা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। সংশয়ের চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মঙ্গিলাল বলে, 'সচ্'?'

নাটোয়ার বলে, 'তোমাদের কাছে ঝুট বলে কিছু ফায়দা আছে? বল আমার মজুরি কী দেবে?' কথা বলতে বলতে মনে মনে শিকারীদের একটা তালিকা করে ফেলেছে সে। মিলিটারি সিংকে এখন পাওয়া যাবে না, তিনি দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন। তিনি ছাড়া আছেন জগমোহনজি, সূরযলালজি, মথুরাপরসাদজি,

সোহনলালজি, ইত্যাদি। এঁরা সবাই জবরদস্ত শিকারী। এঁদের সকলের সঙ্গেই জঙ্গলহাঁকোয়া হিসেবে কাজ করেছে নাটোয়ার। এঁরা যখন জঙ্গলে মাচা বানিয়ে তার ওপর বন্দুক তাক করে বসেছেন তখন প্রবল হল্লা করে, টিন পিটিয়ে বনের হিংস্র জানোয়ারদের তাড়া করতে করতে তাঁদের বুলেটের পাল্লার ভেতর নিয়ে গেছে নাটোয়ার। অবশ্য সে একা নয়, এ ধরনের কাজে আরো কয়েক জন জঙ্গলহাঁকোয়া দরকার।

নাটোয়ার জানে এই সব শিকারীদের ঘরে অঢেল টাকাপয়সা, সোনাচাঁদি। পয়সার লালচে এঁরা কেউ জানোয়ার মারেন না। শিকার খেলাটা এঁদের কাছে নেশার মত। এখানকার চিতার খবর যাঁকেই দেওয়া হবে, তিনিই টোটা-বন্দুক নিয়ে দৌড়ে চলে আসবেন। জঙ্গলে টিন পেটানো আর হল্লা করার জন্য গাঁওবালাদের কাছ থেকে যদি কিছু আদায় করা যায়, এঁরা তার থেকে ভাগ বসাতে যাবেন না। যা পাওয়া যাবে, সবটাই তাদের। নাটোয়ারকে এখন যা করতে হবে তা হল মঙ্গিলালদের ওপর চাপ দিয়ে যতটা টাকা বাড়িয়ে নেওয়া যায়।

মঙ্গিলাল ঘরের এক কোণে তার সঙ্গীদের নিয়ে চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে নেয়। তারপর বলে, 'হামলোগন গরিব আদমী, শ'ও রুপাইয়ার বেশি দিতে পারব না।'

নাটোয়ার অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে খানিকক্ষণ চোখ গোল করে তাকিয়ে থাকে। তারপর গলার স্বর অনেকটা চড়িয়ে বলে, 'কা তাজ্জবকা বাত!'

'কিসের তাজ্জব?'

'তোমাদের চার গাঁওয়ে কেত্তে আদমী আছে চাচা!'

'কায়?'

'বলই না।'

মনে মনে হিসেব কষে মঙ্গিলাল বলে, 'হোগা কমসে কম দো ঢাই হাজার।'

'দো-ঢাই হাজার আদমীর জানের কীম্মত শ'ও রুপাইয়া ধরলে চাচা?' নেহীঁ নেহীঁ, এ ঠিক নেহীঁ।' ওটা আরো বাড়িয়ে দাও।'

মঙ্গিলালরা আরো এক দফা পরামর্শ সেরে নিয়ে বলে, 'তোমাকে তো বললাম আমরা গরিব আদমী। পর পর দো সাল এখানে ভাল ফসল হয়নি। আমাদের হাল নিশ্চয়ই বুঝবে। ঠিক হ্যায়, দেড় শ' রুপাইয়া নিও।'

অনেক টানা হ্যাঁচড়ার পর শেষ পর্যন্ত দু'শ টাকায় রফা হয়। তার ওপর যত দিন না চিতাটাকে মারা যাচ্ছে তাদের তিন জনের তিন বেলা করে ভরপেট

খাওয়াও দিতে হবে। সেই সঙ্গে আরো একটা শর্তও জুড়ে দেয় নাটোয়ার। দু-একজন জঙ্গলহাঁকোয়া দিয়ে কাজ হয় না। শিকারীকে নিয়ে আসার পর তার সঙ্গে এই চারখানা গাঁ থেকে কমসে কম দশ পনের জন সাহসী লোক দিতে হবে। তারা নাটোয়ারের সঙ্গে হই চই বাধিয়ে, টিন পিটিয়ে বিপজ্জনক মানুষখেকো জানোয়ারটাকে শিকারীর দিকে তাড়া করে নিয়ে যাবে।

অলিখিত চুক্তি হয়ে যাবার পরও নাটোয়ারের মনে একটা খটকা থেকে যায়। যে সার্কাসওলারা জঙ্গলে ঢুকেছে তারা যদি আজ চিতাটাকে ধরে ফেলে গোটা চুক্তিটাই বরবাদ হয়ে যাবে। সে মনে মনে ব্যাকুলভাবে আর্জি জানাতে থাকে, হো রামজি, হো কিষুণজি, সার্কাসওলারা যেন আজ জঙ্গল থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।

কথাবার্তা পাকা করে মঙ্গিলালরা চলে যায়। সহদেও-ও বসে থাকে না, পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতর চলে যায়। আজ নাটোয়াররা দুপুরে তার বাড়িতে খাবে। তারই ব্যবস্থা করতে গেল। এরপর যতদিন চিতাটা মারা না পড়ছে, তারা পালা করে করে চার গাঁয়ের লোকেদের বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসবে। অবশ্য রাত কাটাবে সহদেওয়ের এই বাইরের ঘরখানায়। তবে সব কিছুই নির্ভর করছে সার্কাসওলাদের নিষ্ফল অভিযানের ওপর।

সবাই চলে যাবার পর গোমতী চাপা গলায় বলে, 'আমার বহোত ডর লাগছে। ঐ খতারনাক জানবারটাকে মারার খেয়াল ছাড়। চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই—' তার গলার স্বরে অজানা আশঙ্কা আর চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে বেরোয়।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে নাটোয়ার বলে, 'ডরপোক কাঁহিকা! আমি কেত্তে কেত্তে শিকারীর সঙ্গে জঙ্গলহাঁকোয়ার কাজ করেছি জানিস? এর চেয়ে অনেক বেশি খতারনাক জানবার আমার দেখা আছে। কমসে কম তিশগো শের, শ'ও বরা তাড়িয়ে আমি শিকারবালাদের বন্দুকের নলের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। তবেই না ওরা জানবরগুলোকে মারতে পেরেছে।' কোথায় কবে কোন কোন জঙ্গলে গিয়ে কী কী হিংস্র জন্তু মারার ব্যাপারে শিকারীদের মদত দিয়েছে তার লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে যায় সে। সে বোঝাতে চায়, আসল কাজটা সে-ই করেছে; মাচার নিরাপদ উচ্চতায় বসে শিকারীরা শুধু বন্দুকের ট্রিগারই টিপেছে।

নাটোয়ারের সমস্ত বীররসাত্মক কাহিনীও গোমতীকে চাঙ্গা করে তুলতে পারে না। সে আগের মতোই ভয়ার্ত সুরে বলে, 'তবু বলছি, তুমি এ খেয়াল ছাড়ো।'

'দ্যাখ গোমতী, সিরিফ এক রোজ, বেশি হলে দো রোজ—এর মধ্যে জানবরটাকে মারবই। তারপরই নগদ দো শ রুপাইয়া।'

'অত লালচ আচ্ছা নেহীঁ। চার রোজ পর করাতকলের কাজটা পাচ্ছি। যেত্তে রোজ ওটা না মিলছে, ভারতমাতা রথবালারা তো রয়েছেই। ভুখা মরতে হবে না আমাদের। চল, এখনই বেরিয়ে পড়ি। পুছতাছ করে বড় সড়কে গিয়ে পড়তে পারলে রথবালাদের জরুর পেয়ে যাব।'

'কভী নেহীঁ। এই দো শ রুপাইয়া আমার চাই।' জেদী গলায় বলে নাটোয়ার, 'করাতকলে গতরচুরণ খেটে এই টাকাটা পেতে কেত্তে রোজ লেগে যাবে, হিসেব করে দেখেছিস?'

'যেতে রোজ লাগুক—'

'আরে সোচ বুঝ করে দ্যাখ, ফকিরাচাচা খালি হাতে ঘরে ফিরেছে। দো শ রুপাইয়া দো-এক রোজের ভেতর পেয়ে গেলে তার থেকে চাচাকে কিছু দেওয়া যাবে। করাতকলে কামাই করে যখন ফিরে যাব, ততদিন কি আর ওরা জিন্দা থাকবে?'

গোমতী উত্তর দেয় না। নাটোয়ার ঠিকই বলেছে, ফকিরাকে কিছু টাকা দেওয়া উচিত এবং সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ততই ভাল। তবু চিতাবাঘের দুশ্চিন্তাটা কিছুতেই কাটতে চায় না। প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা গোমতীর বুকের ভেতর চেপে বসে থাকে।

॥ আঠার ॥

রামজি এবং কিষুণজি বোধ হয় কয়েক কোটি মাইল দূরে বসে নাটোয়ারের আর্জিটা শুনতে পেয়েছিলেন। দুই দেবতা তৎক্ষণাৎ সেটা মঞ্জুর করে দেন।

সন্ধের আগে আগে সার্কাসওলারা সত্যি সত্যিই ব্যর্থ হয়ে জঙ্গল থেকে ফিরে আসে। দু' দিন গোটা বনভূমির আধাআধি চষে ফেলেও জন্তুটাকে ওরা ধরতে পারেনি। বার কয়েক দূর থেকে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো তার কালো বুটিদার শরীর ঘন গাছপালা এবং লতাপাতার ভেতর দিয়ে লাফিয়ে চলে যেতে দেখা গেছে শুধু।

মঙ্গিলাল এবং চার গাঁয়ের বেশ কিছু লোকজন সার্কাসওলাদের জন্য আগে থেকেই জিপ আর গরুর গাড়ি দুটোর কাছে সতর্ক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের সবার হাতেই লাঠি, দা বা অন্য কোনো গেঁয়ো অস্ত্র। সাবধানের মার

নেই। বলা যায় না, কখন কোত্থেকে হুট করে চিতাটা বেরিয়ে আসবে।

মঙ্গিলালদের পাশে ভিড়ের ভেতর নাটোয়ার গোমতী আর লচ্ছুকেও দেখা যায়।

সার্কাসওলারা মোট ছ' জন। যে দু'জন বাঘের খেলা দেখায় তাদের একজনের নাম জন, আরেক জন হল মহেশ। দুই খেলোয়াড়েরই জবরদস্ত, মজবুত চেহারা। সরু কোমর, লোহার পাটার মতো চওড়া বুক, শক্ত পেশিওয়ালা হাত-পা। মোটা গর্দান, মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। জনের একজোড়া চাড়া-দেওয়া গোঁফ রয়েছে, মহেশের মুখ নিখুঁত কামানো। দু'জনের হাতেই বাঘ-খেলানো হান্টার, কাঁধে বন্দুক। বন্দুকটা আত্মরক্ষার কারণে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। জঙ্গলের ভেতর হিংস্র মানুষখেকো জানোয়ারের মতিগতি কেমন হবে, আগে থেকে আন্দাজ করা মুশকিল। তাই হাতিয়ার সঙ্গে রাখতেই হয়।

জন এবং মহেশের চার সঙ্গী একটা ছোট ফাঁকা লোহার খাঁচা বয়ে এনেছিল। তারা চটপট একটা বয়েল গাড়িতে খাঁচাটা তুলে ফেলে। সেই গরুগুলো এখনও জাবনা খেয়ে যাচ্ছে। তাদের বাঁধন খুলে গাড়ির সঙ্গে জুতে দেয়।

সহদেওয়ের কাছে সার্কাসওলা বাঘের খেলোয়াড়দের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আগেই শুনেছিল নাটোয়ার। ফলে কে জন আর কে মহেশ, চিনতে অসুবিধা হয়নি।

হতাশ চোখে জঙ্গল থেকে নিয়ে আসা শূন্য খাঁচাটার দিকে এক পলক তাকিয়ে মঙ্গিলাল ভয়ে ভয়ে জন এবং মহেশকে জিজ্ঞেস করে, 'আজও কিছু হল না সাব?'

জন বলে 'নেহী। ও শালে বহুত হারামী। দো রোজ জঙ্গল ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি, লেকেন আমাদের নজদিগ ঘেঁষছে না।'

মহেশ বলে, 'হুঁশিয়ার জানোয়ার। পুরা দো রোজ তোমাদের এখানে থেকে কোসিস করলাম ; আর থাকা যাবে না। আজ, এখনই আমরা চলে যাচ্ছি। তোমাদের জন্যে কষ্ট হচ্ছে, লেকেন আমাদের আর কিছু করার নেই।'

জন বলে 'আমরা না থাকায় টাউনে সার্কাস বন্ধ হয়ে আছে। বুঝতেই পারছ, পেটকা সওয়াল। ফিরে গিয়ে সার্কাস চালু হলে তবে তো কামাই হবে।' আচ্ছা, চলতে হ্যায়।'

জন এবং মহেশ জিপের দিকে পা বাড়ায়।

হঠাৎ ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে নাটোয়ার। চার গাঁয়ের মুরুব্বিদের সঙ্গে আগেই তার চুক্তি হয়ে গেছে। সে মনে মনে ভেবে রেখেছিল, দশ মাইল দূরের যে শহরে অর্থাৎ প্রতাপপুরে সার্কাসওলারা খেলা দেখাতে এসেছে জন আর মহেশদের সঙ্গে সেখানে চলে যাবে। ওখানে শিকারী মথুরানাথ সহায় থাকেন। শিকারের গন্ধ পেলে তাঁকে আটকে রাখা অসম্ভব। যত কাজ থাক, সব ফেলে তিনি নাটোয়ারের সঙ্গে চলে আসবেন।

নাটোয়ার হাতজোড় করে বলে, 'সাব, একগো বাত—'

জন এবং মহেশ দাঁড়িয়ে পড়ে।

নাটোয়ার বলে, 'কিরপা করে আমাকে যদি আপনাদের সঙ্গে নেন—'

জন ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করে, 'মতলব?'

নাটোয়ার জানায় সে প্রতাপপুরে যাবে, বয়েলগাড়িতে যদি একটু জায়গা পাওয়া যায় তার খুবই উপকার হয়। নইলে দশ দশ মাইল রাস্তা তাকে হেঁটে যেতে হবে।

জন আর কোনো প্রশ্ন করে না। বলে, 'ঠিক হ্যায়, একটা গাড়িতে উঠে পড়।' বলেই মহেশকে সঙ্গে করে জিপের দিকে যায়।

নাটোয়ার মঙ্গিলালদের কাছে গিয়ে বলে, 'চিন্তা নায় করনা চাচা, সব ঠিক হো যায়েগা। তোমাদের যা বলেছি তার ব্যওস্থা করেই ফিরে আসব।' গোমতী আর লচ্ছুকে বলে, 'তোরা এই গাঁওয়ে চাচাদের কাছে থেকে যা।'

গোমতী রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করে, 'কবে ফিরবে?'

'কাল।'

'ঠিক তো?'

'হাঁ হাঁ, ঠিক। ঘাবড়াস না—'

'কেত্তে রোজ বাদ তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমাকে এখানে ফেলে পরতাপপুর থেকে ভেগে যাবে না তো?'

'আরে নেহীঁ নেহীঁ, রামজি কসম—'

ওদিকে বয়েল গাড়ি থেকে সার্কাসের অন্য লোকেরা তাড়া দিচ্ছিল, 'আরে ভাই, জলদি কর—'

'হাঁ হাঁ—' নাটোয়ার আর দাঁড়ায় না, ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ুতে দৌড়ুতে গিয়ে লাফিয়ে পেছনের গাড়িটায় উঠে পড়ে।

মহেশদের জিপ আগেই ছেড়ে দিয়েছিল। চাকায় ক্যাঁচোর কোঁচর আওয়াজ তুলে এবার বয়েল গাড়ি দুটো সামনের কাঁকুরে রাস্তাটার ওপর দিয়ে এগিয়ে

যায়।

পশ্চিম আকাশে দিনের শেষ রক্তাভা ছড়িয়ে সূর্য এখন ডুবে যাচ্ছে। গাঁয়ের লোকজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ নাটোয়ারকে দেখা যায়, পলকহীন তাকিয়ে থাকে গোমতী।

॥ উনিশ ॥

পরদিন দুপুরে চারখানা নিঝুম, সন্ত্রস্ত গাঁ-কে চমকে দিয়ে ছ'টা ভৈসা গাড়ি মিছিল করে নদীর এধারে সহদেও-এর বাড়ির উল্টো দিকের ফাঁকা জমিতে এসে থামে।

সহদেওদের গাঁ-টা সবার শেষে। গাড়ির মিছিলটা যখন আগের দিকের গাঁগুলোর ভেতর দিয়ে আসছিল তখন মাঝখানের একটা গাড়ি থেকে নাটোয়ার সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল, 'আরে গাঁওবালা ভাইলোগন, ঘরসে নিকাল আও। দেখো কৌন আয়া হ্যায়—বহোত বড়ে শিকারী মথুরানাথজি। অব্ কোঈ ডর নেহীঁ। সমঝ লো, ও শালে চিতা 'মর চুকা—'

তার চিৎকারে প্রায় সব বাড়ি থেকেই দু-চারজন করে বেরিয়ে পড়েছিল। বিরাট কৌতূহলী জনতা ভৈসা গাড়িগুলোর পেছন পেছন চলে এসেছে।

ছ'খানা মোষের গাড়িই অজস্র মালপত্র এবং লোকজনে বোঝাই। অনেকগুলো তাঁবু, নানা ধরনের বাসনকোসন, স্টোভ, বড় চুলহা, চাল-ডাল-আটা-চিনি এবং কাঁচা আনাজের বস্তা, ঘি আর তেলের টিন, গদিওলা কুর্শি, তোষক, তাকিয়া, মশারি, পনের বিশটা মশাল, হ্যাজাক, মোটা মোটা পাটের দড়ি, প্রচুর তক্তা বাঁশ পেরেক দা লাঠি এবং অগুণতি ক্যানেস্তারা—সমস্ত মিলিয়ে এলাহি ব্যাপার। এত সব লটবহর এবং মানুষজনের মধ্যে সবার আগে যাঁর দিকে নজর চলে যায় তিনি একেবারে প্রথম গাড়িটার ছই-য়ের তলায় পুরু ফোমের গদির ওপর তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বসে আছেন। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স কিন্তু এখনও লম্বা-চওড়া তাগড়াই চেহারা। শক্ত চোয়াল, হাত-পায়ের মোটা মোটা হাড়, ছড়ানো নাক, মাংসল কাঁধ আর তীক্ষ্ণ চোখ, মোমে-মাজা গোঁফ, ইত্যাদি এক পলকে বুঝিয়ে দেয়, ইনিই দুর্ধর্ষ শিকারী মথুরানাথ সহায়। তাঁর পরনে ব্রীচেস, পায়ে বুট। পাশে এক জোড়া ডবল ব্যারেল বন্দুক।

ওধারে হই হই করে অন্য গাড়ির লোকেরা মালপত্র নামাতে শুরু করেছে।

ক'জন ক্ষিপ্র হাতে চটপট খুঁটি-টুটি পুঁতে তেরপলের তাঁবু খাটাতে শুরু করে। এদের সঙ্গে দু'জন রসুইকর এসেছিল। তাদের একজন স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে দেয়, আরেক জন চুলহায় আগুন দিয়ে রান্নাবান্নার তোড়জোড় করতে থাকে। বোঝাই যাচ্ছে, বাঘটাকে না মারা পর্যন্ত মথুরানাথরা এখান থকে নড়ছেন না। যতদিন দরকার এখানেই থেকে যাবেন।

খানিক দূরে মঙ্গিলাল, সহদেও এবং চার গাঁয়ের পাঁচ ছ'শ লোক সবিস্ময়ে এবং মুগ্ধ চোখে বিপুল পরিপাটি আয়োজনটা লক্ষ করছিল। সব দেখেশুনে তাদের মনে হচ্ছিল, দুশ্চিন্তার আর কারণ নেই। চিতাটার মৃত্যু নিতান্তই ঘনিয়ে এসেছে। নাটোয়ার যে সত্যিসত্যিই কাজের লোক, শুধু লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দেয়নি, সেটা বোঝা যাচ্ছিল। মথুরানাথের মতো শিকারীকে এত লোকলস্কর এবং সরঞ্জামসুদ্ধ যে টেনে আনতে পারে সে সামান্য আদমী নয়। চার গাঁয়ের মানুষেরা তার প্রতি এক ধরনের কৃতজ্ঞতাই বোধ করে।

নাটোয়ার গাড়ি থেকে আগেই নেমে পড়েছিল। মঙ্গিলালদের ডেকে মথুরানাথের কাছে নিয়ে আসে সে। বলে, 'হুজৌরকে পরণাম কর।'

মাটি পর্যন্ত মাথা ঝুঁকিয়ে মঙ্গিলালরা বলে, 'নমস্তে সরকার।'

এরপর মঙ্গিলাল এবং চার গাঁয়ের মাতব্বরদের সঙ্গে মথুরানাথদের পরিচয় করিয়ে দেয় নাটোয়ার।

মথুরানাথ নাটোয়ারের কাছ থেকে আগেই খবর নিয়েছিলেন তবু গম্ভীর, ভারী গলায় চিতাটা সম্পর্কে মুরুব্বিদের কাছ থেকেও নানা খুঁটিনাটি জেনে নেন। জন্তুটা এখানে কতদিন আগে এসেছে, ক'টা মানুষ ক'টা বকরি ক'টা মোষ এবং ক'টা গরু মেরেছে, কখন কখন সেটা গাঁয়ে এসে হানা দেয়, ইত্যাদি।

চার গাঁয়ের প্রতিনিধি হিসেবে হাতজোড় করে বিনতিভাবে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যায় মঙ্গিলাল।

সব শোনার পর মথুরানাথ বলেন, 'আমার হাতে নাটোয়ার ছাড়া আর কোনো জঙ্গলহাঁকোয়া নেই। একটা লোক দিয়ে কাজ হবে না। তোমাদের চার গাঁ থেকে কমসে কম আরো দশ পনেরটা জোয়ান ছোকরা দিতে হবে।'

মঙ্গিলাল তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয় না। সে বেশ দমেই গেছে। তার ধারণা হয়েছিল এত লোকজন যখন মথুরানাথ নিয়ে এসেছেন, চিতাটাকে মারার যাবতীয় বন্দোবস্ত তিনিই করবেন। কিন্তু এখন রীতিমত ফ্যাসাদই দেখা দিল। ঐরকম একটা খতারনাক জানোয়ার তাড়া করার জন্য চার গাঁয়ের কেউ

জঙ্গলে ঢুকতে চাইবে কিনা, সে সম্বন্ধে তার যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। অবশ্য কয়েকজন জঙ্গলহাঁকোয়ার দাবী আগেই জানিয়ে রেখেছিল নাটোয়ার। মঙ্গিলাল ভীরু গলায় বলে, 'সরকার, আমি গাঁওবালাদের সঙ্গে কথা বলে আপনাকে জানাচ্ছি।'

মথুরানাথ বলেন, 'যত ইচ্ছে কথা বল। লেকেন দশ পন্দ্র জঙ্গলহাঁকোয়া আমার চাই।'

মঙ্গিলাল নাটোয়ারকে একধারে ডেকে নিয়ে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করে, 'মথুরানাথজির সঙ্গে এত্তে আদমী এসেছে ; ওরা জঙ্গলে না গিয়ে কী করবে তা হলে ? আমি তো ভেবেছিলাম—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে নাটোয়ার জানায়, প্রতাপপুর থেকে যাদের আনা হয়েছে তাদের কেউ রসুইকর, কেউ নৌকর, কেউ মথুরাজির হাত-পা টিপে দেয়। এদের মধ্যে একজনও জঙ্গলহাঁকোয়া নেই।

মঙ্গিলাল বলে, 'মথুরাজি এত্তে বড়ে শিকারী। জঙ্গলহাঁকোয়া ছাড়াই উনি চিতাটাকে জরুর মারতে পারবেন।'

মঙ্গিলালের অজ্ঞতায় বিশেষ অবাক হয় না নাটোয়ার। এরা যে শিকারের নিয়মকানুন সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানে না, সেটা ধরে ফেলে সে, বলে, 'আরে চাচা, জানবরটাকে তাড়িয়ে বন্দুকের সামনে না নিয়ে গেলে উনি গোলি চালাবেন কী করে ? আমি তো সঙ্গে থাকবই, ডরের কিছু নেই। তুমি দশ পন্দ্র আদমীর ব্যওস্থা করে দাও।'

মঙ্গিলাল চিন্তিতভাবে বলে, 'ঠিক হ্যায়।' তারপর পায়ে পায়ে এবার সে খানিক দূরে যে জনতা দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে চলে যায়। এবং মথুরানাথ তাদের কাছে কী চেয়েছেন সেটা জানিয়ে দিয়ে বলে, 'দেখো ভাই, উনি সাফ সাফ বলে দিয়েছেন জঙ্গলহাঁকোয়া ছাড়া চিতাটাকে মারতে পারবেন না। ওঁর জন্যে আমাদের এক পাইসা খরচা নেই। ক'গো আদমী না দিলে গুস্সা হয়ে মথুরাজি যদি লৌটকে চলে যান, আমাদের সবাইকে এক এক করে ঐ সালে জানবরের পেটে চলে যেতে হবে। সোচ বুঝ করে দেখো, এই আখরী মওকা ছেড়ে দেবে কিনা।' একটু থেমে ফের টানা বলে যায়, 'এ কাজে বহোত খতরা আছে, জানি। তবে নাটোয়ার সঙ্গে থাকবে, তেমন কিছু হলে ও সামলাবে। ভেবে দেখো বাহারকা আদমী এসে আমাদের জন্যে ঝুঁকি নিচ্ছে, আর আমরা নিজেদের জন্যে নিজেরা এটুকু করব না ?'

মঙ্গিলালের কথায় খানিকটা প্রতিক্রিয়া হয়। গাঁওবালারা নিচু গলায়

নিজেদের মধ্যে অনেকক্ষণ পরামর্শ সেরে নেয়। তারপর একজন দু'জন করে মোট পনের ষোলটি লোক মঙ্গিলালের কাছে এসে জানায়, তারা জঙ্গলে যেতে রাজী। আসলে শুধুমাত্র মঙ্গিলালের কথায় নয়, শিকারের ব্যাপারে মথুরানাথজির বিপুল আয়োজন দেখে তারা ভরসা পেয়েছে। তা ছাড়া নাটোয়ার সঙ্গে থাকবে। যদিও মাত্র একটা দিন তারা তাকে দেখেছে কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যেই তার চালচলন, কথাবার্তা, দুরন্ত সাহস এবং কর্মক্ষমতায় তারা মুগ্ধ। যার এক কথায় মথুরানাথের মতো দুর্ধর্ষ শিকারী এত সাজসরঞ্জাম নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর হাজিরা হয়েছেন সে তাদের মতো তুচ্ছ ঐরু-গৈরু-ভৈরু নয়। বোঝা গেছে জঙ্গল শিকার এবং জন্তুজানোয়ারের মতিগতি সম্পর্কে তার জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা প্রচুর। নাটোয়ার সঙ্গে থাকলে তেমন ভয়ের কারণ নেই।

মঙ্গিলাল লোকগুলোকে নিয়ে মথুরানাথের কাছে চলে আসে।

ওরা যখন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করছিল, সেই ফাঁকে কখন যে সব চেয়ে বড় তাঁবুটা খাটানো হয়ে গেছে, টের পাওয়া যায়নি। মথুরানাথ মানুষটি বেশ সৌখিন। তাঁর এই তাঁবুর কানাত মখমল দিয়ে তৈরি। মাটিতে পাটের ম্যাট পেতে তার ওপর দামী পুরু কার্পেট বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁবুটা গদিমোড়া ইজিচেয়ার, ফোল্ডিং খাট, বেতের মোড়া, টেবল, রুপোর ফরসি ইত্যাদি দিয়ে সাজানো।

মথুরানাথ এখন ইজিচেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে চা খাচ্ছেন। একটা নৌকর জ্বলন্ত কলকেতে ফুঁ দিতে দিতে এসে ফরসির মাথায় সেটা বসিয়ে দেয়। দামী খুসবুদার তামাকের গন্ধে অনেকটা জায়গা জুড়ে বাতাস ম ম করতে থাকে।

খানিক দূরে আরো তিনটে তাঁবু খাটানোর কাজ চলছে। সেগুলো তুলনায় ছোট, বাহারও কম।

মথুরানাথ একটা ছোট নিচু টেবলে চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে ফরসির নলটা তুলে নিতে নিতে মঙ্গিলালদের দিকে তাকান। বলেন, 'কী ব্যাপার ?'

মঙ্গিলালদের সঙ্গে সঙ্গে নাটোয়ারও এসেছিল। উত্তরটা সে-ই দেয়। সেই সাহসী পনের ষোলটা লোককে দেখিয়ে বলে, 'হুজৌর,এরা জঙ্গলহাঁকোয়া হয়ে কাজ করতে রাজী হয়েছে।'

'ঠিক হ্যায়। দোপহরে খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে তোমরা চলে এস। জঙ্গলে গিয়ে মাচান বেঁধে আসতে হবে।'

হুকুম নিয়ে লোকগুলো চলে যায়।

দুপুরে সূর্য যখন মাথার ওপর থেকে পশ্চিম আকাশের ঢাল বেয়ে সামান্য নেমে গেছে, সেই সময় মথুরানাথজি নাটোয়ার এবং সেই পনের ষোলটি আনকোরা জঙ্গলহাঁকোয়াকে নিয়ে জঙ্গলের দিকে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর হাতে রাইফেল। অন্যদের ভেতর কয়েকজন মাচা বাঁধার জন্য তক্তা কাঠ পেরেক দড়ি বাঁশ ইত্যাদি বয়ে নিয়ে চলেছে। বাকিদের হাতে দা, লাঠি এবং বর্শা। চিতাটার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই সব হাতিয়ার সঙ্গে নিয়েছে তারা। জঙ্গলের ভেতর জানোয়ার বড় ভয়ঙ্কর, বিশেষ করে সেটা যদি মানুষখেকো চিতা হয়।

প্রথমে কেউ লক্ষ করেনি, তাদের পেছন পেছন গোমতীও আসছিল। সবাই যখন বড় বড় পাথরের চাঁইয়ের ওপর সাবধানে পা ফেলে ফেলে সেই পাহাড়ী নদীটা পেরুচ্ছে তখন আচমকা মথুরানাথজি তাকে দেখতে পান। ঘুরে দাঁড়িয়ে বেশ অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করেন, 'এ আওরত কৌন?'

বাকি সবাই ঘুরে দাঁড়ায়। নাটোয়ার কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে। গোমতী আর লচ্ছুকে সে সহদেওদের কাছে থাকতে বলে এসেছিল। কিন্তু আওরতটা যে এভাবে তাদের পিছু নেবে ভাবতে পারা যায়নি। নাটোয়ার অবাক যতটা হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে বিরক্ত।

'কৌন হ্যায় ও? কিঁউ হামলোগকা পিছা কর রহী হ্যায়?' গমগমে কণ্ঠস্বরটাকে এবার আরো কয়েক পর্দা চড়িয়ে দেন মথুরাপ্রসাদ।

চমকে ওঠে নাটোয়ার। 'ও গোমতী হ্যায় হুজৌর—' বলে পাথরের চাঁই টপকে টপকে গোমতীর কাছে চলে যায়। তাকে জিজ্ঞেস করে, 'তুই এসেছিস কেন?'

'জঙ্গলে ওহী খতারনাক জানবরটা আছে।'

'ও সালে জঙ্গলে থাকবে না তো মানুষের মতো গাঁও ইয়া টৌনে থাকবে? যা, ফিরে যা—'

'নেহীঁ।'

'কেন ঝামেলা করছিস! মথুরাজি বহোত গুস্সা করছেন।'

গোমতী জানায়, নাটোয়ারকে ঐরকম একটা খতারনাক জন্তুর মুখে পাঠাতে পারবে না। সে-ও সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।

নাটোয়ার বোঝাতে চেষ্টা করে, অমন চিতা অনেক দেখেছে সে।

জানোয়ারটা তার চামড়ায় একটা আঁচড় পর্যন্ত কাটতে পারবে না। তা ছাড়া এ জাতীয় মারাত্মক অভিযানে কোনো মেয়েমানুষের থাকা ঠিক হবে না। কিন্তু গোমতী কোনো কথাই শুনতে চায় না।

প্রথমে বিরক্ত হয়েছিল নাটোয়ার কিন্তু তার প্রাণের জন্য গোমতীর এই ব্যাকুলতাটুকু তাকে ভেতরে ভেতরে বেশ নাড়া দেয়। যে বদ, নষ্ট আওরত একদিন তাকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, যাকে নাটোয়ার প্রচণ্ড ঘৃণা করত এবং খুনও করতে চেয়েছিল, তবু তার প্রতি মেয়েমানুষটার এতটা টান রয়েছে, কে ভাবতে পেরেছিল! মনে মনে সে ঠিক করে ফেলে, যে যা-ই বলুক গোমতীকে নিজের ঘরে নিয়ে যাবে।

নাটোয়ার আরেক দফা আওরতের জঙ্গলে যাবার বিপদ সম্পর্কে গোমতীকে বোঝায় কিন্তু আগের সিদ্ধান্ত থেকে তাকে টলানো যায় না। নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত সে বলে, 'মরার যখন ইচ্ছে হয়েছে তখন চল—'

মথুরানাথজিরা তাদের জন্য অপেক্ষা করেননি। নদী পেরিয়ে ওধারের ঢাল বেয়ে জঙ্গলের কাছাকাছি চলে গেছেন। নাটোয়াররা দৌড়ে গিয়ে তাঁদের ধরে ফেলে।

পায়ের আওয়াজে ঘাড় কাত করে একবার নাটোয়ারদের দেখেন মথুরাজি, তারপর ফের সামনের দিকে তাকিয়ে চলতে চলতে বলেন, 'আওরতটা জঙ্গলে যাবে নাকি?'

নাটোয়ার ভয়ে ভয়ে বলে, 'হাঁ হুজৌর। ও আমাদের সঙ্গে জানবরটাকে তাড়া করবে।'

'বহুত সাহস দেখছি আওরতের!'

নাটোয়ার উত্তর দেয় না। মথুরানাথও আর কোনো প্রশ্ন করেন না।

একসময় সবাই জঙ্গলে ঢুকে পড়ে।

পাহাড়ের এ ধারে গাছপালা তেমন ঘন নয়। ট্যারাবাঁকা চেহারার কিছু সিসম, কেঁদ আর জারুল ছাড়া ছাড়া ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর ক্রমশ চাপ-বাঁধা জঙ্গল শুরু হয়েছে।

বিশাল বাহিনীটার সামনের দিকে এই অভিযানের নেতা মথুরানাথজি বন্দুক হাতে সতর্ক চোখে চারিদিকে লক্ষ করতে করতে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর পেছনে এখানকার চার গাঁয়ের নতুন জঙ্গলহাঁকোয়ার দলটা। সবার শেষে নাটোয়ার আর গোমতী।

নাটোয়ার চলতে চলতে সমানে চিৎকার করে চলেছে, 'হোঁশিয়ার, ভাই,

হোঁশিয়ার। আমরা দুশমন জানবরের আস্তানায় ঢুকে পড়েছি। আগে পিছে ডাইনে বাঁয়ে উপর নিচে, সব দিকে নজর রাখো। হোঁশিয়া—য়া-য়া-র—'

নাটোয়ারের চিৎকারে এবং এতগুলো মানুষের পায়ের আওয়াজে নিঝুম বনভূমির স্তব্ধতা ভেঙে যায়। এখানকার আদি বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে যেন। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে সর সর করে বুকে হেঁটে পালাতে থাকে সাপ এবং অদৃশ্য সরীসৃপের দল। বানরেরা লাফিয়ে লাফিয়ে গাছের পর গাছ পেরিয়ে উধাও হয়ে যায়। তাদের গোপন সংকেতে ঝাঁকে ঝাঁকে হরিণেরা গাছপালা লতাপাতার ফাঁক দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে দৌড়ে কোথায় মিলিয়ে যায়, কে জানে। উঁচু উঁচু গাছের মাথা থেকে অগুণতি পাখি পাখা ঝাপটিয়ে, ক্বঁক ক্বঁক আওয়াজ করতে করতে আকাশ জুড়ে উড়তে থাকে। কিন্তু যার জন্য এত বিপুল সমারোহ করে এই জঙ্গলে নাটোয়াররা হানা দিয়েছে সেই খতরনাক জানবার চিতাটাকে পলকের জন্যও কোথাও দেখা যায় না। এমন কি দূর থেকে তার গজরানিও ভেসে আসে না। ঘোর জঙ্গলের বাতাবরণে সে বুঝিবা বেবাক মিলিয়ে গেছে।

আজ অবশ্য চিতাটাকে মারার জন্য জঙ্গলে ঢোকা হয়নি। জঙ্গলহাঁকোয়াদের কোনো কাজই নেই বলতে গেলে। একটা জায়গা ঠিক করে, সেখানে গাছের ডালে মাচা বেঁধে সন্ধের আগে আগেই সবাই ফিরে যাবে।

ঘণ্টা তিনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা ফাঁকামতো জায়গা পছন্দ হয় মথুরানাথজির। সেখানে একটা গাছের মোটা গুঁড়ি মাটি থেকে দশ হাত উঁচু পর্যন্ত সটান উঠে গেছে। তারপর গুঁড়িটার গা থেকে তিনটে ডাল প্রায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বেরিয়েছে। মথুরানাথজি সেই তে ডালার ওপর নাটোয়ারদের দিয়ে মাচা বাঁধিয়ে যখন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসেন, বেলা পড়ে এসেছে। রোদ নেই বললেই হয়, পাহাড় আর গাছপালার মাথায় ম্যাড়মেড়ে একটু আলো কোনোরকমে আটকে আছে।

॥ কুড়ি ॥

আগেই সওদেওয়ের বাড়িতেই থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল নাটোয়ারদের। রাতের খাওয়া চুকিয়ে বাইরের সেই ঘরটায় শুয়ে পড়েছে তারা তিনজন— গোমতী, লচ্ছু আর সে নিজে। গাঁয়ের লোকেরা ধরেই নিয়েছে গোমতী তার

বিয়াহী আওরত অর্থাৎ বিবাহিত বৈধ স্ত্রী। ব্যাপারটা ঠিকই কিন্তু এর মধ্যে যে কিঞ্চিৎ জটিলতা রয়েছে সেটা আর ভাঙেনি নাটোয়াররা। অন্যেরা যা বুঝেছে, বুঝুক। আপাতত তাদের যা সম্পর্ক সেটা নিজেদের মধ্যেই গোপন থাক। তা ছাড়া নাটোয়ার তো মনস্থিরই করে ফেলেছে, গোমতীকে নিজের কাছে নিয়ে যাবে। নতুন করে ফের ঘর-সংসার শুরু করবে তারা। অবশ্য এর জন্য তার কিছু খরচ-খরচা আছে। নষ্ট, ভেগে-যাওয়া জরুকে সমাজে আরেক বার প্রতিষ্ঠা করার জরিমানা হিসেবে তেতরিয়া গাঁয়ের তাবত মানুষকে একদিন ভরপেট উৎকৃষ্ট ভোজন করিয়ে দিতে হবে। নইলে তাদের মুখ বন্ধ করা যাবে না। এতগুলো লোককে খাওয়াতে আড়াই তিন শ টাকা দরকার। গোমতীর সসম্মানে দ্বিতীয় বার সংসারে প্রবেশ করার কারণে এই টাকাটা খরচ করতে সে পিছপা নয়। এখন যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছে সেটা শেষ করতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিতাটাকে মেরে ফেলা একান্ত জরুরি।

আজ বিকেলে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসার পর মথুরানাথ তাঁর তাঁবুতে জঙ্গলহাঁকোয়াদের নিয়ে একটা সভা বসিয়েছিলেন। চার গাঁয়ের মানুষ বাইরে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে তাঁর কথা শুনছিল। তিনি কাল থেকে শিকারে যাবার একটা ছক ঠিক করে দিয়েছেন। রোজ সকালে কিছু খেয়ে কাঁটায় কাঁটায় ন'টায় জঙ্গলহাঁকোয়াদের নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন। ন'টা মানে ন'টাই। এক সেকেন্ড হেরফের করা চলবে না। জঙ্গলহাকোয়ারা আজ শুধু দা লাঠি বর্শা ইত্যাদি নিয়ে ঢুকেছিল, কাল এ সবের সঙ্গে নিতে হবে ক্যানেস্তারা আর সেগুলো বাজাবার জন্য মজবুত বেঁটে বেঁটে লোহার রড। সকালে জঙ্গলে ঢোকার পর বিকেলের আগে কেউ বেরুতে পারবে না। তাই সবাইকে সঙ্গে করে দুপুরের জন্য শুখা খাবার নিয়ে যেতে হবে।

এখন কত রাত, কে জানে। সহদেও একটা লণ্ঠন দিয়ে গিয়েছিল। শোয়ার পর সেটা নিভিয়ে দিয়েছে গোমতী। ঘরের ভেতরটা এই মুহূর্তে গাঢ় অন্ধকারে ভরে আছে। তবে পঞ্চাশ হাত তফাতে ওধারের কাঁকুরে জমিতে মথুরানাথজিদের চারটে তাঁবু ঘিরে অনেকগুলো মশাল জ্বলছে। সমস্ত রাত ওগুলো জ্বলবে। চিতাটা যদি রাতে কোনো কারণে এদিকে হানা দেয় সে জন্য মশালের বন্দোবস্ত। জঙ্গলের জানোয়ার আগুনকে ভয় পায়। অবশ্য মথুরানাথের দুই নৌকর পালা করে বন্দুক হাতে জেগে জেগে বাকি রাতটা পাহারা দেবে। ওরা বন্দুক চালাতে জানে।

লচ্ছুকে মাঝখানেরেখে গোমতী আর নাটোয়ার তার দু ধারে শুয়েছিল।

নাটোয়ারের ঘুম আসেনি। কাল তাড়াতাড়ি উঠে নাহানা এবং খাওয়া চুকিয়ে জঙ্গলে যেতে হবে, চিতাটাকে মেরে ফেলা ভীষণ জরুরি, ইত্যাদি কোনো চিন্তাই তার মাথায় নেই। লচ্ছুর ওধারে একটা মেয়েমানুষের মারাত্মক শরীর তাকে চুম্বকের মতো টানছিল কিন্তু লচ্ছু কি ঘুমিয়েছে? সে আস্তে আস্তে ছেলেটার আরো কাছে চলে যায়। লচ্ছুর শ্বাস পড়ছে খুব ধীরে ধীরে। তার গায়ে হাত দিয়ে আস্তে নাড়া দিতে যাবে সেই সময় ওধার থেকে চাপা গলা শোনা যায়, 'এ লচ্ছু, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?'

নাটোয়ার তার হাতটা লচ্ছুর গায়ের ওপর রেখেছিল। অন্ধকারে আরেকটি হাত এসে পড়ে তার হাতের ওপর। অর্থাৎ কিনা গোমতীও লচ্ছুকে নাড়া দিয়ে জানতে চেয়েছিল, ছেলেটা আদৌ ঘুমিয়েছে কিনা। গোমতীর হাতটা নিজের বিশাল মুঠির ভেতর পুরে নিয়ে সে বলে 'তুই ঘুমোসনি?'

গোমতী তার কথার উত্তর না দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, 'তুমিও তো জেগে আছ।'

একটু চুপ করে থাকে নাটোয়ার। তারপর গলার স্বর আরো নামিয়ে দেয়, 'লচ্ছুটা ঘুমিয়ে পড়েছে, কি বলিস?'

'হাঁ।'

গোমতীর হাতটা ধরাই ছিল। আস্তে টান দিয়ে নাটোয়ার বলে, 'ইধার আ—'

বিড়ালীর মতো সন্তর্পণে লচ্ছুর ওপর দিয়ে এ পাশে এসে নাটোয়ারের নাকে কুট করে কামড় বসিয়ে বলে, 'এই জন্যে বুঝি জেগে ছিলে?'

চার বছর পর এই তো সেদিন গোমতীর সঙ্গে দেখা হল। আগে, সেই বিয়ে করে নিয়ে আসার পর মেয়েমানুষটা ছিল একেবারেই অন্যরকম—ঠাণ্ডা, উত্তাপহীন, ভ্যাদভেদে। রাতে মনে হ'ত, ভেজা গাছের গুঁড়ি জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে। কিন্তু এই চার বছরে একেবারে পালটে গেছে আওরতটা। রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে পুরুষকে তাতিয়ে মজিয়ে খেপিয়ে দেবার মতো কত রকমের ঢংঢাং, যাদু আর তরীকাই না শিখেছে! 'শালী হারামী কাঁহিকা—' বলে চকিতে গোমতীকে বুকের ওপর তুলে নিয়ে উন্মাদের মতো পিষে ফেলতে থাকে নাটোয়ার। মেয়েমানুষটার এই শরীর তার বহুদিনের চেনা কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে বড়ই অপরিচিত আর আশ্চর্য কুহকময়।

দু'টি দেহকে ঘিরে একসময় ঝড় থামে। পরিতৃপ্ত গোমতী আর নাটোয়ার পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে অঢেল সুখে কখন গভীর ঘুমে ডুবে যায়, নিজেরাই

জানে না।

পরদিন ঠিক ন'টায় মথুরানাথ তাঁর বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। কালকের মতোই সবার আগে আগে বন্দুক হাতে তিনি চলেছেন, সবার পেছনে গোমতী আর নাটোয়ার। চার গাঁওয়ের মানুষ নদীর এধারে দাঁড়িয়ে অভিযানকারীদের বিদায় জানায়।

পরিকল্পনা আগেই ছকা ছিল। জঙ্গলে ঢুকে প্রথমে সেই তে-ডালার মাচায় মথুরানাথকে তুলে দিয়ে নাটোয়ার পনেরটি জঙ্গলহাঁকোয়াকে নিয়ে কালকের মতোই চিতাটা সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দিতে দিতে গাছপালা ঝোপঝাড় ঠেলে পুব দিকে প্রায় দু 'রশি'র মতো চলে যায়। তারপর তাকে ধরে মোট ষোল জনের বাহিনীটাকে এভাবে সাজিয়ে নেয়। বারো জন সামনের দিকে মুখ করে টিন পিটিয়ে হল্লা করতে করতে অদৃশ্য চিতাকে তাড়া করে মথুরানাথের দিকে নিয়ে যাবে। বাকি দু'জন পেছন দিকে মুখ করে সেই অবস্থাতেই সামনের সারির জঙ্গলহাঁকোয়াদের পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে পিছু হাঁটতে থাকবে। অন্য দু'জনের একজন থাকবে ডান দিকে, আরেক জন বাঁ দিকে। তারা ডাইনে বাঁয়ে চোখ রেখে মূল দলটার দু'পাশ থেকে সামনের লোকেদের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এগুতে থাকবে। অর্থাৎ ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে, সব দিকেই নজরদারির ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে নাটোয়ার। আচমকা কোনো দিক থেকেই চিতাটা যাতে তাদের ওপর হানা দিতে না পারে সে জন্য এটা খুবই জরুরি।

একসময় ছক অনুযায়ী টিন পেটানো এবং হল্লা শুরু হয়ে যায়। বনভূমির আত্মা সেই আওয়াজে চমকে চমকে ওঠে। এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা যত সাপ সরীসৃপ খরগোস হরিণ—সব ঊর্ধ্বশ্বাসে চারিদিকে পালিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু চিতাটার হদিস কোথাও পাওয়া যায় না।

দুপুরে সূর্য যখন খাড়া মাথার ওপরে, জঙ্গলহাঁকোয়ার দলটা মথুরানাথের মাচার কাছে এসে থামে।

সবাই ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মথুরানাথ বলেন, 'তোমরা একটু জিরিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে নাও। তারপর আবার হাঁক শুরু করবে।'

খাওয়া-দাওয়া এবং বিশ্রামের পর নতুন উদ্যমে কাজে লাগে জঙ্গলহাঁকোয়ারা। আগের বার তারা গিয়েছিল পুব দিকে, এবার দক্ষিণ দিক থেকে টিন পেটানো এবং 'শোর মচানো' শুরু হয়।

পর পর দু'দিন এই জঙ্গলে আসছে নাটোয়াররা। কিন্তু চিতাটার খোঁজ

মেলেনি। আজ বিকেলের দিকে যখন তারা হই হই করতে করতে আরেক বার মথুরানাথের মাচার কাছাকাছি এসে পড়েছে সেই সময় অনেক দূর থেকে একবার মাত্র চিতাটার গজরানি ভেসে আসে। অর্থাৎ জানোয়ারটা এখানেই আছে। কিন্তু ঐ গজরানি পর্যন্তই, তাকে চোখে দেখা যায় না।

পুব এবং দক্ষিণ, দু'দিক থেকে দু'বার জঙ্গল তোলপাড় করে ফেলতে বিকেল নেমে যায়। এরপর আর এখানে থাকা একেবারেই নিরাপদ নয়।

অগত্যা মথুরানাথ তাঁর বাহিনী নিয়ে ফিরে আসে।

এরপর আরো দু'দিন কেটে যায়। এর মধ্যে নাটোয়াররা জঙ্গলে গিয়ে উত্তর থেকে পশ্চিম থেকে এমন কি আরো একবার করে পুব এবং দক্ষিণ থেকেও টিন পিটিয়েছে, গলার শিরা ছিঁড়ে চেঁচিয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তবে চিতাটাকে কাছাকাছি এবং দূরে দু-চারবার চকিতের জন্য দেখেছে নাটোয়াররা। ঘন গাছপালার ভেতর তার গোল গোল কালো ছাপ মারা প্রকাণ্ড হলুদ শরীর বিদ্যুৎ চমকের মতো ঝলকে উঠেই পলকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তবে চিতাটার গজরানি অনেক বারই এই দু'দিন কানে এসেছে নাটোয়ারদের।

জানোয়ারটা ভীষণ চতুর। দূর থেকে গজরায়, দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায় কিন্তু তাড়া খেয়ে কোনোমতেই মথুরানাথজির বন্দুকের দিকে যায় না।

তিন তিনটে দিন পার হয়ে গেল কিন্তু কিছুই করা যাচ্ছে না। একটা জানোয়ার মারতে আগে আর কখনও এত সময় লাগেনি নাটোয়ারের।

মথুরানাথ এবং নাটোয়ার খুবই অধৈর্য হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড এক জেদ তাদের কাঁধে ভর করেছে যেন! যথেষ্ট সময় নষ্ট করা হয়েছে। যেভাবেই হোক, আর দু-একদিনের ভেতর জানোয়ারটাকে শেষ করে ফেলতেই হবে।

আজ চতুর্থ দিন।

আগের ক'দিনের মতোই ন'টায় বেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে নাটোয়াররা। মথুরানাথ যথারীতি তাঁর মাচায় উঠে বন্দুক তাক করে বসেছেন।

গেল তিন দিনে এমন কোনো দিক নেই যেখান থেকে টিন পিটিয়ে জানোয়ারটাকে তাড়া করেনি নাটোয়াররা। শুধু একবার নয়, একই দিক থেকে দু'বার তিনবার করেও তারা এটা চালিয়ে গেছে।

আজ সকালে ফের পুব দিকেই যায় নাটোয়াররা। এবং দু 'রশি' তফাতে

গিয়ে আগের মতো ছক সাজিয়ে, টিন পিটিয়ে হল্লা করতে করতে মথুরানাথজির মাচানের দিকে এগুতে থাকে। কিন্তু কয়েক কদম যেতে না যেতেই ডান পাশে খুব কাছে চিতাটার গজরানি শোনা যায়। একটু পরেই শব্দটা আসে বাঁ ধার থেকে, তারপর ক্রমাগত ডাইনে বাঁয়ে এবং পেছন থেকেও জঙ্গলে অনুপ্রবেশকারীদের বার বার হানায় চিতাটা যে খুবই বিরক্ত আর ক্রুদ্ধ সেটা তার গর্জন শুনে বোঝা যায়। নাটোয়াররা যেমন তাকে খতম করার জন্য জেদ ধরেছে, জানোয়ারটাও কিছু একটা করার জন্য তেমনি আজ মরিয়া। অত সহজে সে তাদের ছেড়ে দেবে না।

নাটোয়ার জানোয়ারদের মতিগতি বোঝে। তাদের গজরানি, চলাফেরার ধরন দেখে টের পায়, ওদের মাথায় কখন কোন অভিসন্ধি ঘুরছে। চিতাটার হালচাল দেখে তার শিরা স্নায়ু টান টান হয়ে গেছে।

নাটোয়ার চাপা গলায় বলে, 'হোঁশিয়ার—সবাই হোঁশিয়ার। ও শালে জানবারের মাথায় আজ শয়তান চেপেছে। চারদিকে নজর রাখো—' হোঁশিয়ার—'

আনকোরা জঙ্গলহাঁকোয়ারা প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে। সন্ত্রস্ত গলায় তারা বলে, 'কী হবে নাটোয়ার ভেইয়া—'

'কুছ নেহীঁ হোগা। ডরো মাত, হাতিয়ার তৈয়ার রাখো। জোরসে টিনা পিটো—'

পরস্পরের গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে এগুচ্ছে দলটা। নাটোয়ার ভরসা দিলেও তাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত গোটা শরীর প্রচণ্ড কাঁপছে। তাদের টিনে ঠিকমতো রডের বাড়ি পড়ছে না। সবাই চিৎকার করতে চেষ্টা করছে কিন্তু গলা দিয়ে কারো আওয়াজ বেরুতে চায় না। ক্ষীণ গোঙানির মতো শব্দ হয় শুধু। মানুষখেকো খতারনাক জানোয়ারের কলিজায় ভয় ধরাবার পক্ষে এই দুর্বল আওয়াজ একেবারেই যথেষ্ট নয়।

ডাইনে বাঁয়ে, কখনও বা পেছনে শুকনো পাতার ওপর চিতাটার পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ঝোপঝাড় লতাপাতা এবং বিশাল বিশাল গাছের আড়ালে নিজেকে অদৃশ্য রেখে জঙ্গলহাঁকোয়াদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে জানোয়ারটা। নাটোয়াররা থামলে চিতাটা থামছে, ওরা চলতে শুরু করলে সেটাও চলছে।

নাটোয়ার বার বার সাবধান করতে থাকে, 'হোঁশিয়ার ভাইলোগ, ও শালে ভুচ্চরের ছৌয়া হারামীটা আমাদের পিছা পড়েছে।'

জঙ্গলহাঁকোয়াদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ভয়ার্ত গলায় তারা বলে,

'হামলোগন মর গিয়া, বিলকুল মর গিয়া—'

নাটোয়ার ধমকে, চেঁচিয়ে, গালাগাল দিয়ে সঙ্গীদের তাতিয়ে তুলতে আর তাদের খোয়ানো সাহস ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে, 'শালে চুহার পাল, আপনা হিম্মতের ওপর ভরসা রাখ। এখন ডরালে ওই হারামী পেয়ে বসবে। শোর মচাও—শোর মচাও—' বলে নিজেই জঙ্গলকে উথলপাথল করে চেঁচাতে থাকে, 'হো-ও-ও-ও—হো-ও-ও—' তার চিৎকার জঙ্গল এবং পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

এবার খানিকটা কাজ হয়। জঙ্গলহাঁকোয়ারা বুঝতে পারছে, ভয় কাটিয়ে উঠতে না পারলে এই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব। দুশমন যেভাবে পেছনে লেগেছে, সাহস হারিয়ে ফেললে সর্বনাশ হয়ে যাবে। প্রাণ বাঁচাবার জন্য শেষ শক্তিটুকু জড়ো করে তারাও হল্লা জুড়ে দেয়, 'হো-ও-ও-ও—হো-ও-ও-ও—'

খানিকটা যাওয়ার পর হঠাৎ জঙ্গলহাঁকোয়াদের খেয়াল হয়, চিতার পায়ের আওয়াজ আর পাওয়া যাচ্ছে না। যে দুশ্চিন্তা আর আতঙ্ক তাদের ওপর চেপে বসেছিল সেটা অনেকখানিই কেটে যায়।

অন্যদের ভরসা দিলে কী হবে, ভেতরে ভেতরে নাটোয়ারও কম ভয় পায়নি। চাপমুক্ত হয়ে এবার সে বলে, 'বাঁচা গেল, জানবারটা আমাদের পিছা পড় বন্ধ করে জরুর অন্য দিকে ভেগে গেছে। শালে হারামী সমঝ গিয়া, ইঁহা সুবিস্তা নেহীঁ হোগা। এক কদম বঢ়ানেসে জান চলা যায়েগা। অব—'

কিন্তু তার কথা শেষ হয় না। আচমকা মাথার ওপর ফের হিংস্র, ক্রুদ্ধ গজরানি শোনা যায়। এবং কিছু বোঝার বা করার আগেই বিশাল চিতা গাছের একটা মোটা ডাল থেকে জঙ্গলহাঁকোয়াদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সবাই যখন ভেবেছিল,জানোয়ারটা তাদের পিছু নেওয়া ছেড়ে দিয়েছে তখন নিঃশব্দে কখন সেটা গাছে উঠে ওত পেতে বসে ছিল, টের পাওয়া যায়নি।

চিতার থাবায় চার পাঁচটি জঙ্গলহাঁকোয়া জখম হয়ে গিয়েছিল। তারা তো বটেই, বাকি সবাই আতঙ্কে উদ্‌ভ্রান্তের মতো চিৎকার করতে করতে দৌড়ুতে থাকে, 'মর গিয়া, মর গিয়া—'

পালাতে পারেনি শুধু দু'জন। নাটোয়ার এবং গোমতী। চিতাটার ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়েছিল নাটোয়ার। জন্তুটা আক্রোশে বার কয়েক ল্যাজ আছড়ায়, দাঁত বার করে হুঙ্কার ছাড়ে, তারপর নাটোয়ারের ওপর লাফিয়ে পড়ে কাঁধের কাছে কামড় বসিয়ে দেয়।

নাটোয়ার কাতর গোঙানির মতো আওয়াজ করে ওঠে, 'বঁচাও হামনিকো, বঁচাও—'

কয়েক হাত দূরে বিহ্বলের মতো দাঁড়িয়ে ছিল গোমতী। কেউ যেন পেরেক ঠুকে পা দুটো মাটিতে গেঁথে দিয়েছে। শ্বাসপ্রশ্বাস একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে তার। এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য জীবনে আর কখনও দেখেনি সে। কিন্তু নাটোয়ারের গোঙানি কানে আসতেই তার মধ্যে মারাত্মক এক প্রতিক্রিয়া ঘটে যায়। একটা লম্বা দা নিয়ে সে ক'দিন ধরে জঙ্গলে আসছে। হাতিয়ারটা হাতেই ছিল, সেটা উঁচিয়ে মুহূর্তে জানোয়ারটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং উন্মত্তের মতো সেটার ঘাড়ে কোমরে মাথায় এলোপাথাড়ি কোপ বসিয়ে যায়। গোমতীর মাথায় খুন চড়ে গেছে।

এই জঙ্গলে তার ওপর কেউ যে এমন জবরদস্ত আক্রমণ চালাতে পারে, হয়ত ভাবতে পারেনি চিতাটা। তার গা দায়ের কোপে ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে। রক্তাক্ত ক্ষিপ্ত জানোয়ার নাটোয়ারকে ছেড়ে দিয়ে মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ায় এবং গোমতীর গলায় কামড় বসিয়ে এক ঝটকায় তাকে তুলে নিয়ে ঘন গাছপালার ভেতর দিয়ে উধাও হয়ে যায়। সামান্য একটু আওয়াজ করারও সময় পায় না গোমতী, তার আগেই তার ঘাড় ভেঙে ঝুলে পড়ে।

চিতাটার কামড়ে নাটোয়ারের কাধের হাড় ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। ভলকে ভলকে রক্ত বেরিয়ে এসে সারা গা ভেসে যাচ্ছে। যে অভিযানে তারা বেরিয়েছিল তার শেষ বিশ্বস্ত সহযোদ্ধাটিকে এক ভয়ঙ্কর জানোয়ার চোখের সামনে দিয়ে তুলে নিয়ে গেল। সম্পূর্ণ বেহুঁশ হয়ে যাবার আগে বিড় বিড় করে আবছা গলায় শুধু একবারই সে বলতে পারে, 'গোমতীকা খতম কর দিয়া—'

॥ একুশ ॥

অন্য জঙ্গলহাঁকোয়ারা চিতার ভয়ে পালিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত মথুরানাথজিকে নাটোয়ারদের খবরটা দিয়েছিল। তিনি লাফ দিয়ে মাচা থেকে নেমে বলেছিলেন, 'চল, আমার সঙ্গে। নাটুয়াকে ওভাবে ফেলে রাখা যাবে না। দেখি যদি বাঁচাতে পারি। গোমতীকেও খুঁজতে হবে। চল—'

কেউ যেতে চায়নি। কিন্তু বন্দুক উঁচিয়ে একরকম জোর করেই মথুরানাথ তাদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। গোমতীকে কোথাও পাওয়া যায়নি। অগত্যা বেঁহুশ নাটোয়ারকে নিয়ে সহদেওদের গাঁয়ে ফিরে এসে মথুরানাথ

বলেছিলেন, 'এখনই একে প্রতাপপুরের হাসপাতালে নিয়ে যাও—'

মথুরানাথের কোনো একটা ভৈসা গাড়িতে চাপিয়ে নাটোয়ারকে নিয়ে যাওয়া যেত কিন্তু গাড়ি সড়ক ছাড়া চলতে পারবে না, তাতে অনেক সময় লেগে যাবে। নাটোয়ারকে বাঁচাতে হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে পৌঁছুনো দরকার।

রাস্তা দিয়ে গেলে প্রতাপপুর পাক্কা দশ মাইল। তবে মাঠঘাট খানাখন্দর ওপর দিয়ে আড়াআড়ি মাইল দুই হাঁটলে নয়া হাটিয়ার বাজার পড়বে, সেখান থেকে হাইওয়ে ধরে আর আড়াই মাইল গেলেই প্রতাপপুর টাউন। কাজেই বাঁশের চালিতে করে নাটোয়ারকে শুইয়ে নিয়ে যেতে হবে।

বেলা হেলে গেছে অনেকখানি। পশ্চিম আকাশের মাঝামাঝি জায়গায় রক্তাভ সূর্য স্থির দাঁড়িয়ে আছে। আজ মেঘের চিহ্ন মাত্র নেই কোথাও। পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশের তলা দিয়ে চারটে লোক বাঁশের চালি কাঁধে করে ঊর্ধ্বশ্বাসে হেঁটে চলেছে। চালির ওপর রক্তাক্ত বেহুঁশ নাটোয়ারের শরীর দড়ি দিয়ে-আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা।

তাদের পেছন পেছন পাগলের মতো ছুটে চলেছে লচ্ছু। সমানে কাঁদছে সে আর একটানা বলে চলেছে, 'নাটুয়াচাচা—নাটুয়াচাচা—' নাটোয়ারকে জঙ্গল থেকে নিয়ে আসার পর সেই যে লচ্ছুর কান্না শুরু হয়েছে, সেটা এখনও থামেনি। বন্দুকবাজদের গুলিতে বাপের অমন শোচনীয় মৃত্যুর পর নাটোয়াররাই তাকে কাছে টেনে নিয়েছিল। চিতা গোমতীকে তুলে নিয়ে গেছে। সে নিশ্চয়ই বেঁচে নেই। নাটোয়ারও বাঁচবে কিনা কে জানে। পৃথিবীর শেষ আশ্রয়টুকুও বুঝি তার হারিয়ে গেল।

কখন নয়া হাটিয়ার বাজারের কাছে এসে লচ্ছু এবং চালিবাহকেরা হাইওয়েতে এসে উঠেছে এবং কখন গমগমে বাজারটা পেরিয়ে আরো অনেকদূর চলে গেছে, নিজেদেরই খেয়াল নেই।

এখন বড় সড়কের দু'ধারে যতদূর চোখ যায়, শুধুই ফাঁকা মাঠ। কেউ কোথাও নেই। নিঝুম চরাচর জুড়ে অগাধ শূন্যতা। চাপ-বাঁধা স্তব্ধতাকে ফুঁড়ে ফুঁড়ে মাঝে মাঝে লচ্ছুর ফোঁপানি আর ক্লান্ত ভাঙা গলার 'নাটুয়াচাচা—নাটুয়াচাচা—' ডাকটা ছাড়া কোথাও কোনো শব্দ নেই।

হঠাৎ দূর থেকে বিলাইতি বাজনায় সেই মাতিয়ে-দেওয়া গানের সুরটা শুনতে পায় চার চালিবাহক এবং লচ্ছু। পরক্ষণেই তাদের চোখে পড়ে,তারানাথজির ভারতমাতা রথ বিশাল মিছিল নিয়ে এদিকে এগিয়ে আসছে। 'ভবিষ্য' ভারতের জন্য অসংখ্য শিলান্যাস করা এখনও তাঁর বাকি।

রথ যত এগোয়, সেই সুরটা ততই আরো স্পষ্ট হতে থাকে, 'বোল রাধা বোল, সঙ্গম হোগা কি নেহীঁ...'